আধুনিক
ভারতীয়
গল্প ১

আধুনিক ভারতীয় গল্প ১

প্রকাশ : ১৩৬৯ অক্ষয় তৃতীয়া

প্রচ্ছদশিল্পী : দেবব্রত ঘোষ

প্রকাশক : শর্মিলা পাল। ভূর্জপত্র
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন। কলিকাতা ৪

মুদ্রক : শিবনাথ পাল। প্রিন্টেক
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন। কলিকাতা ৪

সূচি

ভারতবর্ষ বলতে এই কিছুদিন আগেও আমরা যা বুঝতুম, আজকে যখন বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি তারই মূলে অনবরত আঘাত হানছে, তখন নিশ্চয়ই আবারও একবার ভালো ক'রে যাচাই ক'রে দেখা উচিত, ভারতবর্ষ ব'লে সত্যি-কিছু আছে, না এ-সম্বন্ধে আমাদের ধারণাটাই সম্পূর্ণ অলীক ও অমূলক। সেটা বোঝবার জন্তেই আসলে এই সংকলনের অবতারণা। কেউ-কেউ অবশ্য বলতে পারেন, এর জন্য বরং ইতিহাস থেকে উপাদান সংগ্রহ ক'রে তথ্য- ও বিশ্লেষণ-সম্বল গবেষণাপ্রবন্ধ লেখা যেতো—তা না-ক'রে মাঝখান থেকে এ-রকম একটা গল্পসংগ্রহের পরিকল্পনা করা কেন? খুবই সংক্ষেপে, সূত্রাকারে, আপাতত আমাদের ধারণাগুলো পেশ করা যাক—পরবর্তী খণ্ডগুলোয় হয়তো তা বিশদ ও বিস্তারিত হবে।

বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা ঐক্যের বোধ—এ-রকম একটা প্রসঙ্গ কিছুদিন আগেও আমাদের বিদ্যায়তনগুলির খুব প্রিয় ছিলো। বিভিন্নতাগুলো বোঝবার জন্য পণ্ডিত হ'তে হয় না: কত স্তরেই তো বিভিন্নতা—তাব কোনোটা নির্বস্তুক, কোনোটা-বা পুরোপুরি প্রত্যক্ষভাবেই মূর্ত। যেমন ধর্মবোধ একটা স্তরে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে নির্বস্তুকভাবে চিন্তা করে, আবার তার আচার-অনুষ্ঠান পালা-পার্বণ আদৌ কোনো ভাবেই বিমূর্ত নয়। বিভিন্নতার তো কত দিকই আছে: ভাষা, বেশভূষা, খাদ্য, জীবনযাপনের দৈনন্দিন রীতি-প্রকৃতি, ভৌগোলিক পরিবেশ, অর্থনৈতিক শ্রেণী-বিভাগ—ইত্যাদি নানা বিষয়ের উল্লেখ ক'রে কেউ-কেউ হয়তো একটি ভারতবর্ষের বদলে নানা ভারতবর্ষের অস্তিত্ব স্বীকার করতে প্রলুব্ধ হবেন। এমনকী সংগীতের মতো নির্বস্তুক শিল্পমাধ্যমেও ভারতের বিভিন্ন সংগীত পদ্ধতিতে প্রভেদ দেখা যায়—যার নিদর্শন কর্ণাটকী সংগীত ও উত্তর ভারতীয় সংগীত। হয়তো আঞ্চলিক গণ্ডি অতিক্রম ক'রে যায় ভাস্কর্য ও চিত্রকলা, যদি-না দৃশ্যের বিভিন্নতাকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া যায়।

সাহিত্য যেহেতু ভাষাতেই রচিত হয়, সাহিত্যিককে যেহেতু কাজ করতে হয় শব্দ নিয়ে, শব্দ আর তার ঝংকার ও অর্থ, বা অর্থের আভাস ও অভ্যাস, অতএব সাহিত্যে হয়তো পার্থক্য ও বিভিন্নতা অনেক বেশি সুপ্রকট। এখানে লেভ তলস্তয়ের 'আন্না কারেনিনার' প্রথম পঙক্তিটাকেই উলটে মনে প'ড়ে যায়: সব সুখী

পরিবারকেই বাইরে থেকে একরকম দেখায়, দুঃখ বা দুর্দশাই আনে/হানে বৈচিত্র্য— তলস্তয়ের এ-কথাটার বিপরীতটাই হয়তো মনে প'ড়ে যাবে ভারতীয় সাহিত্যের বেলায়। ভারতের জীবনের প্রধান সমস্যা ও দুঃখগুলিই বরং দেখিয়ে দেয় বিভিন্ন ভাষায় লেখা হ'লেও সমস্যাগুলো ভারতেরই—ভারত ছাড়া বিশ্বের আর কোথাও এ-সমস্যাগুলো দেখা দিতো না। জীবনের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ধর্মের প্রভাব, বর্ণভেদ, জাতপাঁত, স্ত্রীজাতির প্রতি ব্যবহারের প্রকৃতি, দারিদ্র ও তার প্রভাব, দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে ধাপে-ধাপে এগোবার জন্য যে দাম দিতে হয়—এ-সব প্রসঙ্গ নিয়ে যে-ভাষাতেই গল্প লেখা হোক না কেন, আমাদের কাছে তা ভারতীয় সমস্যা হিশেবেই দেখা দেয়—নিছকই কোনো অঞ্চলের একান্ত নিজস্ব সমস্যা হিশেবে নয়। আঞ্চলিক প্রভেদ বা ভাষার বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাকে শনাক্ত করা যায় একটি বিশেষ রূপে। হয়তো এইভাবেই আমরা বুঝে উঠতে পারবো কাকে বলে ভারতীয়, কীই বা ভারতীয়, কেনই বা ভারতীয়। এই সংকলন সেটা বোঝাবারই চেষ্টা করেছে—তার বিভিন্ন খণ্ডে এই প্রশ্নগুলোরই উত্তর হাৎড়ানো হবে।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

দেবী

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

সে আজ কিঞ্চিদধিক একশত বৎসরের কথা।

পৌষ মাসের দীর্ঘরজনী আর কিছুতেই পোহাইতে চাহে না। উমাপ্রসাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল। লেপের ভিতর অনুসন্ধান করিল, স্ত্রী নাই। বিছানা হাতড়াইয়া দেখিল তাহার ষোড়শী পত্নী একপাশে গুটিসুটি হইয়া পড়িয়া ঘুমাইতেছে। সরিয়া গিয়া অতি সন্তর্পণে তাহার গায়ে লেপখানি চাপাইয়া দিল। পাশে পায়ের দিকে হাত দিয়া দেখিল কোথাও ফাঁক বহিতেছে কিনা।

উমাপ্রসাদ বিংশতিবর্ষীয় যুবক। সম্প্রতি সংস্কৃত ছাড়িয়া শখ করিয়া পারস্যভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মা নাই—পিতা পরম পণ্ডিত, পরম ধার্মিক, নিষ্ঠাবান শক্তি-উপাসক, গ্রামের জমিদার, সম্মানের সীমা নাই। অনেকের বিশ্বাস উমাপ্রসাদের পিতা কালীকিঙ্কর রায় মহাশয় একজন প্রকৃত সিদ্ধপুরুষ, আদ্যাশক্তির বিশেষ অনুগৃহীত। গ্রামেব আবালবৃদ্ধ তাঁহাকে দেবতার মতো শ্রদ্ধা করে।

উমাপ্রসাদ আপনার নবীন জীবনে সম্প্রতি নবপ্রণয়ের মাদকতা অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পাঁচ-ছয় বৎসব পূর্বে তাহার বিবাহ হইয়াছে বটে, কিন্তু পত্নীর সহিত ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত এই নতুন। স্ত্রীর নাম দয়াময়ী।

স্ত্রার গাত্র আবৃত কবিযা উমাপ্রসাদ তাহার গণ্ডস্থলে একখানি হাত রাখিল—দেখিল সে স্থান শীতে শীতল হইয়া গিয়াছে। অত্যন্ত ধীরে-ধীরে পত্নীর মুখচুম্বন করিল।

যেরূপ নিয়মিত তালে দয়াময়ীর নিশ্বাস বহিতেছিল, সহসা তাহার ব্যতিক্রম হইল। উমা জানিল স্ত্রী জাগিয়াছে। মৃদুস্বরে ডাকিল—'দয়া।'

দয়া বলিল—'কী।' 'কী'টা খুব দীর্ঘ করিয়া বলিল।

'তুমি বুঝি জেগে রয়েছ?'

দয়া ঢোক গিলিয়া বলিল—'না, ঘুমুচ্ছিলাম।'

উমাপ্রসাদ আদর করিয়া স্ত্রীকে বুকের কাছে টানিয়া আনিল। বলিল—'ঘুমুচ্ছিলে তো উত্তর দিলে কে?'

দয়া তখন আপনার ভুল বুঝিতে পারিয়া অপ্রতিভ হইল। বলিল—'আগে ঘুমুচ্ছিলাম, এখন জেগে উঠলাম।'

উমাপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিল—'এখন কখন ? ঠিক কোন্ সময় ?'—উমা ভারি দুষ্টু।

'কোন্ সময় আবার ?—সেই তখন !'

'কখন ?'

'যাও, আমি জানিনে।'—বলিয়া দয়া স্বামীর বাহুপাশ হইতে মুক্ত হইবার বৃথা চেষ্টা করিল।

ঠিক কখন জাগিয়াছে, দয়াও কিছুতে বলিবে না, তাহার স্বামীও কিছুতে ছাড়িবে না। কিয়ৎক্ষণ মান-অভিমানের পর দয়ার পরাজয় হইল। উত্তর দিল. 'সেই যখন তুমি'—বলিয়া থামিল ?

'আমি কী করলাম ?'

দয়া খুব তাড়াতাড়ি করিয়া বলিল -'সেই যখন তুমি আমায় চুমু খেলে—হল ! মাগো মা ! এত জানো !'

তখনও এক প্রহরের অধিক রাত্রি আছে। দুজনে কত কথা আরম্ভ হইল। অধিকাংশ কথারই না-আছে মাথা না-আছে মুণ্ড। হায়, শত বৎসর পূর্বে আমাদের প্রপিতামহগণের তরুণবয়স্ক মাতাপিতাগণ, অসার অপদার্থ আমাদেরই মতো 'এমনি চঞ্চল মতি-গতি' ছিলেন। অত বড়ো শাক্ত পরিবারের সন্তান হইয়াও উমাপ্রসাদ সে পর্যন্ত একদিনও স্ত্রীর নিকট মুদ্রাপ্রকরণ বা মাতৃকান্যাসের কোনও প্রসঙ্গ উত্থাপন করে নাই এবং যমনিয়মাদি সম্বন্ধে তাহাকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ রাখিয়াছিল।

নানা কথার পর উমাপ্রসাদ বলিল—'দেখ, আমি পশ্চিমে চাকরি করতে বেরুব।'

দয়া বলিল—'তোমার আবার চাকরি করা কেন ? তোমার কীসের দুঃখ ? জমিদারের ছেলে হয়ে কেউ চাকরি করে না কি ?'

'আমার এখানে দুঃখ আছে বৈকি।'

'কী ?'

'তুমি যদি আমার দুঃখ বুঝবে তাহলে আর আমার দুঃখ কীসের !'

শুনিয়া দয়া ভারি অপ্রস্তুত হইয়া গেল। ভাবিতে লাগিল, কী দুঃখ ?

ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না। একটু দুষ্টামি বুদ্ধি আসিল। বলিল, 'তোমার কী দুঃখ ? আমি বুঝি মনের মতো হইনি ?'

দয়া জানিত এ-কথা বলিলে উমাপ্রসাদকে আঘাত করা হইবে।

উমাপ্রসাদ প্রিয়ামুখে অজস্র চুম্বনবর্ষণ করিয়া এই আঘাতের প্রতিশোধ লইল।

পরে বলিল—'আমার দুঃখ তোমাকে নিয়েই বটে। সমস্ত দিন আমি তোমায় পাইনে। শুধু রাত্তিরটি পেয়ে সাধ মেটে না। বিদেশে চাকরি করতে যাবো, সেখানে তোমাকে নিয়ে যাবো, কেমন দুজনে একলা থাকবো, সারাদিন সারারাত!'

'চাকরি করবে তো সারাদিন আমাকে নিয়ে থাকবে কেমন করে? আমাকে তো একলা ফেলে তুমি কাছারি চলে যাবে।'

'কাছারি গিয়ে খুব শীগগির-শীগগির ফিরে আসবো।'

দয়া ভাবিয়া দেখিল, তা হইতে পারে বটে। কিন্তু বাধা-বিপত্তি যে অনেক!

'তুমি তো নিয়ে যাবে, সবাই যেতে দেবে কেন?'

'এখান থেকে কি নিয়ে যাবো? যখন শুনবো তুমি বাপের বাড়ি রয়েছ তখন চুপি-চুপি এসে তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাবো।'

শুনিয়া দয়া হাসিল। এও কি সম্ভব না কি?

'কতদিন আমরা থাকবো সেখানে?'

'অনেক বছর থাকবো।'

দয়া মুচকি-মুচকি হাসিতেছিল, সহসা একটা কথা তার মনে পড়িয়া গেল। বলিল—'খোকাকে ফেলে কি অনেক বছর আমি বিদেশে থাকতে পারবো?'

উমাপ্রসাদ স্ত্রীর গালে গাল রাখিয়া কানের কাছে বলিল—'ততদিনে তোমারও একটি খোকা হবে।'

কথাটি শুনিয়া দয়ার ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে কর্ণমূল পর্যন্ত লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। কিন্তু অন্ধকারে তাহা কেহ দেখিতে পাইল না।

উল্লিখিত খোকাটি উমাপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ সহোদর তারাপ্রসাদের একমাত্র সন্তান। স্বয়ং উমাপ্রসাদ এ-বাটীর শেষ খোকা। এই পরিবারে খোকারাজার সিংহাসন বহু-কাল শূন্য ছিল, তাই খোকার বড়ো আদর, খোকা বাড়িশুদ্ধ সকলের চক্ষের মণি। খোকার মা হরসুন্দরী—তাঁর তো আর গরবে মাটিতে পা পড়ে না।

দয়া সহসা বলিল—'আজ এখনো খোকা এল না কেন?'

ভোর রাত্রে রোজ খোকা কাকিমার কাছে আসে। এটি তার নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য। যদিও বাটীতে দাসদাসীর অভাব নাই, তথাপি গৃহকার্যের অধিকাংশ দয়া স্বহস্তে করিত। বিশেষত তাহার শ্বশুরের পূজাহ্নিক সম্পর্কীয় যাহা-কিছু কার্য তাহাতে দয়া ছাড়া অপর কাহারও হস্তস্পর্শ করিবার অধিকার ছিল না। সারাদিন এই সমস্ত কার্যে ব্যস্ত থাকিয়াও খোকাকে সে এক মুহূর্তও চক্ষের আড়াল করিত না। কাকিমা

গা মছাইয়া না-দিলে খোকা গা মুছে না, কাকিমা কাজল পরাইয়া না-দিলে খোকা কাজল পরে না, কাকিমার কোলে ভিন্ন অন্য কোথাও শুইয়া খোকা দুধ খায় না। খোকার বিছানায় তার কাকিমা অনেক রাত্রি অবধি থাকিয়া ঘুম পাড়াইয়া আসে —ভোরে রাত্রে ঘুম ভাঙিলেই খোকা কাকিমা বলিয়া কান্না জুড়িয়া দেয়। এই প্রগল্‌ভতা, এই অন্যায় আবদারের জন্য মধ্যে-মধ্যে তাহাকে হরসুন্দরীর নিকট হইতে চড়টা চাপড়টা পুরস্কার পাইতে হয়। কিন্তু বলাই বাহুল্য তাহাতে কান্না না-থামিয়া আরও দশগুণ বাড়িয়া উঠে। তখন হরসুন্দরী তাহাকে কোলে করিয়া ক্রোধে ও নিদ্রাঘোরে টলিতে-টলিতে দয়ার শয়নকক্ষের দ্বারে আসিয়া ডাকেন — 'ছোটো বউ, ও ছোটো বউ, এই নে তোর খোকাকে।' বলিয়া দয়ার দুয়ার খুলিবার অপেক্ষা না-রাখিয়াই, খোকাকে মাটিতে বসাইয়া প্রস্থান করেন। দয়া প্রায়ই জাগিয়া থাকে, না-থাকিলেও খোকার ক্রন্দনে শীঘ্রই জাগিয়া উঠে, ছুটিয়া আসিয়া খোকাকে বুকে করিয়া লইয়া যায়, 'কে মেরেছে, কে মেরেছে' বলিয়া কত সোহাগ করে। মাথার শিয়রে পানের ডিবায় কোনও দিন কদমা, কোনও দিন বাতাসা, কোনও দিন নারিকেল নাড়ু সঞ্চিত থাকে, তাই খোকা ভক্ষণ করে, তাহার পর নিশ্চিন্ত হইয়া কাকিমার কোলে শুইয়া ঘুমাইয়া যায়।

আজ এখনও খোকা আসিল না বলিয়া দয়া কিছু উৎকণ্ঠিত হইল। বলিল, 'তার অসুখ-বিসুখ করেনি তো?'

উমাপ্রসাদ বলিল — 'বোধহয় এখনও রাত্রি আছে। দেখি দাঁড়াও।'

উমাপ্রসাদ বিছানা হইতে উঠিয়া জানালা খুলিল। বাহিরে আম ও নারিকেল বৃক্ষবহুল বাগান। তখনও চন্দ্রাস্ত হয় নাই — কিন্তু অধিক বিলম্বও নাই। দয়া নিঃশব্দে আসিয়া স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইল। বলিল — 'রাত আর বেশি কই?'

শীতের হিমবায়ু হু-হু করিয়া জানালা-পথে প্রবেশ করিতে লাগিল। তবু দুজনে সেই অল্পালোকে পরস্পরের পানে চাহিয়া কতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। অনেকক্ষণ তাহাদের চক্ষু যে উপবাসী ছিল!

দয়া বলিল — 'দেখ, আজ আমার মনটা কেমন হয়ে গেছে। খোকা এখনও এল না। কী জানি, কেন মনটা এমন হয়ে গেল।'

উমাপ্রসাদ বলিল — 'এখনও খোকার আসবার সময় হয়নি। যেদিন ঘুমিয়ে পড়ে সেদিন তো আসতে দেরিও হয়। তোমার মন সেজন্যে খারাপ হয়নি। কেন হয়েছে আমি জানি।'

'কেন বলো দেখি?'

'বলেছি কিনা আমি পশ্চিমে যাবো চাকরি করতে, তাই তোমার মন খারাপ হয়ে গেছে।' —বলিয়া উমাপ্রসাদ স্ত্রীকে নিজের আরও কাছে টানিয়া লইল।

দয়া একটি ছোটো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—'আমি বুঝতে পারছিনে। মনে হচ্ছে যেন আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।'

বাহিরে জ্যোৎস্না নিবতিশয় ম্লান। পত্নীর কথা শুনিয়া উমাপ্রসাদের মুখখানিও ম্লান হইয়া গেল।

অনেকক্ষণ দুইজনে দাঁড়াইয়া রহিল। চাঁদ ডুবিয়া গেল। গাছপালা অন্ধকারে গা ঢাকা দিল। জানালা বন্ধ করিয়া উভয়ে শয্যায় ফিরিয়া আসিল।

ক্রমে একটা-আধটা পাখিব ডাক শোনা গেল। পরস্পরেব বক্ষোনিবদ্ধ হইয়া তাহারা ঘুমাইয়া পড়িল।

ক্রমে জানালার বন্ধ্রপথে প্রভাতেব আলোকরশ্মি প্রবেশ কবিতে লাগিল। তখনও দুইজনে নিদ্রাভিভূত।

সহসা বাহির হইতে উমাপ্রসাদের পিতা ডাকিলেন—'উমা।'

প্রথমে ঘুম ভাঙিল দয়াব। সে গা ঠেলিয়া স্বামীকে জাগাইয়া দিল।

কালীকিঙ্কর আবাব ডাকিলেন—'উমা।' স্বরটা কম্পিত, যেন অন্যরূপ, ইহা যে তাঁহারই কণ্ঠস্বর তাহা যেন কষ্টে বুঝা গেল।

এত ভোরে পিতা তো কখনও ডাকেন না। আর তাঁহার স্বরই বা এমন হইল কেন?—তবে সত্য-সত্যই খোকাব কিছু অসুখ-বিসুখ করিয়াছে বুঝি! উমাপ্রসাদ তাড়াতাড়ি উঠিয়া দুয়াব খুলিয়া দিল।

দেখিল পিতার পরিধানে রক্তবর্ণ কৌষেয় বস্ত্র, স্কন্ধে নামাবলী উত্তরীয়, গলে রুদ্রাক্ষমালা লম্বমান। এ কী! এত ভোরে তাঁহার পূজার বেশ কেন? অন্যদিন গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া তবে তিনি পূজার বেশ পরিধান করেন। মুহূর্তকালের মধ্যে এই চিন্তা-পরম্পরা উমাপ্রসাদের মস্তকে উদিত হইল।

দ্বার খুলিবামাত্র কালীকিঙ্কর পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'বাবা, ছোটো বউমা কোথায়?'

স্বর পূর্ববৎ কম্পিত। উমাপ্রসাদ কক্ষের চারিদিকে চাহিল। দয়া শয্যা-ত্যাগ করিয়া উঠিয়া, কিছুদূরে জড়োসড়ো হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

কালীকিঙ্করও সেইদিকে নেত্রপাত করিলেন। বধূকে দেখিতে পাইবামাত্র, নিকটবর্তী হইয়া তাহার পদতলে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন।

উমাপ্রসাদ বিস্ময়ে বাক্যহীন। দয়াময়ী শ্বশুরের এই অদ্ভুত আচরণ দেখিয়া নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রণামান্তে কালীকিঙ্কর বলিলেন—'মা, আমার জন্ম সার্থক হল। কিন্তু এতদিন কেন বলিসনি মা?'

উমাপ্রসাদ বলিল—'বাবা, বাবা!'

কালীকিঙ্কর বলিলেন—'বাবা, ইঁহাকে প্রণাম করো।'

উমাপ্রসাদ বলিল—'বাবা! আপনি কি উন্মাদ হয়েছেন?'

'উন্মাদ হইনি বাবা। এতদিন উন্মাদ ছিলাম বটে। আজ আরোগ্যলাভ করেছি, সেও মার কৃপায়।'

উমাপ্রসাদ পিতার কথার কিছুই অর্থগ্রহণ করিতে পারিল না। বলিল—'বাবা! আপনি কী বলছেন?'

কালীকিঙ্কর বলিলেন—'বাবা! আমার বড়ো সৌভাগ্য। যে-কুলে জন্মেছি তা পবিত্র হল। বাল্যকালে কালীমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছি, এতদিন যে-সাধনা, যে-আরাধনা করলাম, তা নিষ্ফল হয়নি। মা জগন্ময়ী কৃপা করে ছোটো বউমার মূর্তিতে আমার গৃহে স্বয়ং অবতীর্ণা হয়েছেন। গত রজনীতে স্বপ্নযোগে আমি এই প্রত্যাদেশ পেয়েছি। আমার জীবন ধন্য হল।'

দয়াময়ী ছিল মানবী—সহসা দেবীত্বে অভিষিক্ত হইল।

পূর্বোক্ত ঘটনার পর তিন দিন অতিবাহিত হইয়াছে, এই দিবসত্রয়ে এ-সংবাদ বহুদূর ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে। আশেপাশের বহু গ্রাম হইতে বহুজন আসিয়া প্রসিদ্ধ শাক্ত-জমিদার কালীকিঙ্কর রায়ের বাটীতে দয়াময়ী-রূপিণী আদ্যাশক্তিকে দর্শন করিয়া গিয়াছে।

দয়াময়ীর রীতিমতো পূজা আরম্ভ হইয়াছে। ধূপ-দীপ জ্বালিয়া, শঙ্খ-ঘণ্টা বাজাইয়া, ষোড়শোপচারে তাঁহার পূজা হয়। এ-কয়দিনে দয়াময়ীর সম্মুখে বহু-সংখ্যক ছাগবলি হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু এ-তিন দিন দেবতার পূজা পাইয়াও দয়াময়ী কেবল কাঁদিতেছে। আহার-নিদ্রা একপ্রকার ত্যাগ করিয়াছে বলিলেই হয়। এই আকস্মিক অদ্ভুত ঘটনায় তাহাকে এমন অভিভূত বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছে যে, সে দুই দিন আগে এ-বাটীর বধূ ছিল, শ্বশুর ও ভাসুরের সাক্ষাতে বাহির হইত না, এ-সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছে। এখন আর তাহার মুখে অবগুণ্ঠন নাই—যাহার-তাহার পানে শূন্য-দৃষ্টিতে পাগলিনীর

মতো চাহিয়া থাকে; তাহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মৃদুভাবাপন্ন হইয়াছে, রক্তবর্ণ চক্ষু দুইটি ফুলিয়াছে, বেশবাস সুসংবৃত নহে।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। পূজার ঘরে একটি কোণে ঘৃতদীপ মিটি-মিটি করিয়া জ্বলিতেছে। পুরু কম্বলের বিছানায় রেশমি বস্ত্রের আবরণ, তাহার উপর দয়াময়ী শয়ন করিয়া আছে। গায়ে একখানি মোটা শাল। দুয়ার বন্ধ ছিল মাত্র, অর্গলিত ছিল না। অত্যন্ত ধীরে-ধীরে সে-দুয়ার খুলিতে লাগিল। চোরের মতো সন্তর্পণে উমাপ্রসাদ প্রবেশ করিল। দুয়ার বন্ধ করিয়া খিল দিল।

উমাপ্রসাদ দয়াময়ীর বিছানায় আসিয়া বসিল। সেদিন উষাকালের ঘটনার পর স্ত্রীর সহিত এই তাহার প্রথম নিভৃত সাক্ষাৎ।

দয়াময়ী জাগিয়া ছিল, স্বামীকে দেখিয়া উঠিয়া বসিল।

উমাপ্রসাদ বলিল—'দয়া! এ কী হল?'

আঃ—আজ তিন দিনের পর দয়া স্বামীর মুখে একটি স্নেহমাখা কথা শুনিল। এ-তিন দিন কাল ভক্তগণের 'মা-মা' শব্দে তাহার হৃদয়দেশ মরুভূমির মতো শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছিল। স্বামীর মুখনিঃসৃত এই আদরের বাণী তাহার প্রাণে যেন অকস্মাৎ সুধাবৃষ্টি করিয়া দিল; দয়া স্বামীর বুকে মুখ লুকাইল।

উমাপ্রসাদ স্ত্রীর গায়ের শাল মোচন করিয়া তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল। উচ্ছ্বসিত স্বরে বারংবার বলিতে লাগিল—'দয়া! এ কী হল—এ কী হল?'

দয়া নির্বাক।

উমাপ্রসাদও কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিল। তারপরে বলিল—'দয়া! তোমার কি মনে হয় যে এ-কথা সত্যি? তুমি আমার দয়া নও, তুমি দেবী?'

এইবার দয়া কথা কহিল—বলিল—'না, আমি তোমার স্ত্রী ছাড়া আর-কিছু নই, আমি তোমার দয়া ছাড়া আর-কিছু নই—আমি দেবী নই—আমি কালী নই।'

এই কথা শুনিয়া উমাপ্রসাদ সাগ্রহে স্ত্রীর মুখচুম্বন করিল। বলিল—'দয়া! তবে চলো আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই। এমন কোনও দূরদেশে গিয়ে থাকবো যেখানে কেউ আর আমাদের সন্ধান পাবে না।'

দয়া বলিল—'তাই চলো। কিন্তু কী উপায়ে যাবে?'

উমাপ্রসাদ বলিল—'সে-সমস্ত আমি ঠিক করবো, কিছু সময় যাবে।'

দয়া বলিল—'কবে? কবে? শীগগির ঠিক করো—নইলে বেশি দিন আমি বাঁচবো না। আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে। যদি মৃত্যুও না-হয়, তবে আমি পাগল হয়ে যাবো।'

উমাপ্রসাদ বলিল—'না দয়া! —তুমি কিছু ভেবো না। দিন-সাত তুমি ধৈর্য

ধরে থাকো! আজ শনিবার। আগামী শনিবার রাত্রে তোমার কাছে আসবো আবার—তোমাকে নিয়ে গৃহত্যাগ করবো। এই সাতদিন তুমি আশায় বুক বেঁধে কাটিয়ে দাও, লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার।'

দয়া বলিল—'আচ্ছা।'

উমাপ্রসাদ বলিল—'এখন তবে যাই, কেউ আবার এসে না-পড়ে'—বলিয়া সে পত্নীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বিদায় লইল।

পরদিন প্রভাতে দয়াময়ীর পূজা যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তখন গ্রামের একজন অশীতিবর্ষ-বয়স্ক বৃদ্ধ লাঠিতে ভর করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার কোটরান্তর্গত চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে। আসিয়াই দয়াময়ীকে দেখিয়া গলবস্ত্র হইয়া তাহার সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া যুক্ত-করে বলিতে লাগিলেন—'মা, আমি তোমায় চিরকাল পুজো করে এসেছি। আজ আমার বড়ো বিপদ মা! আজ ভক্তকে রক্ষা করো।'

দয়াময়ী বৃদ্ধের পানে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করিয়া চাহিয়া রহিল। পুরোহিত বলিলেন—'কেন দাদা? তোমার কী বিপদ হয়েছে?'

বৃদ্ধ বলিলেন—'আমার নাতিটি কয়দিন জ্বরবিকারে ভুগছিল। আজ সকালে কবরেজ জবাব দিয়ে গেছে। সে না-বাঁচলে আমার বংশলোপ হবে, আমার ভিটেয় সন্ধে দেবার আর কেউ থাকবে না। তাই মার কাছে তার প্রাণভিক্ষা চাইতে এসেছি।'

কালীকিঙ্কর চণ্ডীপাঠ করিতেছিলেন, তিনি বৃদ্ধের দুঃখে নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া দয়াময়ীর মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন—'মা গো! বুড়োর নাতিটিকে বাঁচিয়ে দিতে হবে, মা' —বলিয়া তিনি বৃদ্ধকে বলিলেন—'দাদা! তোমার নাতিকে এনে মায়ের পায়ের কাছে ফেলে রাখো, যমের বাবার সাধ্য হবে না এখান থেকে নিয়ে যেতে।'

এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ মহা আশ্বস্ত হইলেন। যষ্টিতে ভর দিয়া গৃহাভিমুখে ছুটিলেন।

একদণ্ডকাল পরে বিধবা পুত্রবধূর কোলে নাতিটির সহিত বৃদ্ধ ফিরিয়া আসিলেন। দয়াময়ীর পদতলে বিছানা করিয়া মৃতকল্প শিশুটিকে রাখা হইল। কেবল মাঝে-মাঝে চরণামৃতের পাত্র হইতে কুশি করিয়া একটু-একটু চরণামৃত লইয়া পুরোহিত তাহার মুখে দিতে লাগিলেন।

শিশুর মাতা বিধবা যুবতী, দয়াময়ীর সখি। তাহার ব্যথাকাতর মুখ দেখিয়া

দয়াময়ীর হৃদয় ব্যথিত হইল। শিশুটির পানে চাহিয়া দয়াময়ীর চক্ষে অশ্রু ভরিল। একান্ত মনে দেবতাকে প্রার্থনা করিতে লাগিল, 'হে ঠাকুর, আমি দেবতা হই, কালী হই, মানুষ হই, যেই হই—এই ছেলেটিকে বাঁচিয়ে দাও, ঠাকুর।'

দয়াময়ীর চক্ষে অশ্রু দেখিয়া সকলে বলিয়া উঠিল—'জয় মা কালী, জয় মা দয়াময়ী, মায়ের দয়া হয়েছে—মায়ের চোখে জল।'

কালীকিঙ্কর দ্বিগুণ ভক্তির সহিত চণ্ডীপাঠ করিতে লাগিলেন। বেলা যত বাড়িতে লাগিল, শিশুটির অবস্থা উত্তরোত্তর ততই ভালো হইতে লাগিল। সন্ধ্যার পূর্বে সকলে মত প্রকাশ করিলেন, আর শিশুর জীবনের কোনও আশঙ্কা নাই, স্বচ্ছন্দে বাড়ি পাঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

দয়াময়ীর দেবীত্ব আবিষ্কারের সংবাদ যত-না শীঘ্র চৌদিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহার কৃপায় মুমূর্ষু শিশুর প্রাণরক্ষার সংবাদ অতি সত্বর প্রচারিত হইয়া পড়িল। পরদিন প্রাতেই অপর একজন আসিয়া দয়াময়ীর চরণে নিবেদন জানাইল যে, তাহার কন্যাটি আজ তিনদিন হইতে প্রসব যন্ত্রণায় অস্থির,—মেয়ে বুঝি বাঁচে না। কালী-কিঙ্কর বলিলেন—'তার জন্যে আর চিন্তা কি? মার চরণামৃত নিয়ে মেয়েকে পান করিয়ে দাওগে। এখনি আরাম হবে।'

সে-ব্যক্তি গলদশ্রুলোচনে দয়াময়ীর চরণামৃতের পাত্রটি মাথায় বহন করিয়া লইয়া গেল। বেলা এক প্রহর অতীত হইবার পূর্বেই সংবাদ আসিল, মেয়েটি চরণামৃত পান করিবার অব্যবহিত পরেই নিরাপদে রাজপুত্রের মতো সুন্দর সুলক্ষণ-সম্পন্ন পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছে।

আজ শনিবার। আজ উমাপ্রসাদ স্ত্রীকে লইয়া গোপনে পলায়ন করিবে। সে সমস্ত আয়োজন করিয়াছে। অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে। মুর্শিদাবাদ কিংবা রাজমহল কিংবা বর্ধমান এরূপ কোনও নিকটবর্তী প্রসিদ্ধ স্থানে সে যাইবে না;—যাইলে ধরা পড়ি-বার সম্ভাবনা। নৌকাপথে পশ্চিম যাইবে। অনেক দূর যাইবে,—কোথায়, এখনও তাহার কিছু স্থিরতা নাই। হয় ভাগলপুর, নয় মুঙ্গের। সেখানে চাকরির চেষ্টা করিবে। পথখরচের মতো অর্থ তাহার নিকট আছে। তাহার স্ত্রীর গায়ে যাহা অলংকার আছে, তাহা বিক্রয় করিলে কোন্-না দুই বৎসর উভয়ের গ্রাসাচ্ছাদন চলিতে পারিবে? দুই বৎসরেও কি তাহার একটা চাকরি জুটিবে না? নিশ্চয় জুটিবে। চেষ্টার অসাধ্য কিছু আছে নাকি?

এইরূপ নানা চিন্তায় উমাপ্রসাদ দিবাভাগ অতিবাহিত করিল। ক্রমে সন্ধ্যা

হইল। আজ সে দয়াময়ীর আরতি দেখিবে। একদিনও তো দেখে নাই। যখন শঙ্খ-ঘণ্টার ধ্বনিতে চণ্ডীমণ্ডপ ফাটিয়া যায়, পূজা আরম্ভ হয়, তখন উমাপ্রসাদ বাড়ি ছাড়িয়া গ্রামের বাহিরে পলায়ন করে। আজ দয়াময়ীর শেষ আরতি, আজ সে দেখিবে। দেখিবে আর মনে-মনে হাসিবে। কল্য প্রভাতে পুরোহিত ঠাকুর যখন সর্বাগ্রে আসিয়া দেখিবেন যে দেবী অন্তর্ধান করিয়াছেন, তখন তাঁহার কীরূপ অবস্থা হইবে, তাহাই উমাপ্রসাদ কল্পনা করিতে লাগিল।

রাত্রি দ্বিপ্রহর সমাগত। গৃহস্থ সকলে নিদ্রাগত। চোরের মতো উমাপ্রসাদ শয্যাত্যাগ করিল। অন্ধকারে ধীরপদে পূজার ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। ধীরে-ধীরে দ্বার মোচন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। কোণে সেইরূপ ঘৃতদীপ মিটিমিটি করিয়া জ্বলিতেছে। দয়াময়ীর শয্যায় উমাপ্রসাদ গিয়া বসিল। দয়াময়ী নিদ্রামগ্ন।

প্রথমে উমাপ্রসাদ সযত্নে দয়াময়ীর মুখচুম্বন করিল। পরে গা ঠেলিয়া তাহাকে জাগাইল। নিদ্রাভঙ্গে দয়াময়ী ধড়ফড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল।

উমাপ্রসাদ বলিল—'দয়া—এত ঘুম? ওঠো, চলো।'

দয়া বিস্মিতের মতো বলিল—'কোথায়?'

'কোথায়?—যাবার সময় তুমি জিজ্ঞাসা করছো কোথায়?—চলো, আজ রাত্রে নৌকা করে আমরা পশ্চিমে চলে যাই।'

দয়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে চিন্তা করিল। উমাপ্রসাদ বলিল—'ওঠো-ওঠো, পথে গিয়ে ভেবো এখন। সব ঠিকঠাক করে রেখেছি। চলো, চলো।'

এই কথা বলিয়া উমাপ্রসাদ স্ত্রীর হস্তধারণ করিল। দয়া সহসা হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল—'তুমি আর স্ত্রীভাবে আমাকে স্পর্শ কোরো না। আমি যে দেবী নই, আমি যে তোমার স্ত্রী, তা আর আমি নিশ্চয় করে বলতে পারিনে।'

কথাটা শুনিয়া উমাপ্রসাদ হাসিয়া উঠিল। স্ত্রীর গলা ধরিয়া তাহাকে চুম্বন করিতে যাইতেছিল। কিন্তু দয়াময়ী সহসা তাহার নিকট হইতে অপসৃত হইয়া দূরে বসিল। বলিল—'না-না, হয়তো তোমার অকল্যাণ হবে।'

এ-কথায় উমাপ্রসাদ যেন বজ্রাহত হইল। বলিল—'দয়া, তুমিও পাগল হলে?'

দয়া বলিল—'তবে এত লোকের রোগের আরাম হল কেন? তা হলে কি দেশশুদ্ধ লোক পাগল?'

উমাপ্রসাদ অনেক করিয়া বুঝাইল। অনেক অনুনয় করিল। অনেক কাঁদিল। দয়াময়ীর মুখে কেবল সেই কথা—'না-না, তোমার অকল্যাণ হবে। হয়তো আমি তোমার স্ত্রী নই, হয়তো আমি দেবী।'

শেষকালে উমাপ্রসাদ বলিল—'তুমি দেবী হলে এমন পাষাণী হতে না। এততেও তোমার মন অচল অটল রইল ?'

দয়াময়ী এবার কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিল—'ওগো, তুমি আমাকে বুঝতে পারলে না।'

উমাপ্রসাদ দয়াময়ীর শয্যা ত্যাগ করিয়া কিয়ৎক্ষণ ক্ষিপ্তের মতো সেই কক্ষে অস্থিরভাবে পদচারণা করিয়া বেড়াইল। পরে হঠাৎ দয়াময়ীর কাছে আসিয়া বলিল—'দয়া, আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ হয়েছিল ?'

দয়া বলিল—'তা হয়েছিল বৈকি !'

'তুমি যদি দেবী, তুমি যদি কালী, আমি তো তাহলে মহাদেব, নইলে তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ হল কী করে ?'

এ-কথার দয়া কী উত্তর দিবে ? সে চুপ করিয়া রহিল।

উমাপ্রসাদ আবার আরম্ভ করিল—'তুমি যদি আদ্যাশক্তি ভগবতী হও—তবে নরলোকে কার সাধ্য যে তোমাকে বিবাহ করে ? আমি যে তোমাকে বিবাহ করেছি, এতদিন যে আমি তোমার স্বামীর আসনে অধিষ্ঠিত রয়েছি, এতেই তো বোঝা যাচ্ছে যে আমিও মানুষ নই—আমিও দেবতা, আমি স্বয়ং মহেশ্বর !'

দয়াময়ী বলিল—'যদি তাই হয়, তবে আমি তোমার স্ত্রী। দেবী হই, মানুষ হই, আমি তোমার স্ত্রী।'

এ-কথা শুনিয়া উমাপ্রসাদ যেন হাতে স্বর্গ পাইল। স্ত্রীকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল। বলিল—'চলো, তবে আমরা যাই। এখানে যতদিন থাকবো ততদিন তোমায় আমায় বিচ্ছেদ থাকবে।'

দয়াময়ী বলিল—'তবে চলো।'

খানিকটা হাঁটিয়া গঙ্গার ধারে পৌঁছিয়া নৌকা চড়িতে হইবে। কিন্তু কিছু দূর চলিয়া দয়া সহসা থামিয়া আবার বলিল, 'আমি যাবো না।'

এবার স্বর অত্যন্ত দৃঢ়। উমাপ্রসাদ আবার অনুনয়ের সাধ্যসাধনার পালা আরম্ভ করিল। কিছুতেই কিছু ফলোদয় হইল না।

দয়া বলিল, 'আমি যদি দেবী, তুমি আমার স্বামী মহেশ্বর, তবে দুজনেই এখানে থাকি, দুজনেই পূজা গ্রহণ করি, পালাবো কেন ? এত জনের ভক্তিতে আঘাত দেবো কেন ? আমি পালাবো না, চলো, ফিরে যাই।'

উমাপ্রসাদ মর্মাহত হইয়া বলিল—'তুমি একা ফিরে যাও, আমি যাবো না।'

তাহাই হইল। দয়া একা দেবীত্বে ফিরিয়া গেল। উমাপ্রসাদ সেই নিশীথ অন্ধকারে মিলাইয়া গেল, পরদিন তাহার আর কোনও উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

দয়াময়ীর দেবীত্বে সকলেই বিশ্বাসবান, কেবল বিশ্বাস করে নাই তাহার বড়ো-জা হরসুন্দরী—খোকার মা। প্রথম দুই-চারি দিন তাই বড়োবধূই দয়াময়ীর জুড়াইবার ঠাঁই হইয়াছিলেন। প্রথম যখন স্বয়ং দয়াময়ীই বিশ্বাস করিতে চাহে নাই যে সে দেবী, তখন সে একদিন বড়োবধূর কাছে গিয়া কাঁদিয়া পড়িয়াছিল—'দিদি, আমার এ কী হল?'

তিনি বলিয়াছিলেন—'কী করবো, বোন, ঠাকুর পাগল হয়ে গিয়েছেন। বুড়ো বয়সে ওনার ভীমরতি ধরেছে।'

উমাপ্রসাদের নিরুদ্দেশের পর দুই সপ্তাহ গেল। তৃতীয় সপ্তাহে খোকার জ্বর হইল। দিন-দিন ছেলে শুকাইয়া যাইতে লাগিল।

বৈদ্য আসিল, কিন্তু কালীকিঙ্কর তাহাকে চিকিৎসা করিতে দিলেন না। বলিলেন—'আমার বাড়িতে স্বয়ং মার অধিষ্ঠান, কত-কত দুঃসাধ্য রোগ মার চরণামৃত পান করে ভালো হয়ে গেল, আর আমার বাড়িতে রোগ হলে বৈদ্য এসে চিকিৎসা করবে?'

বড়োবধূ নিজ স্বামী তারাপ্রসাদের কাছে কাঁদিয়া পড়িলেন—'ওগো, ছেলেকে বদ্যি দেখাও গো, নইলে আমার ছেলে বাঁচবে না। ও রাক্কুসি ডাইনি—আমার ছেলেকে বাঁচাতে পারবে না। ওর কী সাধ্যি!'

তারাপ্রসাদ অত্যন্ত পিতৃভক্ত। পিতার বিশ্বাস, মাতার বিধান, এ-সমস্ত তিনি বেদের মতো মান্য করেন। তিনি স্ত্রীকে বলিলেন—'খবরদার, ও-কথা বোলো না, ছেলের অকল্যাণ হবে। মা যা করবেন, তাই হবে।'

কিন্তু বড়োবধূর প্রতিদিনকার কাকুতি-মিনতি ও ক্রন্দনে কর্তা একদিন গলবস্ত্র হইয়া দয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'মা, খোকার যে-ব্যারাম হয়েছে, তাতে বৈদ্য দেখাবার প্রয়োজন আছে কি?'

দয়াময়ী বলিল—'না, আমিই ওকে ভালো করে দেবো।'

কালীকিঙ্কর নিশ্চিন্ত হইলেন। তারাপ্রসাদও নিশ্চিন্ত হইলেন।

খোকার মা একদিন একটি বিশ্বস্ত ঝিকে কবিরাজের কাছে পাঠাইয়া দিলেন—যাহা কিছু রোগের বিবরণ সব বলিয়া দিলেন। ঔষধ চাই। কবিরাজ মহাশয় এ-প্রস্তাব শুনিয়া দন্তে জিহ্বা দংশন করিয়া বলিলেন—'মাঠাকুরুনকে বলিস, যখন স্বয়ং শক্তি বলেছেন তিনিই খোকাকে আরোগ্য করে দেবেন, তখন ওষুধের ব্যবস্থা করে অপরাধী হতে পারবো না।'

যাহার সঙ্গে দেখা হয়, তাহাকেই খোকার মা কাঁদিয়া বলেন—'ওগো, কিছু ওষুদ বলে দাও, আমার ছেলে বাঁচে না।'

সকলেই বলে—'ওমা, ও-কথা বোলো না, তোমার ভাবনা কী? তোমার ঘরে স্বয়ং আদ্যাশক্তি বিরাজ করছেন।'

খোকাব ব্যারাম ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল। দয়া বলিল, 'খোকাকে এনে আমাব কোলে দাও।'

খোকাকে কোলে কবিয়া দয়া সমস্ত দিন বসিয়া রহিল। কিন্তু রাত্রে আবাব খোকার ব্যারাম বৃদ্ধি হইল।

দযাময়ী একান্ত মনে একান্ত প্রাণে কত করিয়া খোকাকে আশীর্বাদ কবিল, খোকাব গাযে হাত বুলাইল, কিন্তু কিছুতেই খোকা বাঁচিল না।

যখন খোকার মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হইল তখন তারাপ্রসাদ অধীর হইয়া ছুটিয়া আসিল—দয়াময়ীকে বলিল—'বাক্ষসি, খোকাকে নিলি? কিছুতেই মায়া ত্যাগ কবতে পারলিনে?'

খোকার মা প্রথমে শোকে অত্যন্ত বিহ্বল হইল। যখন কতকটা সুস্থ হইল তখন দয়াময়ীকে যা মুখে আসিল তাই বলিয়া গালি দিল। বলিল—'ও দেবী কোথায়? ও ডাইনি। দেবী কখনও ছেলে খায়?'

কালীকিঙ্কর ছলছল নেত্রে দয়ার পানে চাহিয়া বলিলেন—'মা, খোকাকে ফিরিয়ে দে। এখনও দেহ নষ্ট হয়নি। ফিরিয়ে দে, মা, ফিরিয়ে দে।'

দয়াময়ী ঝরঝর করিয়া কাঁদিতে লাগিল। মনে-মনে যমরাজকে উদ্দেশ করিয়া আজ্ঞা করিল, এখনি খোকার আত্মা খোকার শরীরে ফিরাইয়া দেওয়া হউক।

তাহাতে যখন হইল না, তখন মিনতি করিল;—আদ্যাশক্তির মিনতিতেও যমরাজ খোকার প্রাণ ফিরাইয়া দিলেন না।

তখন নিজের দেবীত্বে দয়ার অবিশ্বাস জন্মিল।

আজ তাহার পূজা ইত্যাদি বন্ধ বলিলেই হয়। সমস্ত দিন কেহ তাহার কাছে আসিল না। দয়া একাকিনী বসিয়া সারাদিন চিন্তা করিল।

সন্ধ্যা হইল। আরতির সময় উপস্থিত। যেমন-তেমন করিয়া আরতি হইল।

পরদিন কালীকিঙ্কর উঠিয়া পূজার ঘরে গিয়া দেখিলেন, সর্বনাশ!—পরিধেয় বস্ত্র রজ্জুর মতো করিয়া পাকাইয়া, কড়িকাঠে লাগাইয়া দেবী আত্মহত্যা করিয়াছেন।

সদ্গতি

প্রেমচন্দ

দুখি চামার দোরগোড়ায় ঝাঁট দিচ্ছিল আর তার বউ ঝুরিয়া গোবর দিয়ে মেঝে নিকোচ্ছিল। হাতের কাজ শেষ হয়ে একটু ফুরসৎ পেতেই চামারনি বললে, 'ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে আসতে বলবে না? এখুনি না-গেলে শেষে হয়তো কোথাও বেরিয়ে যাবে।'

দুখি বললে – 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, যাচ্ছি তো। – কিন্তু ব্রাহ্মণ এসে বসবে কোথায় সেটা একবার ভাবতে হবে তো।'

'কোথাও কি একটা খাটিয়া পাওয়া যাবে না? মোড়ল-গিন্নির কাছ থেকে চেয়ে আনিস।'

'মাঝে-মাঝে তুই এমন কথা বলিস যে শুনে গা জ্বলে যায়। ঠাকরুনের কাছে চাইলেই আমাকে খাটিয়া দেবে, না? আগুন ধরাবার জন্য যারা একটা আঙার অব্দি দেয় না, তারা দেবে একটা খাটিয়া—অ্যাঁ? ওরা যদি এমন জায়গায়ও থাকে যেখানে আমি গেলে কোনো দোষ নেই, সেখানেই এক আঁজলা জল চাইলে যারা দেবে না, তারা দেবে খাটিয়া! একি আমাদের ঘুঁটে, ভূষি বা লাকড়ি—যে যখন খুশি কেউ গিয়ে তুলে আনলেই হলো! তুই বরং আমাদের চৌকিটাই ধুয়ে বাইরে রোদে দিয়ে দে – এই গরমে ব্রাহ্মণ আসতে-আসতেই সেটা শুকিয়ে যাবে।'

'ব্রাহ্মণ আমাদের চৌকিতে বসবেই না,' ঝুরিয়া বললে। 'জানিসই তো নিয়মধর্ম নিয়ে তার কী খুঁতখুঁত—শাস্তরের বাইরে সে যাবেই না।'

কিছুটা চিন্তিত হয়ে দুখি বললে, 'হ্যাঁ, তা ঠিক। আমি বরং কতগুলো মহুয়া পাতা দিয়ে একটা চ্যাটাই বুনে দি—তাতেই ঠিক হবে। বড়ো-বড়ো মানুষেরা যখন মহুয়া পাতা খায়, তখন মহুয়া পাতা নিশ্চয়ই শুদ্ধ, পবিত্র। আমার লাঠিটা দে, কয়েকটা পাতা নিয়ে আসি।'

'আসন বরং আমিই বানিয়ে নেবো, তুমি বরং ওঁর কাছে চ'লে যাও। কিন্তু উনি এলে তো ওঁকে সিধে দিতে হবে—বাড়ি গিয়ে যাতে ভোগ খেতে পারেন। আমাদের থালায় সাজিয়ে রাখি—'

'খবরদার, ভুলেও অমন অধম্ম করিসনে!' দুখি হাঁ-হাঁ ক'রে উঠল। 'তোর থালায় সাজিয়ে দিলে সিধেটাই নষ্ট হবে, থালাটাও ভাঙবে। ঠাকুরমশাই থালাটা

তুলে আছড়ে মারবে। যা রগচটা লোক, পান থেকে চুন খসলেই রেগে কাঁই, রাগলে পণ্ডিতাইনকেও ছেড়ে কথা কয় না। সেদিন নিজের ছেলেটাকেই এমন মার মেরেছিল যে সে এখনও ভাঙা হাত নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সিধেটা বরং একটা পাতাতেই রেখে দিস। শুধু ওটা তুই নিজে ছুঁসনে। ঝুরি গোঁড়ের মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বেনের দোকান থেকে যা-যা দরকার সব নিয়ে আসিস। সিধে যেন পুরোপুরি থাকে—পুরো একসের আটা, আধসের চাল, পোয়াভর ডাল, আধ পো ঘি, নুন, হলুদ, আর পাতার এক কোণে একটা সিকি রেখে দিস। গোঁড়ের মেয়েকে না-পেলে ঐ যে ভুর্জিন আছে, ওকে নিয়ে যাস—দরকার হলে হাতে-পায়ে ধ'রে নিয়ে যাবি। কিন্তু, খবরদার, তুই কিছুতেই ছুঁবি না, তাহলেই কেলেঙ্কারি হবে।'

এইসব পই-পই ক'রে ব'লে দুখি তার লাঠিটা তুলে নেয়, তারপর একটা মস্ত ঘাসের গাঁঠরি নিয়ে বেরিয়ে যায় পণ্ডিতকে নিবেদন করবার জন্য। খালি হাতে গিয়ে কি আর পণ্ডিতের সেবা হবে—তাঁকে সে দয়া ক'রে আসতে বলবে; কিন্তু ঘাস ছাড়া আর কীই বা ভেট দেবে? কোনো নজরানা ছাড়া তাকে আসতে দেখলেই পণ্ডিতজি ওকে ঠিক দূর-দূর করে তাড়িয়ে দেবে।

ঘাসিরাম পণ্ডিত ঈশ্বরের পরম ভক্ত। ঘুম ভাঙতে-না-ভাঙতেই তাঁর শাস্ত্রকর্ম শুরু হয়ে যায়। হাত-মুখ ধুয়ে আটটার মধ্যেই উনি আসল পুজোর কাজে লেগে পড়েন —যার প্রথম দফা কাটে ভাঙ বানাতে। তারপর তিনি আধ ঘণ্টা ধ'রে চন্দন ঘষেন, তারপর আয়নার সামনে ব'সে একটা কুটো দিয়ে কপালে তিলক কাটেন। চন্দনের দুই রেখার মধ্যে গোল ক'রে গেরিমাটির একটা টিপ আঁকেন। তারপর বুকে হাতে গোল-গোল ক'রে সব শুদ্ধ চিহ্ন আঁকেন। তারপর ঠাকুর-মূর্তি বার ক'রে এনে তাকে তিনি স্নান করান, চন্দন মাখান, ফুল দিয়ে সাজান, দীপ জ্বেলে আরতি করেন, ঘণ্টা বাজান। দশটা নাগাদ পুজো সেরে ওঠেন, ভাঙের সরবৎ খেয়ে বাইরে আসেন। ততক্ষণে দু-চারজন যজমান এসে বাইরে হাজির হয়েছে; তাঁর ভক্তির পুরস্কার হাতে-হাতে মিলে যায়: এরাই তাঁর সোনার ফসল।

আজ তিনি ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়েই দেখতে পেলেন অচ্ছুৎ দুখি চামারটা এক আঁটি ঘাস সামনে নিয়ে বসে আছে। তাঁকে দেখবামাত্র দুখি উঠে দাঁড়ায়, সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ হয়ে প'ড়ে যায় ভুঁয়ে, তারপর হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে।

পণ্ডিতের তেল চকচকে দেহ দেখে দুখির হৃদয় শ্রদ্ধায় ভক্তিতে সম্ভ্রমে ভ'রে যায়। কী দিব্য মূর্তি! —একটু ছোটোখাটো গোলগাল নধর কান্তি, মাথায় চকচকে টাক, ফোলা-ফোলা গাল, ব্রহ্মতেজে চোখ দুটি ঝলসাচ্ছে! মেটে সিঁদুর আর চন্দনের দাগ তাঁকে একেবারে দেবতা বানিয়ে দিয়েছে। দুখিকে দেখে তাঁর শ্রীমুখ ফুটে বাণী বেরোয় 'আজ কী ভেবে এলি রে, দুখিয়া?'

মাথা নিচু ক'রে দুখি বলে: 'বিটিয়ার সাঙা দেবো। মহারাজ যদি একটা শুভ দিন ক্ষণ দেখে দেন। কখন ইচ্ছে হবে?'

'আজ তো আমার একটুও ছুটি নেই,' পণ্ডিতজি বলেন। 'আচ্ছা, ঠিক আছে, সাঁঝের বেলায় যেতে পারবো।'

'না, মহারাজ, একটু তাড়াতাড়ি যদি আজ্ঞা করেন। সব জোগাড়যন্তোর ক'রে রেখে এসেছি। এই ঘাসের বোঝাটা কোথায় রাখবো, মহারাজ?'

'এই গাইটার সামনে রেখে দে, আর ত্যাখ, এই ঝাঁটাটা দিয়ে দোরগোড়াটা একটু সাফ ক'রে দে,' পণ্ডিতজি বললেন, 'এই মণ্ডপটাও ক-দিন নিকোনো হয়নি, ওটাও একটু গোবর দিয়ে নিকিয়ে দিস। তুই এ-কাজগুলো করতে-করতে আমি খাওয়া-দাওয়া সেরে নেবো—তারপর একটু আরাম ক'রে যাবো। ও, হ্যাঁ, আর এই কাঠটাও একটু ফালা ক'রে দিস। গোয়ালঘরে দেখবি, চার ঝুড়ি ভুষি পড়ে আছে—ওগুলো তুলে এনে মড়াইয়ে রেখে দিস।'

দুখি সঙ্গে-সঙ্গে হুকুম তামিল করতে শুরু ক'রে দেয়। দোরগোড়ায় ঝাঁট দেয়, মণ্ডপটা গোবর দিয়ে নিকোয়। এতেই বেলা দুপুর হয়ে গেল। পণ্ডিতজি চ'লে গেলেন তাঁর মধ্যাহ্নভোজনে। দুখি সকাল থেকেই কিছু খায়নি, তার বেজায় খিদে পেয়ে যায়। কিন্তু এখানে সে খাবেই বা কী। বাড়ি তার প্রায় মাইল খানেক দূরে —সেখানে খেয়ে আসতে গেলে পণ্ডিতজি রেগে যাবেন। বেচারা কোনোমতে খিদে চেপে কাঠটা চিরতে শুরু ক'রে দেয়। কাঠের গুঁড়িটা বেজায় মোটা; পণ্ডিতজির অনেক ভক্তই এর আগে গুঁড়িটার গায়ে গায়ের জোর পরখ ক'রে দেখেছে—কিন্তু গুঁড়িটাও যেন কুড়ুলের ঘা সামলাবার জন্যে তৈরি। দুখির কাজ হলো ঘাস কেটে বাজারে নিয়ে গিয়ে বেচা—কাঠ চেরার কাজে তার কোনো এলেমই নেই। তার কাস্তের সামনে ঘাসেরা সব মাথা নুইয়ে দেয়, কিন্তু এখন গায়ের জোরে কুড়ুল চালিয়েও গুঁড়িটার গায়ে সে একটা আঁচড়ও কাটতে পারে না। কুড়ুলটা বরং গুঁড়িটা থেকে হড়কে যায়। ঘামে তার শরীর ভিজে যায়, হাঁপাতে থাকে, অবসন্ন হয়ে ব'সে পড়ে, তারপর আবার উঠে দাঁড়ায়। হাত দুটো

তোলবারও শক্তি তার নেই যেন, পা দুটি টলছে, কোমর সোজা করতে পারে না। তারপর তার চোখ ঝাপশা হ'য়ে এল, চোখের সামনে যেন একরাশ সর্ষেফুল, মাথাটা ঘুরছে, কিন্তু তবু সে চালিয়েই যায় চেষ্টাটা। এ-সময় যদি এক ছিলিম তামাক পাওয়া যেতো তবে হয়তো গায়ে একটু তাকৎ আসত। কিন্তু এটা তো ব্রাহ্মণদের মহল্লা, আর ব্রাহ্মণেরা এ-সব নিচু জাতের অচ্ছুৎদের মতো তামাক টানে না। হঠাৎ তার মনে প'ড়ে গেল যে গাঁয়ে একঘর গোঁড়জাতের লোক থাকে, তার কাছে নিশ্চয়ই এক ছিলিম তামাক পাওয়া যাবে। তক্ষুনি সে তার বাড়ির দিকে ছুটে যায়, আর কপালটাও তার ভালো। গোঁড় লোকটা তাকে কলকে আর তামাক এগিয়ে দেয়, কিন্তু আগুন নেই যে! দুখি বলে—'আগুনের জন্যে ভেবো না। পণ্ডিতজির ঘর থেকে চেয়ে নেবো—একটু আগেও ওখানে রান্না হচ্ছিল।'

এই ব'লে সে তামাক আর ছিলিম নিয়ে এসে ব্রাহ্মণের বাড়ির দাওয়ার সামনে দাঁড়িয়ে বলে—'কর্তাঠাকুর, একটু যদি আগুন পাই তো ছিলিম টানি।'

পণ্ডিতজি তখন খাচ্ছিলেন। তাঁর গৃহিণী জিগেস করলেন—'কে লোকটা? আগুন চাইছে?'

'ঐ হতচ্ছাড়া দুখি চামার। ওকে বলেছিলাম কিছু কাঠ কেটে দিতে। তা আগুন তো আছেই, ওকে একটু দিয়ে দাও।'

ভুরু কুঁচকে পণ্ডিতাইন বললেন—'ঐ পুথিপত্র আর ঠিকুজিকুষ্ঠিতে নাক গুঁজে প'ড়ে থেকে-থেকে তোমার আক্কেলটা একবারে গেছে—জাতধম্মো সম্বন্ধে সব বোধ-বিচার খুইয়ে ব'সে আছো। ধোপা নাপিত চামার যার খুশি যখন-তখন সোজা ঘরে চ'লে আসে—যেন তার বাপের সম্পত্তি। হিন্দুবাড়ি নয় তো, যেন একটা সরাইখানা। হতভাগাকে চ'লে যেতে ব'লে দাও, নইলে চ্যালা কাঠে ওর মুখ পুড়িয়ে দেবো।'

তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা ক'রে পণ্ডিতজি বললেন—'ভেতরে এসেছে তো কী হয়েছে? তোমার তো আর কিছু খোয়া যায়নি। মাটি, মাটিই—পবিত্র জিনিস—এসেছে ব'লেই কোনো জাত চ'লে যায়নি তার। দিয়ে দাও না একটু আগুন, চ'লে যাক। ও তো আমাদেরই কাজ করছে, না কী? কোনো কাঠুরেকে দিয়ে এই কাঠ চেরাতে হ'লে কম ক'রেও চারআনা পয়সা নিতো।'

মেজাজ গরম ক'রে পণ্ডিতাইন বললেন—'তাই ব'লে বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়বে?'

পণ্ডিত বললেন—'ব্যাটার পোড়া কপাল—তাছাড়া আর কী বলবো?'

'ঠিক আছে,' পণ্ডিতাইন গজগজ করলেন, 'এবারকার মতো আগুন দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু ফের যদি কখনো হুট ক'রে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে তো মুখে নুড়ো জেলে দেবো।'

কথাবার্তার টুকরো দুখির কানে ঠিক পৌঁছে গিয়েছিল। শুনে সে আপশোশই করছিল : এভাবে এসে-পড়া তার ঠিক হয়নি। উনি তো সত্যি কথাই বলছেন— কোনো চামার কী ক'রে কোনো বামুন বাড়িতে ঢুকে পড়বে? এঁরা সব পবিত্র শুদ্ধ মানুষ, মানীগুণী লোক, সেইজন্যেই তো পৃথিবীশুদ্ধ লোক এঁদের পুজো করে, জানে, মানে। চামার আবার মানুষ না কি? এই গাঁয়েই তার এতটা বয়স কাটলো, অথচ এই সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানটা কিনা তার হলো না।

তাই পণ্ডিতগিন্নি যখন জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন তার মনে হলো সে যেন স্বর্গ থেকে বর পেলো। হাতজোড় ক'রে মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে বললে, 'মা, এভাবে বাড়ির মধ্যে ঢুকে প'ড়ে আমি ভীষণ ভুল করেছি। চামারের আর কত বুদ্ধি হবে— আমরা যদি এমনি মুখ্যু না-হতাম তো এত লাথি-ঝাঁটা খাবো কেন?'

পণ্ডিতাইন চিমটেয় ক'রে অঙ্গার নিয়ে এসেছিলেন। কয়েক হাত দূর থেকে, মুখের ওপর ঘোমটা টেনে, তিনি দুখির দিকে আগুন ছুঁড়ে মারেন। একটা বড়ো জ্বলন্ত অঙ্গার তার মাথায় গিয়ে পড়ে, তাড়াতাড়ি পেছনে স'রে গিয়ে সে মাথা ঝাড়তে থাকে। মনে-মনে নিজেকে বলে— 'দেখলি তো, বামুনদের বাড়ি অপবিত্র করলে হাতে-নাতে কেমন ফল পেতে হয়! সাজা দিতে ভগবান একচুলও দেরি করেননি। সেইজন্যেই সারা দুনিয়া পণ্ডিতদের এত ডরায়। আর সকলেরই টাকা-পয়সা মার যায়, কিন্তু কোনো বামুনের টাকা কে কবে শোধ না-ক'রে পার পেয়েছে? যে-ই বামুনদের টাকা মারবার চেষ্টা করেছে সে-ই ঝাড়েবংশে নির্মূল হয়েছে— হাত-পা কুষ্ঠরোগে প'চে গ'লে গিয়েছে।'

বাইরে বেরিয়ে গিয়ে সে ছিলিম টানে, তারপর কুড়ুল তুলে নিয়ে আবার কাজে লেগে পড়ে।

তার মাথায় কয়লার টুকরো প'ড়ে গিয়েছিল ব'লে পণ্ডিতগিন্নির তার প্রতি একটু দয়া হলো। পণ্ডিতজি খেয়ে ওঠার পর তাঁকে বললেন, 'ঐ চামারটাকে কিছু খেতে দাও, বেচারা কতক্ষণ ধ'রে কাজ ক'রে যাচ্ছে, ওর নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে।'

পণ্ডিতজি একেবারে স্বভাববিরুদ্ধ ভাবেই প্রস্তাবটা বিবেচনা ক'রে দ্যাখেন। জিগেস করেন— 'রুটি আছে?'

'দু-চারটে থাকতে পারে।'

'দু-চারখানি রুটিতে একটা চামারের আর কী হবে? এ-সব লোক কম ক'রেও একসের খেয়ে ফেলবে।'

পণ্ডিতগিন্নি কানে হাত চাপা দিয়ে বলেন—'বাব্বা! একসের! তাহ'লে থাকুকগে।'

পণ্ডিতজি প্রসন্নবদনে দরাজভাবে বলেন: 'কিছু ভুষি-খোশা থাকলে আটায় মিশিয়ে দুটো লিট্টি গ'ড়ে দাও। তাতে বেটার পেট ভরবে। এ-সব ফুলকো পাৎলা রুটিতে ছোটোলোকগুলোর পেট ভরবে না। এদের জন্যে চাই জোয়ারের লিট্টি।'

'যেতে দাও,' পণ্ডিতাইন বললেন, 'এই গরমে আমি এখন আবার রান্না ক'রে ম'রি আর কী!'

তামাক টেনে কুড়ুলটা হাতে তুলে নেবার পর দুখি যেন আবার হাতে খানিকটা বল পায়। আধঘণ্টা ধ'রে সে কুড়ুল চালায়, তারপর হাঁপাতে-হাঁপাতে কাহিল হ'য়ে দু-হাতে মাথা ধ'রে ব'সে পড়ে।

এদিকে সেই গোঁড় এসে হাজির। সে বলে: 'কেন মিছেমিছি বেঘোরে প্রাণটা খোয়াচ্ছো? তুমি যত খুশি কুড়ুল চালাও, এই কাঠের গুড়িটা কাটা তোমার কম্মো নয়। খামকা খেটে মরছো।'

কপাল থেকে ঘাম মুছে দুখি বলে—'এখনও একগাড়ি ভুষি বইতে হবে, ভাই।'

'বলি, খেয়েছো কিছু? খাবার-টাবার কিছু দিয়েছে? না কি তোমাকে কেবল খাটিয়েই মারছে? গিয়ে চাইছো না কেন?'

'আরে, চিখুরি, বলিস কী? ঐ বামুনের রুটি আমার হজম হবে?'

'হজম করাটা তো আর মুশকিল নয়—আগে তো সেটা পেতে হবে। নিজে বেশ পায়ের ওপর পা তুলে ব'সে কাটায়, রাজার মতো দিব্যি আয়েস ক'রে খেয়ে এখন নাক ডাকাচ্ছে—এদিকে তোমায় হুকুম দিয়ে গেছে কাঠ কাটতে। সরকারের লোক জোর ক'রে খাটিয়ে নেয় বটে, কিন্তু কম হোক, আর যা-ই হোক, একটা কিছু মজুরি দেয়। এ তো দেখছি আরো-এককাঠি সরেশ, এদিকে নিজেকে আবার ধাম্মিক ব'লে জাহির করে।'

'আস্তে বলো, ভাই, শুনতে পেলে ঝামেলা বাধবে।'

এই ব'লে দুখি আবার কাজে লেগে যায়, জোরে-জোরে কুড়ুল মারতে থাকে

কাঠটায়। তার দশা দেখে চিখুরির এতটা দুঃখ হয় যে সে এসে কুড়ুলটা তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে প্রায় আধঘণ্টা ধ'রে নিজেই জোরে-জোরে কুড়ুলটা হাঁকাতে থাকে। কিন্তু গুঁড়িটার গায়ে একটা চিড়ও ধরে না। তখন সে কুড়ুলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে, 'যতই কুড়ুল চালাও না কেন, এর গায়ে তুমি আঁচড়টিও কাটতে পারবে না, মিথ্যেই তুমি নিজেকে খাটিয়ে মারছো,' ব'লে সে ফিরে যায়।

দুখি ভাবতে শুরু করে, 'বাবামশাই কোথেকে এমন-একটা কাঠের গুঁড়ি জোগাড় করলো যে তাতে একটুও চিড় খায় না। একটা আঁচড় অব্দি পড়েনি এতক্ষণে। আর কতক্ষণ ধ'রে এটাকে ঘা দিই? এদিকে ঘরে যে হাজারটা কাজ প'ড়ে আছে। আমাদের মতো লোকের ঘরে কি কাজকর্মের অভাব আছে—সবসময় একটা-না-একটা কাজ লেগেই আছে। ওঁর কিন্তু সে নিয়ে কোনো ভাবনা নেই। থাক, বরং ভুষির বোঝাটা নিয়ে গিয়ে বলি, "বাবা, কাঠটা তো চেরা গেলো না—কাল এসে বরং চিরে দেবো।"'

ঝুড়িটা তুলে সে ভুষি বইতে শুরু করে। খামার থেকে এখানে কম ক'রে সিকি মাইল। ঝুড়িটাকে যদি ঠেশে ভ'রে ফেলা যায় তাহ'লে কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ হয়, কিন্তু ঝুড়িটা তার মাথায় তুলে দেবে কে? একা সে নিজে পুরোপুরি ঠেশে ভরা ঝুড়ি মাথায় তুলতে পারবে না, ফলে সে একটু-একটু ক'রে নেয়। ভুষির ব্যাপারটা যখন চুকলো, তখন প্রায় চারটে বাজে। পণ্ডিত ঘাসিরামের এতক্ষণে ঘুম ভাঙে, মুখ-হাত ধোন, পান খান, তারপর ধীরেসুস্থে বাইরে বেরিয়ে আসেন। ছাখেন, দুখি ঝুড়ির ওপর মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে। অমনি জোর গলায় হেঁকে ওঠেন: 'আরে! দুখিয়া, তুই ঘুমোচ্ছিস? কাঠ তো দেখছি এখনও যেমনকে তেমন প'ড়ে আছে। এতক্ষণ তাহ'লে তুই করছিলি কী? একমুঠো ভুষি তুলতেই সাঁঝ ক'রে দিলি, তার ওপর কিনা ঘুম লাগাচ্ছিস? নে, নে, কুড়ুল তোল, যা, কাঠটা চিরে ফ্যাল। তুই তো দেখছি কাঠটার গায়ে একটা আঁচড়ও কাটিসনি। এরপর যদি তোর মেয়ের বিয়ের জন্য ভালো দিনক্ষণ পাওয়া না-যায়, আমাকে কিন্তু দোষ দিসনে। এই জন্যেই লোকে বলে, ছোটো জাতের ঘরে খাবার জুটলেই সে আর কাউকে কোনো রেয়াৎ করে না।'

দুখি আবার কুড়ুল তোলে। একটু আগেই কী-সব বলবে ব'লে ভেবেছিল সব বেমালুম ভুলে যায়; পেট তার পিঠের সঙ্গে লেপ্টে গিয়েছে, সকালেও পেটে দানা-পানি কিছু পড়েনি। তার সময়ই হয়নি। এখন উঠে দাঁড়াতেও অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে। তার মনটা একেবারে কুঁকড়ে গেলো, কিন্তু সে কেবল একটুক্ষণ: এ বাপু হেঁজিপেঁজি

কেউ নয়, স্বয়ং পণ্ডিত, উনি যদি বিচার ক'রে শুভক্ষণ দেখে না-দেন বিয়েটা তাহ'লে যে একেবারে বরবাদ হ'য়ে যাবে ! পণ্ডিতদের যে সংসারে এত মানসম্ভ্রম, সে তো এই জন্যেই যে এঁরাই সঠিক বিচার ক'রে ব'লে দেন কোনদিন শুভ, সব ওঁর ওপর নির্ভর ক'রে আছে। উনি চাইলে যে কারুর সর্বনাশ ক'রে দিতে পারেন। পণ্ডিতজি কাঠটার কাছে এগিয়ে আসেন, কাছে দাঁড়িয়ে তাকে উৎসাহ দিতে থাকেন। 'হাঁ-হাঁ, এইসা লাগা, ক'ষে লাগা, দারুণ ক'ষে—ওরে, জোরে হাঁকা, আরো জোরে, কী রে, তোর হাতে কোনো জোর নেই নাকি ? জোরসে লাগা, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাবছিস কী ? জোরে লাগা—এই তো, চিরলো ব'লে, ঐ তো একটা ফাটল ধরেছে !'

দুখির কোনো আর হুঁশ নেই ; যেন কোন গোপন অদৃশ্য শক্তি তার হাতে এসে ভর করেছে। অবসাদ, ক্ষুধা, দুর্বলতা যেন সব কোথায় হঠাৎ উধাও হ'য়ে গেছে। নিজের শক্তি দেখে সে নিজেই তাজ্জব হ'য়ে যায়। কুড়ুলের ঘা পড়ছে পর-পর, যেন পর-পর বজ্রপাত হচ্ছে। কুড়ুলটা এই রকম বেহুঁশ ভাবে চালাতে-চালাতে একসময় কাঠটা হঠাৎ মাঝখানে ফেটে যায়। আর দুখির হাত থেকে কুড়ুলটা খ'শে প'ড়ে যায়। আর সঙ্গে-সঙ্গে সেও প'ড়ে যায় মাথা ঘুরে, তার ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, অবসন্ন শরীর জবাব দিয়ে দেয়।

পণ্ডিতজি ডাকেন, 'আরে, ওঠ, আরো দু-চারটে ঘা দে। ছোটো-ছোটো লাকড়ি বানিয়ে দে।' দুখি ওঠে না। তাকে এখন আরো ঘাঁটানো আর ভালো মনে হয় না পণ্ডিত ঘাসিরামের। তিনি বাড়ির মধ্যে গিয়ে ভাঙের সরবৎ খান, পায়খানা যান, স্নান করেন, তারপর পুরো পণ্ডিতিমহিমায় সজ্জিত হ'য়ে বেরিয়ে আসেন। দুখি তখনও ঐ ভাবে ভুঁয়ে প'ড়ে আছে। পণ্ডিতজি হাঁক পাড়েন : 'ওরে, দুখি, এখনও কি তুই এভাবে প'ড়ে থাকবি না কি ? ওঠ, ওঠ, চল, তোরই বাড়ি যাচ্ছি এখন ! সব জিনিসপত্তর ঠিকঠাক আছে তো ?' কিন্তু দুখি তবু ওঠে না।

একটু শঙ্কিত হ'য়ে পণ্ডিতজি আরো কাছে এসে দেখলেন দুখি একেবারে আড় হ'য়ে প'ড়ে আছে, সারা দেহটা কুঁকড়োনো। পণ্ডিতজি আঁৎকে বাড়ির মধ্যে ছুটে আসেন, গৃহিণীকে বলেন—'শোনো, দেখে মনে হচ্ছে দুখি বোধহয় ম'রে গেছে।'

পণ্ডিতাইন কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলেন—'কিন্তু ও না এতক্ষণ কাঠ কাটছিল ?'

'কাঠ কাটতে-কাটতেই ম'রে গিয়েছে। কী হবে এবার ?'

একটু শান্ত হ'য়ে পণ্ডিতাইন বলেন—'হবে আবার কী ? চামার পাড়ায় খবর পাঠাও, ওরা এসে মড়া তুলে নিয়ে যাক।'

পলকের মধ্যে সারা গ্রাম খবরটা জেনে গেলো। শুধু ঐ গোঁড়েদের কুড়েটা বাদে পুরো এলাকাটাতেই ব্রাহ্মণদের বাস। ওদিক দিয়ে যে-রাস্তাটা গেছে, সবাই তা থেকে দূরে-দূরে থাকে। অথচ কুয়োটায় যাবার একটাই পথ, আর সেটা এটাই। এখন এরা জল আনবে কী ক'রে? চামারের লাশের পাশ কাটিয়ে গিয়ে কে যাবে জল আনতে? এক বুড়ি পণ্ডিতজিকে বলে, 'মড়াটা সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করছো না কেন? গাঁয়ের কেউ কি আর জল খাবে না নাকি?'

গোঁড় এদিকে গাঁ থেকে বেরিয়ে চামার পাড়ায় গিয়ে সব্বাইকে সব খুলে বলে। 'খবরদার!' সে সাবধান ক'রে দেয়, 'মড়া আনতে যেয়ো না। এখনও পুলিশের তদন্ত হয়নি। ঠাট্টা না কি, খুশি মতো কেউ এসে গরিবের প্রাণ নিয়ে নেবে! এই কেউটি একজন পণ্ডিত হ'তে পারেন—তা ঐসব পণ্ডিতি সব নিজের বাড়িতে। লাশ তুলতে গেলে তোমাদেরও হাতে দড়ি পড়বে।'

ঠিক তার পরেই পণ্ডিতজি এসে হাজির। কিন্তু মহল্লার কেউই গিয়ে লাশ তুলে আনতে রাজি হয় না। শুধু দুখির বউ আর মেয়ে হায়-হায় করতে-করতে পণ্ডিতজির দোরগোড়ায় গিয়ে মাথার চুল ছিঁড়তে-ছিঁড়তে অঝোরে কাঁদতে থাকে। আরো জনা দশ চামারনিও যায় তাদের সঙ্গে, তারাও হায়-হায় ক'রে কাঁদে, সান্ত্বনা দেয়, বোঝায়, কিন্তু লাশ তুলে নেবার জন্য কোনো পুরুষ আসে না তাদের সঙ্গে। পণ্ডিতজি তাদের ধমকে ভয় দেখান, বোঝান, অনুনয়-বিনয় করেন, কিন্তু পুলিশের ভয়ে তারা কুঁকড়ে আছে, তারা কেউ গা-টিও তোলে না। শেষটায় নিরাশ হ'য়ে পণ্ডিতজি বাড়ি ফিরে এলেন।

৪

মাঝরাতেও কান্নাকাটি আর বিলাপ চলতে থাকে। ব্রাহ্মণদের পক্ষে চোখের পাতা বোজানোও অসম্ভব হ'য়ে ওঠে। কিন্তু চামারদের কেউই লাশ তুলতে আর আসে না—আর ব্রাহ্মণ হ'য়ে কেউ চামারের মড়া ছোঁয়ই বা কী ক'রে? শাস্ত্রে যে স্পষ্ট নিষেধ ক'রে দেয়া আছে এ-বিষয়ে—কেউ কি তা অস্বীকার করতে পারবে?

চটেম'টে পণ্ডিতাইন বলেন, 'ঐ ডাইনিগুলো আমার মাথা খেয়ে ফেলছে! বাব্বাঃ, ওদের গলাও ধরে না!'

'কাঁদুক না পেত্নিগুলো, যত খুশি। বেঁচে থাকতে কেউ ওর খোঁজটিও করতো না। যেই মরেছে, অমনি গাঁয়ের সবাইয়ের আর আদিখ্যেতার শেষ নেই!'

'চামারদের ঐ মড়াকান্না কিন্তু ভারি অলুক্ষুণে,' পণ্ডিতাইন জানান।

'হ্যাঁ, দারুণ অমঙ্গল হবে।'

'এদিকে এরই মধ্যে দুর্গন্ধ বেরুতে শুরু করেছে।

'বেরুবে না গন্ধ? ব্যাটা যে চামার ছিল। খাদ্যাখাদ্যের ।৴ আর কোনো বাছবিচার আছে এদের।'

'বাব্বাঃ, এদের ঘেন্নাপিত্তিও নেই। কোনো খাবারেই অরুচি নেই!'

'সব ক-টা ভ্রষ্ট!'

কোনো রকমে তো রাতটা কাটলো। কিন্তু ভোরবেলাতেও কোনো ব্যাটা চামারের পাত্তা নেই। এখনও ওঁরা ঐ পেত্নিগুলোর ডুকরে-ডুকরে বিলাপ করা শুনতে পাচ্ছেন। গন্ধটাও একটু-একটু ক'রে ছড়াতে শুরু করেছে।

পণ্ডিতজি একটা দড়ি বার করেন। একটা ফাঁস তৈরি ক'রে কোনো রকমে মড়ার পা গলিয়ে দেন, তারপর গেরোটা টেনে শক্ত করেন। ভোরবেলার কুয়াশা তখনও কাটেনি। পণ্ডিতজি দড়িটা টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসতে থাকেন লাশটা, টানছেন তো টানছেনই, তারপর সেটা একেবারে গাঁয়ের বাইরে নিয়ে আসেন। বাড়ি ফিরে এসেই বিলম্ব না-ক'রে স্নান করেন, নিজেকে শুদ্ধ করার জন্য দুর্গা-স্তোত্র পাঠ করেন, বাড়ির চারপাশে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দেন।

ওদিকে গাঁয়ের বাইরের মাঠে শেয়াল আর শকুন, কুকুর আর কাক দুখির লাশটা ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খেতে থাকে। এই তার আমরণ ভক্তি, সেবা আর নিষ্ঠার পুরস্কার।

অনুবাদ : ভাস্বতী রায়চৌধুরী

শিকার
ভগবতীচরণ পাণিগ্রাহী

সে অঞ্চলে শিকারী হিসাবে ঘিনুয়ার নাম বিখ্যাত। সে বন্দুক ছুঁড়তে জানে না। তার প্রধান অস্ত্র তার নিজের হাতে তৈরি তীর-ধনুক। সে তীর ছোঁড়বার সময় চিৎ হয়ে পড়ে। বাঁ পা-টা ধনুকে লাগিয়ে কান পর্যন্ত তীর টেনে ছাড়ে। এক মাইল দূর থেকে লক্ষ্যভেদ করতে পারে। তীরধনুক দিয়ে হরিণ, সম্বর, শুয়োর, ভাল্লুক, অসংখ্য মেরেছে, অনেক চিতাবাঘও মেরেছে। কিন্তু মহাবল অর্থাৎ বাঘ মেরেছে মাত্র দুটি। বাঘ মেরে ডেপুটি কমিশনারের কাছ থেকে পুরস্কারও পেয়েছে।

সেদিন সকালে সে এক অদ্ভুত শিকার নিয়ে ডেপুটি কমিশনারের বাংলোয় হাজির। এক কাঁধে তার ধনুক, হাতে দু-তিনটে তীর, অন্য কাঁধে কুড়ুল। ঘিনুয়াকে এ হেন রূপে দেখে আর্দালি জিজ্ঞেস করলে :

"কীরে ! আজ কী শিকার এনেছিস ?" ঘিনুয়ার সঙ্গে তার খুব চেনাপয়চান। কতবার সে বখশিসের ভাগিদার হয়েছে। উত্তরে ঘিনুয়া কেবল তার দু-পাটি ময়লা দাঁত দেখালে। সে হাসল, না মুখ ভ্যাংচাল তা বোঝা গেল না। হাসি বলতে যা বোঝায়, ঘিনুয়াকে সেই হাসি হাসতে কেউ দ্যাখেনি। সে কেবল মাঝে-মাঝে এই ভাবে দাঁত বার করে। তা হাসিও নয়, কান্নাও নয়। কেবল দাঁত দেখানো।

আর্দালি আবার জিজ্ঞেস করলে : "কী রে, কী শিকার এনেছিস আজ ?"

ঘিনুয়া তার গামছায় বাঁধা একটা জিনিস দেখিয়ে বললে সে আজ এক মস্ত জানোয়ার শিকার করে এনেছে।

আর্দালি জিজ্ঞেস করলে—"বাঘ ?"

ঘিনুয়া মাথা নেড়ে জানালে—"না।"

"কী তাহলে ? চিতা···ভাল্লুক···শুয়োর···"

ঘিনুয়া কেবল মাথা নাড়ল।

"আরে, তাহলে কী রে বেটা ?"

গোলমাল শুনে সাহেব বাংলো থেকে বেরিয়ে এলেন। ঘিনুয়া মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে আবার দাঁত বার করলে। শিকারের চেহারাটি কী তা জানার জন্যে সাহেবের ঔৎসুক্য দেখে সে গামছার ভেতর থেকে বার করে সাহেবের পায়ের তলায় রাখলে একটা সদ্য কাটা মানুষের মুণ্ডু।

সাহেব চমকে উঠে দু-চার পা পেছিয়ে গেলেন। ঘিনুয়া হাত বাড়িয়ে বললে, "সাহেব, বখশিস।"

একটু পরে সাহেব নিজেকে সামলে নিয়ে বখশিসের জন্যে ঘিনুয়াকে অপেক্ষা করতে ইশারা করে ভেতরে গিয়ে থানায় ফোন করে সশস্ত্র পুলিশ ফৌজ ডাকালেন। এ ছাড়া ঘিনুয়াকে জব্দ করার কোনো উপায় নেই, গায়ে তার অসুরের বল, হাতে তার ওপর তীরধনুক আর কুড়ুল।

হাতে হাতকড়া আর পায়ে বেড়ি পরিয়ে ঘিনুয়াকে যখন হাজতে পুরলো, সে কিছুই বুঝতে পারলে না। এভাবে তাকে আটকে রাখার মতলব কী? সুবিধে পেলে সে কাউকে কাউকে এ-বিষয়ে জিজ্ঞেস করে। কেউ বলে তার ফাঁসি হবে, কেউ বলে তাকে কালাপানি পার হতে হবে। কেন, সে কী এমন অপরাধ করেছে? কিছু না-বুঝতে পেরে সে তাদের কথা বিশ্বাস করলে না। শেষে একদিন ডেপুটি কমিশনার জেল দেখতে এলেন। সে তাঁকে হালচাল জিজ্ঞেস করলে। তিনি বললেন, সে আগে বাঘ ভাল্লুক মেরেছিল বলে সঙ্গে-সঙ্গে বখশিস পেয়েছে; এখন সে মানুষ মেরেছে। এখন সে কী পুরস্কার পাবে তা পাঁচজনকে বুঝেসুঝে বিচার করে ঠিক করতে হবে। কথাটা ঘিনুয়ার মনে হলো মানবার মতো বটে।

যেদিন ঘিনুয়ার বিচার হলো, সে মনে-মনে ভাবলে আজ সে পুরস্কার পাবে। সে উৎসাহ-সহকারে জজকে সব কিছু বলতে লাগল: সে যে গোবিন্দ সর্দারকে কাটল, তার জন্যে তাকে কম কষ্ট করতে হয়নি। আরও অনেকে তাকে মারবার জন্যে ওৎ পেতে বসেছিল, কিন্তু কেউ পারেনি; গোবিন্দ সর্দার যে সবসময় মোটর-গাড়ি করে যাওয়া-আসা করে। সে তার ধনসম্পত্তি অন্য সবাইকে লুঠ করে কামিয়েছে, বড়ো শয়তান লোক ছিল সে। কত লোককে সে মেরেছে, কত লোককে পথে বসিয়েছে, কত স্ত্রীলোকের ইজ্জত নিয়েছে ঠিকঠিকানা নেই—ঘিনুয়ার জমি-জমাও লুঠে নিয়েছে। সেদিন সন্ধেবেলায় ঘিনুয়ার স্ত্রীর ওপর পর্যন্ত অত্যাচার করতে এসেছিল। কত বড়ো সাহস! ঘিনুয়াকে দেখেই মোটরে করে পালাচ্ছিল। ভেবেছিল তার হাত থেকে পার পাবে। তার মোটরের চাকায় তীর মেরে সে মোটর অচল করে দেয়। তারপর কুড়ুল দিয়ে তার মাথা কেটে নিয়ে সেই রাতেই সে সোজা বনজঙ্গলের ভেতর দিয়ে তিরিশ মাইল রাস্তা এক নিশ্বাসে দৌড়ে ডেপুটি কমিশনারের বাংলোয় হাজির হয়েছিল।

গোবিন্দ সর্দার যে-সে লোক নয়। হাতে তার সর্বক্ষণই বন্দুক মজুত থাকতো। বাঘ-ভাল্লুকের চেয়ে লোকে তাকে বেশি ভয় করতো, সেও বাঘ-ভাল্লুকের চেয়ে

লোকের ঢের বেশি ক্ষতি করতো। তাকে মারতে ঘিনুয়াকে কম সাহস, কম বিচক্ষণতা খরচ করতে হয়নি।

কয়েক বছর আগে বিদ্রোহী ঝপট সিং-এর মাথা কাটার জন্যে সাহেব ডোরাকে পাঁচশো টাকা বখশিস দিয়েছিলেন। ঝপট সিং তো একরকম ভালো লোকই ছিল; সে কখনও কোনো স্ত্রীলোকের ইজ্জত নেয়নি, কিংবা কারুর জমিজমাও দখল করেনি। সে কেবল খাজাঞ্চিখানা লুঠ করেছিল, আর, কয়েকজন সেপাইকে মেরেছিল। গোবিন্দ সর্দার কিন্তু ভয়ানক লোক। তাকে মারার জন্যে ঘিনুয়ার বেশি বখশিস পাওয়া উচিত।

ঘিনুয়ার যুক্তি শুনে সবাই হো-হো করে হেসে উঠল। জজসাহেব হাসতে-হাসতে বললেন, "হ্যাঁ, তোমার উপযুক্ত বখশিসই দেওয়া হবে।" সরকারি উকিল বললে, "আরে, তোকে এখানে বখশিস দেবার জন্যেই তো আনা হয়েছে।"

ঘিনুয়া এ-সব কথা ঠাট্টা না-ভেবে সত্যি ভাবলে। সে হাসিঠাট্টা তামাসা-পরিহাস বোঝে না। তার প্রকৃতি নিতান্ত রসকষহীন।

শেষে রায় দেওয়া হলো—প্রাণদণ্ড। ঘিনুয়া এর কোনো মানেই বুঝল না। আবার তাকে জেলে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার সময় বোঝানো হলো, তার বখশিসের দিন ঘনিয়ে আসছে। ঘিনুয়া তখনও অবধি বুঝতে পারলে না যে সে অপরাধী, তাই তার প্রাণদণ্ড হয়েছে। ঝপট সিংকে মারা আর গোবিন্দ সিংকে মারা যে এক জিনিস নয়, সে তা কী করে বুঝবে। সে বুঝলো না যে একটা গৌরবের বিষয়, অন্যটা দোষাবহ। আইনের সূক্ষ্ম জাল ভেদ করবে তার সে মাথা কই। সে যে বুনো সাঁওতাল।

মনে-মনে ভাবে, ডোরা ঝপট সিংকে মেরে পাঁচশো টাকা পেয়েছিল। তার বেশি না-হলে সে কেন নেবে? সব ফিরিয়ে দিয়ে বলবে, "সাহেব। কিছু না-দাও সেও ভি আচ্ছা। ডোরার চেয়ে বেশি পাওয়া আমার হক।"

জেলের নির্জন গুহায় বসে সে কত কী ভাবে। কথাবার্তা বলবার লোক নেই, কথাবার্তা বলার আগ্রহও আর তার নেই। বখশিস নিয়ে বাড়ি ফেরার জন্যে তার প্রাণ ছটফট করে।

শেষে তার ফাঁসির দিন এলো। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো তার কী দরকার। সে বললো, "আমার বখশিস।"

"আচ্ছা, নিবি চল"—বলে তাকে নিয়ে গেল। মাথায় তার একটা কালো কানির খোল পরিয়ে দেওয়া হলো। ঘিনুয়া ভাবলে তার চোখে ঠুলি পরিয়ে তার

হাতে এবার সোনারুপো ঢেলে দেবে। সরকারের ঘরের কি কম ফন্দিফিকির, কম কূটকচালি। খালি অমনি বখশিস দিলে ভাবনা ছিল না। সে বাড়িতে ফিরে তার স্ত্রীকে সব দেখাবে, তার স্ত্রী সব দেখে কী খুশিই হবে! ভালো ঘরদোর করে, জমিজমা চষে সে সুখে থাকবে। আর তো গোবিন্দ সর্দার নেই যে সব লুঠ করে নেবে।

হঠাৎ কী একটা এসে তার ঘাড়ে বাধলো।

অনুবাদ : রাধাপ্রসাদ গুপ্ত

প্রেমপত্র

ভৈকম মুহম্মদ বশীর

প্রিয়তমা স্যারাম্মা ·

কেমন ক'রে আমার প্রিয় কমরেড কাটাচ্ছে তার এই এত ছোট্ট পরমায়ু যখন জীবন টগবগ ক'রে ফুটছে তারুণ্যে আর বুক ভ'রে আছে প্রেমের সুগন্ধে ?

আমার কথা যদি ধরো—আমার জীবন কাটে পলে-পলে স্যারাম্মারই প্রেমে। আর তোমার, স্যারাম্মা ?

খুব ভালো ক'রে এটা ভেবে দেখবার জন্য মিনতি করছি তোমায় ; আমাকে একটা মধুর, সদয় জবাব দিয়ে কৃতার্থ কোরো।

স্যারাম্মারই একান্ত

কেশবন নায়ার

এই কথাই লিখলো কেশবন নায়ার। চোখ তুলে চারপাশে তাকিয়ে দেখলো একবার। তার কেমন একটা মধুর অনুভূতি হচ্ছিলো, যেন স্যারাম্মা তার পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে, মুখে সুমধুর হাসি। শুধু একটা অনুভূতি। চিঠিটা সে পড়লো, আগাগোড়া। কবিতা আছে এই লেখায়। আছে দর্শন আর অতীন্দ্রিয়তাও। বাঃ রে—এর মধ্যে বুঝি কেশবন নায়ারের হৃদয়ের সম্পূর্ণ রহস্যটা ধরা নেই ? সে যা লিখবে ব'লে ভেবেছিলো তার চেয়েও ভালো হয়েছে চিঠিটা। চিঠিটা সে ভাঁজ করলে, পকেটে ঢোকালে, তারপর ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে রাস্তা ধ'রে হাঁটতে লাগলো। অমনি মাথায় একটা ভাবনা ঢুকলো : স্যারাম্মাকে চিঠিটা দিলে সে তাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করবে না তো ? না কি সে উত্তর দেবে ? কেমন হ'তে পারে উত্তরটা ? স্যারাম্মার কৌতুকবোধটা টনটনে, লোককে খ্যাপাতে বা ঠাট্টা করতে তার ভারি ভালো লাগে। একটা ঘটনা তার মনে প'ড়ে গেলো। তার সঙ্গে সে গভীর একটা আলোচনা করছিলো একদিন। মেয়েদের নিয়ে রসিকতা করছিলো তারা। স্যারাম্মা বলেছিলো কোন-এক মস্ত কবি না কি নারীকে ভগবানের মহান সৃষ্টি হিশেবে বন্দনা করেছেন। কেশবন নায়ার হাসি চাপতে পারেনি, বলেছিলো : 'মেয়েদের মাথা কেবল চাঁদের আলো-টালোয় ভর্তি।' এক নামজাদা লোকের কথা পেড়েছিলো সে, তিনি সাত-সাতবার বিয়ে করেছিলেন। ভদ্রলোকের সপ্তম

জীবনসঙ্গিনী সিঁড়ির গ্র্যানাইট পাথরে একবার ঘাড়মুখ গুঁজড়ে চিৎপটাং প'ড়ে গিয়েছিলো। তাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে ভদ্রলোক গিয়েছিলেন তাঁর এক অবিবাহিত বন্ধুর কাছে, তাকে খবরটা জানাতে।

'অ্যাকসিডেণ্টটা অত সিরিয়াস নয় অবশ্য।'

'মাথা ফেটে যায়নি তো?'

'সে তো গেছেই।'

'মগজ বেরিয়ে গেছে?'

'ওঃ, সে কিছু না—' বলেছিলেন সেই নামজাদা ভদ্রলোক, যিনি সাত-সাতজন মেয়েকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন। 'মাথার খুলি যদি ফেটে চৌচিরও হ'য়ে যেতো, কেমন ক'রে মগজ দেখা যেতো, বলো—মেয়েদের?'

'তা থেকে আমি যেটা অনুমান করেছি,' কেশবন নায়ার তার দৃষ্টান্ত প্রদান শেষ করেছিলো, 'তা এই: মেয়েদেব মাথার মধ্যে শুধু চাঁদের আলোই পোরা থাকে।'

স্যারাম্মা এ-কথা শুনে শুধু মুখ টিপে হেসেছিলো। পরে সে এ-সম্বন্ধে কোনো টু শব্দও করেনি। কিন্তু তাহ'লেও, তারও মাথার মধ্যে যে নেহাৎই চন্দ্রালোক পোরা আছে, এই ইঙ্গিতটায় সে চ'টে যায়নি কি? যখন সে প্রেমপত্রটা পাবে, তখন কি সে ঐ চাঁদের আলো-টালোর কথা তুলে তাকে বিদ্রূপ করবে না? অবশ্য সে ভুলেও যেতে পারে ঘটনাটা—আর যাই হোক, সে তো মেয়েই, শেষ অব্দি।

এ-সব সাত-পাঁচ মাথায় নিয়ে কেশবন নায়ার রেস্তোরাঁটায় ঢুকলো। কফি খাওয়ার তেমন ইচ্ছে ছিলো না তার। তবু সে এক পেয়ালা কফি খেলো, তারপর মৌজ ক'রে একটা সিগারেট ধরিয়ে অনেকক্ষণ কাটিয়ে দিলে, ভাবনায়। প্রেমপত্রটা দিলে স্যারাম্মা তাকে নিয়ে রসিকতা করবে না তো? স্যারাম্মা এখনও প্রেমের স্পর্শ পায়নি। কেশবন নায়ার কত হাজার বারই না চেষ্টা করেছে। কিন্তু যখনই সে প্রেমের আতরদানের ছিপি খোলার চেষ্টা করে, স্যারাম্মা কেবল নাক শিঁটকোয়! এই দুর্গন্ধটা কিসের? তুমি ইদানীং স্নান-টান করো না নাকি? এ-সব অস্ফুট জিজ্ঞাসা ফুটে ওঠে তার দৃষ্টিতে। কেমন ক'রে তাকে সে তার প্রেমে পড়াবে?

প্রেমে হাবুডুবু খেতে-খেতে সে বাড়ি ফিরলো। দোতলায় যে-ঘরটায় সে থাকে নিচে থেকে তার দিকে তাকিয়েই কেশবন নায়ার আঁৎকে উঠলো—স্যারাম্মা! সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটা লম্বা লাঠি জানলা দিয়ে গলিয়ে তার ঘর থেকে কী যেন বার ক'রে নেবার চেষ্টা করছে!

কেশবন নায়ার একতলাতেই অভিভূতের মতো দাঁড়িয়ে রইলো, ওপরে আর উঠলো না। স্যারাম্মা তার ঘর থেকে কী চুরি করতে চাচ্ছে? যদি তার মানিব্যাগ হয়, সেটা তো তার পকেটেই আছে। তবে কি তার কোনো জামা কিংবা ধুতি? না কি কোনো বই? কিন্তু তার ঘরে এমন কোন বই আছে যেটা সে পড়েনি? ঐ আঁকশি গলিয়ে অমন ধস্তাধস্তি করার কোনোই দরকার ছিলো না, স্যারাম্মা! তোমাকে কি আমি আমার নিজের প্রাণের চাইতেও বেশি ভালোবাসি না? যদি তুমি মুখ ফুটে একবার আমায় বলতে—তোমাকে কি আমি আমার সর্বস্ব দিয়ে দিতুম না, সর্বস্ব, যা তুমি চাইতে, তাই? আসুক মেয়ে তার লুঠ নিয়ে নেমে। তাকে নামতে দেখে সে করুণ গলায় তাকে এই কথাই বলবে, ব'লে চিঠিটা বাড়িয়ে দেবে তার দিকে, বলবে, 'এটা ছাখো, এটা হচ্ছে তোমাকে যে-প্রেমপত্রটা লিখেছি, স্যারাম্মা, সেই প্রেমপত্র।' ব'লে তাকে সে চিঠিটা দেবে তারপর। সে তখন চিঠিটা পড়বে, প'ড়ে এমন-একটা প্রেমকে হত্যা করেছে ভেবে আকুল হ'য়ে কাঁদবে। তখন কেশবন নায়ার তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলবে: 'ওঃ, তাতে কিছু হয়নি। আমি সব ক্ষমা ক'রে দিয়েছি।'

আর এইভাবে হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয় মিলে-মিশে এক হ'য়ে যাবে। সে যখন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে এ-সব কথা ভাবছে, হঠাৎ শুনতে পেলে স্যারাম্মা বলছে: 'তোমাকে চুপি-চুপি বাড়ি ঢুকে সেই থেকে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। ব্যাঙ্কের বাবুরা আজ নিশ্চয়ই সন্ধে অব্দি কাজ করেছে।'

'ওঃ!' কেশবন নায়ারের আত্মাটাই চমকে উঠলো। সে ওপরে উঠে এলো।

স্যারাম্মা ঘামছিলো। হেসে বললে: 'এই নিষ্ফলা কাজটায় বোধহয় আধঘণ্টা ধ'রে খেটে যাচ্ছি! যাই করি না কেন, আঁকশির ডগায় কিছুতেই আর আটকায় না! যাকগে, ঠিক করেছি কালই একটা আলাদা চাবি বানিয়ে নেবো!'

'সে কি আমার অনুপস্থিতিতে ঘর খোলবার জন্যে?'

স্যারাম্মা রাস্তার ভিড়ের দিকে তাকালে একবার, মুচকি হাসলো।

কেশবন নায়ার জিগেশ করলে: 'কী সেই জিনিস, আঁকশির ডগায় যেটা আটকাবে না?'

'তোমাকে সে-কথা বলিনি বুঝি?' স্যারাম্মা ফিরে জিগেশ করলে, 'নিচে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অতক্ষণ ধ'রে তুমি কী ভাবছিলে বলো তো?'

'আমি ভাবছিলুম,' কেশবন নায়ার থেমে গেলো। কী বলবে সে? 'আমি ভাবছিলুম স্যারাম্মা ঘর থেকে কিছু-একটা নিতে চাচ্ছে। তা, কী খুঁজছিলে তুমি?'

'শ্রীযুক্ত কেশবন নায়ারের নামে আজ যে-পত্রিকাটা এসেছে! পিওনকে দেখলুম জানলা দিয়ে সেটা ছুঁড়ে ফেলতে। ভারি একঘেয়ে লাগছিলো—কোনো কাজ নেই—'

'কাজ নেই? তো আমাকে ভালোবাসতে পারো না?' এই ভেবে সে তার কুর্তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে চাবি বার ক'রে আনলে, আর প্রেমপত্রটা, সেটা সে স্যারাম্মার হাতে তুলে দিলে।

স্যারাম্মা সেটা পড়লো, তারপর দলামোচা ক'রে সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে, বললে 'তারপর? খবর কী, বলো।'

কেশবন নায়ার কিছু বললে না। সে ঘরের দরজা খুললো, ঝুঁকে মেঝে থেকে পত্রিকটা তুললো, তারপর স্যারাম্মার হাতে সেটা তুলে দিলো। তারপর সে গা থেকে কুর্তাটা খুলে ঝুলিয়ে রাখলো। স্যারাম্মাকে দেখে মনে হচ্ছে সে যেন মিষ্টি ও গরম কিছু খেয়ে ফেলেছে সে পত্রিকার মোড়কটা খুলে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পাতা ওলটাতে লাগলো।

মুখের বিবর্ণ ভাবটা লুকিয়ে কেশবন নায়ার প্রেমপত্রের ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবার ভান করলে, বললে 'তা, তোমার কী খবর, স্যারাম্মা? আজ তুমি সৎ-মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করোনি?'

স্যারাম্মা বললে: 'বোধহয় বাবা আর সৎমা এবার থেকে আমার কাছে ঘর-ভাড়া চাইবে।'

'জল অ্যাদ্দুর গড়িয়েছে?'

'কেন গড়াবে না? আমি একটা আস্ত ঘর দখল ক'রে ব'সে আছি, সেটা অনায়াসেই ভাড়া দেয়া যেতো, আর—'

'আর, স্যারাম্মা?'

'আর স্যারাম্মাকে রান্নাঘরের এক কোণায় প'ড়ে থাকতে দেয়া যেতো—অন্তত সেটাই বোধহয় সৎমার ভাবনার ধরন।'

'আর তোমার বাবার?'

'বাবার আবার মত-অমত কী—সৎমার মত ছাড়া?'

'সৎমাকে তোমার বাবা বিয়ে করার আগে অবস্থা কেমন ছিলো?'

'কার অবস্থা? সৎমায়ের?'

'না, তোমার বাবার।'

'তখন বাবা আমার বাবা ছিলো। আমার মনে হয় পুরুষ মানুষের মাথার মধ্যে কিস্সু নেই?'

কেশবন নায়ার কিছু বললে না। একটু পরে সে জিগেশ করলে : 'আচ্ছা, স্যারাম্মা, এ-বাড়ির ওপর তোমার কোনো অধিকার বা দাবি নেই?'

'আমার আবার অধিকার কিসের?' বললে স্যারাম্মা। 'সৎমা বিয়ের সময় যে পণের টাকা এনেছিলো তাই দিয়েই তো বাড়িটার সব দেনা মেটানো হয়েছে। বাবা বলে মায়ের অসুখের সময়ই নাকি সব ধার হয়েছিলো—তারপর শ্রাদ্ধের খরচ। যদি মা বেচারি অন্তত আরো দু-বছর বাঁচতো, আমি তবে বি-এ টা পাশ করতে পারতুম। সহজেই একটা চাকরিও জোটাতে পারতুম।'

'কত যে বি-এ পাশ বেকার মেয়ে আছে, তার ইয়ত্তা নেই,' কেশবন নায়ার বললে। 'সে যাই হোক, তোমার নিজের যে কোনো কাজ নেই এটাই দুঃখের কথা, স্যারাম্মা।'

স্যারাম্মা পত্রিকা থেকে চোখ তুলে বললে, বেশ দীন স্বরেই, 'তুমি যে-ব্যাঙ্কে কাজ করো, সেখানে কোনো চাকরি আছে? যে-কোনো কাজ—যে-কোনোখানে?'

কেশবন নায়ার স্যারাম্মার টলটলে স্বচ্ছ চোখের দিকে তাকালে, তাকিয়ে দেখতে পেলে তার গ্রীবার স্বর্ণাভা, তার টশটশে মৃদুকঠিন স্তন দুটি, আর মনে-মনে ভাবলে : কোনো পুরুষকে ভালোবাসা ছাড়া মেয়েদের আবার কাজ কী? ভগবান মেয়েদের সৃষ্টিই করেছেন ভালোবাসা দেবার জন্যে—ভালোবাসা পাবার জন্যে। কোনো আপিশে গিয়ে প্যাখম তুলে নাচবার জন্যে নয়! তবু সে বললে, 'আচ্ছা, চেষ্টা ক'রে দেখবো।'

'কোথাও কোনো কাজ খালি আছে? জানো কিছু?'

'জানবো না কেন, খুব জানি!' কেশবন নায়ার ভাবলে। 'আমার হৃদয়েই তো একটি বড়ো চাকরি খালি আছে। তার জন্য কাউকে কোনো ঘুষ দিতে হবে না অথবা কোনো মুরুব্বি পাকড়ে, সুপারিশ জোটাতে হবে না।' সে আস্তে-আস্তে তার বুকে হাত বোলাতে-বোলাতে বললে, 'একটা চাকরি অবশ্য আছে।'

'কোথায়?'

'কাল বলবো।'

'কী কাজ?'

'সেটা—' কেশবন নায়ার হাসলো। তাকিয়ে দ্যাখো এর দিকে? দলামোচা করো আমার প্রেমপত্র, তারপর ছুঁড়ে ফেলে দাও সেটা—বেশ মজা পেয়েছো, না? আর তারপর ও নিয়ে টু শব্দটিও আর না? আমাকে দেখে কি তেমন লোক ব'লে

মনে হয় যে রোজ একটা ক'রে মেয়েকে প্রেমপত্র লিখি? হুম, চাকরি চাই! বেশ, আমি চাকরি তৈরি ক'রে দেবো। সে যে পুরুষ হ'য়ে জন্মেছে এই ভেবে কেশবন নায়ারের বেশ একটু গর্বই হ'লো। বাঁ হাত তুলে সে ওপরের ঠোঁটটায় হাত বোলালে। আমাকে অন্তত সরু একটা গোঁফ রাখতে হবে। প্রসন্নতায় তার চোখ ঝকমক ক'রে উঠলো, সে ঘোষণা করলে: 'দেখো, ঠিক বলবো তোমাকে—কাল।'

'বললেই শুধু হবে না! কাজটা আমি পাবো তো?'

'নিশ্চয়ই।'

'আঃ, বাঁচালে!'

প্রেমপত্র সম্বন্ধে একটি কথাও না-ব'লে স্যাবাম্মা আঁকশি আর পত্রিকাটা তুলে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলো, উঠোনে, নিজের ঘরে যেতে-যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে সে চেঁচিয়ে বললে: 'আর সেই অন্য ব্যাপারটাও ভুলো না কিন্তু।'

কেশবন নায়ার স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো, কিছু না-ব'লে। উঠোনে দ'লেমুচড়ে যে প্রেমপত্রটা ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে সেটার দিকে তাকাতে তার সাহস হ'লো না। সে রাগ চেপে বললে, 'ন্-ন্না!'

'এই যে আমার হৃদয়ের চাবি!' পরদিন ব্যাঙ্কে যাবার সময় তার ঘরের চাবিটা স্যাবাম্মার কোলে ফেলে দিয়ে মনে-মনে বললে কেশবন নায়ার।

সন্ধেবেলায় সে ব্যাঙ্ক থেকে ফিরে এলে স্যাবাম্মা তাকে চাবিটা ফিরিয়ে দিলে। কেশবন নায়ার আগের দিনের পত্রিকাটাও তুলে নিয়ে নিজের ঘরে চ'লে গেলো। চেয়ারটাকে দরজার কাছে টেনে সে ব'সে প'ড়ে পত্রিকাটার পাতা ওলটাতে লাগলো। কী ঘটতে যাচ্ছে, এ-কথা ভেবে মন তার সুখে ভরা। তার জন্য কী কাজ জুটিয়েছে, এটা যখন স্যারাম্মা জানতে পাবে, তখন কি তাকে টুকরো-টুকরো ক'রে ছিঁড়েই ফেলবে? কেশবন নায়ার এ নিয়ে একটু ভেবে-টেবে নিজের মনেই হেসে উঠলো। সে যখন ওভাবে ব'সে আছে, তখন স্যারাম্মা ওপরে উঠে এলো। কেশবন নায়ার যদিও ঠিক জানে যে কাজের খবরটার জন্য স্যারাম্মা উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আছে, তবু সে এমন ভান করলে যে যেন এ-সম্বন্ধে তার কোনো খেয়ালই নেই, বরং তাকে সে রোজকার মতো জিগেশ করলে, 'তারপর, কী খবর, বলো, স্যারাম্মা।'

'ও, কিচ্ছু না,' স্যারাম্মাও রোজকার মতো হাসলো, তারপর জিগেশ করলে: 'তোমার ঘর থেকে কিছু চুরি গেছে কি না, দেখেছো?'

কেশবন নায়ার বললে: 'আমি খুঁজে দেখিনি।'

'তাহ'লে একবার মিলিয়ে দ্যাখো।'

কেশবন নায়ার ভান করলে যেন হাতের কাগজটায় সে তন্ময় হ'য়ে আছে—এদিকে সে মনে-মনে কিন্তু মহড়া দিচ্ছে তাকে সে এখন কী বলবে—সেই দুর্লভ গোপন কথাটি যা তাকে সে খুলে বলবে। তার হৃদয়ের গোপন রহস্য যেন ফেনিয়ে উঠছে বেরিয়ে আসার জন্য—শিশি থেকে যেমন বেরিয়ে আসে সুগন্ধ।

স্যারাম্মা কেশবন নায়ারের মুখোমুখি ব'সে পড়লো জানলায়। তার কোঁকড়ানো চকচকে চুলের মাঝখানে সযত্নে টেরি কাটা, তবে ভুরুর কাছে কেমন একটা গোলাপি আভা—আস্তে সন্তর্পণে তার ভুরু নাচে, তার চওড়া বিশাল বুক—যেটা ওঠে আর নামে : কেশবন নায়ারের এইসব দেখতে-দেখতে স্যারাম্মা মৃদুস্বরে বললে, 'তুমি কিন্তু কাজটা সম্বন্ধে আমায় কিছুই বলোনি।'

'তুমি কাজটা নেবে, তা আমার মনে হয় না, স্যারাম্মা।'

স্যারাম্মা বললে : 'মাইনে কম হ'লেও কিছু এসে যায় না। আমি নেবো, এখানে আমি সকলেরই বোঝা হ'য়ে উঠেছি। এমন জীবনে আমার ঘেন্না ধ'রে গেছে। সত্যি বলতে—তুমি জানো মাঝে-মাঝে আমি কী ভাবি?'

'কী ভাবো? শুনি?'

'ধুর, তুমি কেবল সবসময় আমায় নিয়ে ঠাট্টা করো। আমি সিরিয়াসলি বলছি। কাজটা যাই হোক না কেন, আমি নেবো।'

'স্যারাম্মা, তুমি রাঁধতে জানো?'

স্যারাম্মা একটু অবাক হ'য়ে গেলো। 'হঠাৎ? এ-কথা?'

'নেহাৎই একটা কৌতূহল!'

স্যারাম্মা বললে : 'তা একটু-আধটু রান্না জানি বৈ কি। ভাত-তরকারি রাঁধতে পারি, জলখাবার বানাতে পারি, চা বানাতে পারি, কফি বানাতে পারি, কোকো বানাতেও পারি, ওভালটিনও বানাতে পারি—'

'সংক্ষেপে, তোমায় কিছু চাল দেয়া গেলে তুমি ভাত রেঁধে দিতে পারবে—'

'কেন, তুমি কি আমাকে কোথাও রাঁধুনির চাকরি দিতে চাও না কি?'

'না, না, সে-রকম কিছু নয়। আমি শুধু জানতে চাচ্ছিলুম। লেখাপড়া-জানা মেয়েরা অনেক সময় আবার রান্নাবান্না করতে পারে না কি না। রান্নাঘরের ধোঁয়া কালিঝুলির সঙ্গে তাদের কাপড়চোপড় খাপ খায় না। তারা জানে কেমন ক'রে সাজতেগুজতে হয়, পাউডার মাখতে হয়, ঠোঁট রাঙাতে হয়, একশো পঁয়ষট্টি ভঙ্গিতে চুল বাঁধতে হয়, তারা সাজগোজ করে, নিজেদের অলংকৃত করে, হাতে থলি ঝোলায়—'

'থলি ?—'

'ঐ যত সব বটুয়া।'

'ওঃ!'

'বটুয়া ঝুলিয়ে হেঁটে যায়। পাকা মহিলা এক-একজন! আমি শুধু জানতে চাচ্ছিলুম স্যারাম্মাও একজন মহিলা কি না।'

'আমার কোনো বটুয়া নেই।'

'তাহ'লেও, স্যারাম্মা, তাদের ঐ বটুয়ায় কী থাকে বলো তো।'

'একটা ছোট্ট আয়না, খুদে একটা পাউডারের কৌটো, একটা ছোট্ট চিরুনি—'

'তাতে প্রেমপত্র থাকে ?'

'প্রেমপত্র ?'

'হ্যাঁ, প্রেমপত্র—ঐ যে-সব প্রেমপত্র তারা পায় ঘণ্টায়-ঘণ্টায়। দিনের শেষে বটুয়া যখন ভর্তি হয় তখন তারা সে-সব তুলে রাখে মস্ত তোরঙ্গে।'

'সে আমি জানিনে। আমার জন্যে তুমি কী কাজ পেলে, সেটাই বলো।'

'ও তোমার পচ্ছন্দ হবে না, স্যারাম্মা।'

'হবে।'

'ঠিক জানো ?'

'হাজার বার জানি।'

'তাহ'লে,'—কেশবন নায়ার ইতস্তত করলে। কেমন ক'রে সে কথাটা পাড়বে ?

'স্যারাম্মা, এ তোমার পছন্দ হবে না।'

'বাঃ রে, বললুমই তো হবে।'

'ধরো, পরে তোমাকে এজন্যে অনুতাপ করতে হ'লো ?'

স্যারাম্মা অবিচল: 'না, যত কষ্টই হোক না কেন, যত ত্যাগই করতে হোক না কেন, আমি সব মেনে নেবো। একটা গোপন কথা জানো তুমি ? কেশবন নায়ার, তুমি এখানে থাকতে আসার আগে ব্যাপারটা ঘটেছিলো। আমার বিয়ের জন্য তিন-তিনটে সম্বন্ধ এসেছিলো। একেবারে হুম-হুম ক'রে পর-পর তিনবার—গত বছরে। তিনবারই আমি খুশি হয়েছিলুম। সে এই জন্যে নয় যে-লোকটাকে জীবনে কখনও চর্মচক্ষুতে দেখিনি-শুনিনি তার সঙ্গে পরমানন্দে সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাবার স্বপ্ন দেখছিলুম আমি। খুশি শুধু এই ভেবে হয়েছিলুম যে তাতে এই নরক থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে। কিন্তু তিনটে সম্বন্ধই ফসকে গেলো। পণের টাকা ছাড়া কেউই আমাকে বিয়ে করবে না। আমার বাবা আর সৎমা বলে সে নাকি আমারই

দোষ। পান থেকে চুন খশলেই সে আমার দোষ হ'য়ে যায়। এ-তল্লাটে যদি কোনো বৃষ্টি না-হয় তবে সেটাও আমারই দোষ। একটা চাকরির খোঁজে আমি বাধ্য হ'য়ে সব জায়গায় ঘুরেছি। কিন্তু···কিন্তু শুধু আমারই জন্যে কোথাও কোনো চাকরি খালি নেই।'

'খালি একটা আছে।'

'কোথায়?'

'একটু সবুর করো, বলছি। এই পণ ব্যাপারটা কী?'

'কোনো পুরুষ যাতে কোনো মেয়েমানুষকে রাখতে পারে, তার জন্যে ভাড়ার টাকা।'

'উঁহু, এটা আমার মাথায় ঢুকছে না।'

'ধরো, কেউ আমাকে বিয়ে করতে চাইলো—'

'বেশ তো, আমিই না-হয় করবো।'

'ওঃ! যদি তুমি আমাকে বিয়ে ক'রে নিয়ে চ'লে যাও—আমাকে খাওয়াতে-পরাতে টাকা লাগবে না? আমাকে স্নান করাতে, তেল, পাউডার, সুগন্ধি লাগবে, টাকা লাগবে যখন আমার বাচ্চা হবে—আঁতুড়ের সময়, আমি মরতে বসলে ডাক্তার-বদ্যির খরচ আছে, মাবা গেলে শ্রাদ্ধ-শান্তির ব্যবস্থা আছে। তা, এই সব টাকা আগাম জোগাতে হবে—তবেই আমাকে কেউ বিয়ে করতে চাইবে।'

'এ-সব তো এই জন্যেই যে কেউ স্যারাম্মাকে ভালোবাসে না। ধরো, কেউ যদি তোমাকে ভালোবাসে,···'

'তখনও পণের টাকা দিতে হবে। এ আমাদের শাস্তরে আছে।'

কেশবন নায়ার এই শাস্ত্র-অনুমোদিত পণের কথাটা শুনে ভারি খুশি হ'য়ে উঠলো। উৎফুল্ল ক'রে তোলার মতোই ব্যবস্থা, সে মনে-মনে ভাবলে। 'এ-রকম বিধান যদি না থাকতো—ওরে, বাপ্‌রে!'

স্যারাম্মা বললে: 'পণপ্রথাকে আমি ঘেন্না করি!'

কেশবন নায়ার বললে: 'এই পণপ্রথাকে আমি দারুণ ভালোবাসি।'

'কেন?'

'বলছি। এই পণপ্রথা বেঁচে আছে তো নাম্বুদিরিদের মধ্যেই।'

'মুসলমানদের মধ্যেও এটা আছে।'

কেশবন নায়ার বললে: 'পণের টাকা যারা দিতে পারে না, তাদের তাহ'লে যে পণ চায় না অন্য সম্প্রদায়ের এমন কাউকে বিয়ে করতে রাজি হওয়া উচিত।'

'বাঃ, চমৎকার !'

'হ্যাঁ। কোনো নায়ার খ্রীস্টান বিয়ে করুক, খ্রীস্টান বিয়ে করুক কোনো নায়ার বা মুসলমানকে। মুসলমান বিয়ে করুক কোনো নায়ার বা নাম্বুদিরিকে—'

'একটা প্রশ্ন ক'রে তোমায় বাধা দিতে পারি ?'

'করো তোমার প্রশ্ন !'

'আমার জন্য কী কাজ পেয়েছো, সে-কথাটা কিন্তু তুমি এখনও আমাকে বলোনি।'

'ওঃ···কিন্তু, স্যারাম্মা, তুমি তো কাজটা নেবে না।'

'কতবার বললুম না, যে নেবো। নেবো-নেবো-নেবো,'—

'তাহ'লে,—' কেশবন নায়ার হঠাৎ তার হৃদয়ের আতরদানটির ছিপি খুলে ফেললে, ছিপিটি শব্দ ক'রে খুলে গেলো। 'স্যারাম্মা, আমি তোমাকে যেমন ভালোবাসি, তোমারও আমাকে তেমন ভালোবাসা উচিত। তোমার জন্যে এই কাজটাই খুঁজে পেয়েছি, স্যারাম্মা।'

স্যারাম্মা আঁৎকে উঠলো। সে কেবল এক মুহূর্তের জন্য। হঠাৎ তার মুখটা রাঙা হ'য়ে উঠলো। তার চোখের পাতা ভারি আস্তে নেমে গেলো। শুধু তাই নয়, সে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো শান্ত আর রূপসী—মুখে মৃদু একটা হাসি, যা থেকে কোনো গভীর অনুভূতি উপচে পড়ছে।

কেশবন নায়ারের বুকের মধ্যকার বাঁধটা ভেঙে গেলো। সে বললে : 'আমি তোমাকে কতদিন ধ'রে ভালোবেসে আসছি, স্যারাম্মা। আমার এই বুকটার চেয়েও বেশি, আমার প্রাণের চেয়েও বেশি, আমার এই দেশটার চেয়েও বেশি, আমার এই—!'

স্যারাম্মা খিলখিল ক'রে হেসে উঠলো। তার গালে নতুন রং লেগেছে। তার চোখের তারা আরো উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে।

কেশবন নায়ার জিগেশ করলে : 'এবার তুমি চাকরিটা সম্বন্ধে কী বলবে বলো, স্যারাম্মা।'

সারাম্মা হেসে উঠলো, নিচু স্বরে বললে : 'চাকরিটা তো ভালোই। তা কত মাইনে দেবে, শুনি।'

'মাইনে ? ওঃ, তুমি বুঝি লড়তে চাচ্ছো আমার সঙ্গে। ঠিক হ্যায়, লড়াইই সই। ক্ষত্রিয়ের উগ্র রক্ত আমার ধমনীতে ব'য়ে যাচ্ছে···রমণী, তুমি আমাকে যুদ্ধের কী ভয় দেখাও···যুদ্ধ যদি চাও, তবে তাই পাবে, করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে ! ইনকিলাব জিন্দাবাদ !' তারপর খুব গম্ভীর হ'য়ে কেশবন নায়ার শুধোলে : 'কত মাইনে চাও তুমি ?'

'তুমি নিজেই দরটা ঠিক করো না।'

অনেকক্ষণ ভেবে কেশবন নায়ার মাইনে ঠিক করলে। 'কুড়ি টাকা।'

স্যারাম্মা বললে : 'অত কম!'

'আর একটা পয়সাও বেশি দিতে পারবো না। সারা মাস ধ'রে হপ্তায় ছ-দিন ন-ঘণ্টা ক'রে খেটে আমি নিজে মাইনে পাই কুললে চল্লিশ টাকা। তা থেকে তোমার বাবাকে ঘর ভাড়া দিতে হয়, রেস্তোরাঁয় খাবার খরচ দিতে হয়, ধোবাকে পয়সা দিতে হয়…আরো কত কী খরচ। যদি খরচ কমাইও, যদি প্রায় না-খেয়ে থাকবো ব'লেও ঠিক করি, তাহ'লে টেনেটুনে কুড়ি টাকায় নামাতে পারি। বাকি সব টাকাই আমি তোমাকে দিয়ে দিতে চাই, স্যারাম্মা। তাছাড়া তোমার কাজটা তো আর কঠিন নয়। সেটাও ভেবে ছাখো।'

স্যারাম্মা বললে : 'খুবই কঠিন কাজ। কেশবন নায়ার তো চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কেবল ন-ঘণ্টা খেটেই খালাশ। দিনের বাকি পনেরো ঘণ্টা থাকে তার বিশ্রাম করার জন্যে। আর আমার কাজ—সেখানে বিশ্রাম কই এক মুহূর্ত? আমাকে দিবারাত্রি কেশবন নায়ারের কথা ভাবতে হবে—খাবার সময়, ঘুমের সময়—সবসময়—তাই না কি? কেশবন নায়ার যখন কাঁদে তখন আমাকে কাঁদতে হবে, কেশবন নায়ার যখন হাসে তখন আমাকে হাসতে হবে। সে না-খাওয়া অব্দি আমি খেতে পাবো না, সে যখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোবে, তখন আমায় জেগে-জেগে তাকে ভালোবাসতে হবে।'

স্যারাম্মা এমনভাবে কেশবন নায়ারের দিকে তাকালে যেন সে ভারি একটা বিদঘুটে তেতো ওষুধ খেয়ে ফেলেছে। তারপর সে জিগেশ করলে : 'চাকরিটা পাকা, না নেহাৎই দু-চারদিনের জন্যে?'

'পাকা! চিরস্থায়ী!' কেশবন নায়ার ঘোষণা করলে।

'ওঃ, তাও ভালো! তার মানে কেশবন নায়ারের যদি ভালোমন্দ কিছু-একটা হ'য়ে যায়, তখনও চাকরিটা আমার থাকবে?'

'তার মানে?'

'কেশবন নায়ার মারা যাবার পরেও আমার চাকরিটা থাকবে কি?'

'নিশ্চয়ই। আমি টেঁশে গেলেও আমাকে ভালোবেসে যেতে হবে তোমায়।'

স্যারাম্মা এবার একটা খ্যাঁচড়া তুললো। 'তুমি ম'রে গেলে আমাকে মাইনেটা দেবে কে, শুনি?'

কেশবন নায়ার চুপ ক'রে রইলো। কীইবা বলতে পারে সে?

কেশবন নায়ারকে চুপ দেখে স্যারাম্মা হেসে উঠলো। টিটকিরি দিয়ে বললে : 'আমার মাথায় চাঁদের আলো-টালো পোরা থাকলে কী হবে, চাকরিটার এই একটা মস্ত গোল আছে। তুমি ম'রে গেলে আমাকে কে মাইনে দেবে ?'

কী বলবে বেচারা ? কেশবন নায়ার গভীরভাবে ভাবলে কিছুক্ষণ। শেষটায় সে একটা পথ দেখতে পেলে। হেসে বললে : 'ধরো, আমরা যদি সহমরণে যাই —একসঙ্গে মরি যদি দুজনে ?'

'আহা ! স্বার্থপর, নগ্ন নির্লজ্জ স্বার্থপরতা ! কেশবন নায়ার যখন মারা যাবে, তখন আমাকেও মরতে হবে—না ?'

'স্যারাম্মা, তুমি আমাকে নিয়ে মশকরা করছো।'

'মোটেই না। তথ্যগুলো যাচাই ক'রে নেয়াকে কি মশকরা করা বলে ? আমি কি মেয়েমানুষ নই ? আমার মাথার খুলি যদি ফেটে দু-ভাগ হ'য়েও যায়, কোথায় পাবে তুমি আমার মগজ ?'

'আমাকে মাফ করো। স্যারাম্মার জ্ঞান-বুদ্ধি-রূপ কোনোটাই আমার নেই।'

'এই তো, এবার কে ঠাট্টা করছে আমাকে !'

'স্যারাম্মা, আমি তোমাকে কক্‌খনো ঠাট্টা করবো না—না, না, না !'

'বেশ, তবে যত পারো রসিকতা করো আমায় নিয়ে।'

কেশবন নায়ারের ভেতরটায় একটা স্নায়ু ছিঁড়ে গেলো। 'আমি আমার জীবনসঙ্গিনীকে নিয়ে কখনো রসিকতা করতে পারি ? আমার জীবনের দেবীকে নিয়ে আমি কখনো মশকরা করতে পারি ? আমার প্রাণ, আমার আত্মা—তাকে কি আমি কখনো ঠাট্টা করতে পারি ? আমি কী ক'রে আমার জীবনের দিব্যানু-ভূতিকে নিয়ে পরিহাস—'

স্যারাম্মা তার তোড়টায় বাধা দিলে। 'দয়া ক'রে থামো ! তোমাকে একটা কথা জিগেশ করতে চাই।'

'জিগেশ ? আদেশ করো।'

'আমাকে তোমার জীবনসঙ্গিনী হ'তে হবে বুঝি ?'

'হবে কেন—হ'য়ে আছো।'

'কবে থেকে ?'

'অনেকদিন আগে থেকে ?'

'অনেক মানে কতদিন ?'

'অনেক, অনেক দিন আগে থেকে।'

'তাহ'লে অ্যাদ্দিন আমায় সে-কথা তুমি বলোনি কেন ?'

'বলিনি তোমাকে ? তোমার কথা আমি রোজ ভাবি, সারাক্ষণ। রোজ তোমাকে একটা ক'রে প্রেমপত্র লিখি আমি।'

'আর তারপর ?'

'তারপর সেটা আমি ছিঁড়ে ফেলি।'

'তাই বুঝি ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহ'লে সংক্ষেপে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই : আমাকে তোমার জীবনসঙ্গিনী হ'তে হবে ? তাহ'লে আমি যা বলবো, সব তুমি শুনবে—তাই না ?'

কেশবন নায়ারের সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ : 'যা তুমি বলবে—সব ? কাউকে খুন করতে হবে ? ক'রে আসবো। তুমি চাও আমি সাঁৎরে সমুদ্র পেরোই ? পেরোবো। আমি পাহাড় হাতে নিয়ে লোফালুফি করবো। আমি তোমার জন্য মরতেও প্রস্তুত,স্যারাম্মা।'

'আপাতত তোমায় মরতে হবে না—শুধু মাথায় ভর দিয়ে, দাঁড়াও একবার। আমরা দেখি।'

'তুমি সত্যি চাও আমি মাথায় ভর দিয়ে দাঁড়াই ?'

'ওঃ, এ সবের মধ্যে আবার "সত্যি" ব'লে একটা হুমদো কথাও আছে।'

'না !' কেশবন নায়ার সানন্দে উঠে দাঁড়ালো। 'মাথায় ভর দিয়ে দাঁড়ালেই চলবে তো ?'

'আপাতত চলবে বটে।'

'ঠিক হ্যায় !'

সে গা থেকে শার্টটা খুলে চেয়ারে রাখলো। তারপর ধুতিটা হাঁটু অব্দি তুলে মালকোঁচা মারলো। মাথার উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালো, শূন্যে ঠ্যাং দুটো তোলা।

স্যারাম্মা খুশি-খুশি মুখে তাকিয়ে দেখলো তার পায়ের নখ থেকে মাথার চুল। তারপর মন্তব্য করলে : 'শাবাশ !'

ঐ অবস্থা থেকে কেশবন নায়ার জিগেশ করলে : 'স্যারাম্মা কি আমায় ভালোবাসে ?'

স্যারাম্মা চুপ ক'রে রইলো।

কেশবন নায়ার আবার জিগেশ করলে : 'স্যারাম্মা, তুমি কি কাজটা নিয়েছো ?'

আস্তে, সাবধানে, কোনো আওয়াজ না-ক'রে, স্যারাম্মা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলো, তারপর নিচে থেকে চেঁচিয়ে বললে : 'কাল তোমাকে জানাবো !'

'স্যারাম্মা, তুমি নিয়েছো তো কাজটা?' পরদিন কেশবন নায়ার তাকে জিগেশ করলে!

স্যারাম্মা বললে: 'তোমাকে কাল বলবো।'

পরদিন আবার কেশবন নায়ার তাকে একই কথা শুধোলে, আর স্যারাম্মাও সেই একই জবাব দিলে: 'কাল তোমাকে বলবো।'

পরদিন যখন কেশবন নায়ার তাকে আবারও এই একই প্রশ্ন করলে, স্যারাম্মাও সেই একই জবাব দিলে: 'আমি তোমাকে কাল বলবো!'

পরের দিন আবার কেশবন নায়ার তাকে প্রশ্নটা করলে আর স্যারাম্মা উত্তরে বললে: 'আমি তোমাকে কাল বলবো!'

কেশবন নায়ার পরদিন আর তাকে প্রশ্নটা করলে না। সে একটা ঘোষণা করলে বরং: 'আমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছি! বেঁচে থেকে আর কী লাভ?'

'চমৎকার প্রস্তাব! এবার কেউ একটা শোকগাথা লিখতে পারবে!'

কেশবন নায়ার কিছু বললে না।

স্যারাম্মা জিগেশ করলে: 'তো, তুমি তাহ'লে আত্মহত্যা করবে ব'লে ঠিক করেছো?'

'হ্যাঁ।'

'শুভক্ষণটি কখন আসবে?'

কেশবন নায়ার কিছু বললে না।

স্যারাম্মা জিগেশ করলে: 'কীভাবে আত্মহত্যা করবে?'

'এ-বিষয়ে এখনও মনস্থির করিনি। আমি ভাবছি।'

স্যারাম্মা পরামর্শ দিলে: 'রেললাইনে মাথা পেতে দিয়ে মরতে পারো। কিংবা গলায় দড়ি দিতে পারো। এ দুটোর মধ্যে কোনটা তোমার পছন্দ?'

কেশবন নায়ার কিছু বললে না। কী নিষ্ঠুর প্রাণ এর!

স্যারাম্মা আবারও পরামর্শ দিলে: 'আরেকটা উপায় অবশ্য আছে, কেউ জানতেও পাবে না। একটা ছোট্ট ডিঙি নাও, সঙ্গে ভারি একটা পাথর, আর একটা দড়ি। সন্ধেবেলায় চুপি-চুপি লেকের মাঝখানটায় বেয়ে চ'লে যাও। তারপর দড়ির একদিক বাঁধো পাথরটায়, অন্যদিকটা ফশকা গেরো দিয়ে নিজের গলায় প'রে নাও। পা দিয়ে ডিঙিটাকে সরিয়ে দিতে হবে তোমায়—তারপর ডুবে মরো!'

ডবোল নিষ্ঠুর প্রাণ এর!

কেশবন নায়ার বললে: 'আমি নিজে আরেকটা উপায় ভেবেছি। আমি

এখানেই গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়বো। গলার দড়ি দেবার সময় আমার পায়ে বাঁধা থাকবে মস্ত একটা কাগজ। তাতে বলা থাকবে : "শোনো, সারা জগৎ ! স্যারাম্মা আর আমার মৃত্যুর সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই নেই ! এটা সত্যি যে আমি স্যারাম্মাকে ভালোবাসি আর স্যারাম্মা আমাকে ভালোবাসে না ! এটাও সত্যি যে আমি ওকে যে প্রেমপত্র লিখেছিলুম সেটা সে দলামোচা ক'রে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলো। তবু আমার মৃত্যুর সঙ্গে স্যারাম্মার কোনো সম্বন্ধই নেই। প্রয়াত কেশবন নায়ার কর্তৃক স্বাক্ষরিত।"'

'আর-কোনো খবর আছে ?'

'না।'

স্যারাম্মা বললে : 'প্রেমপত্রটা আমি ছুঁড়ে ফেলিনি। সেটা কুড়িয়ে নিয়ে তাতে আমি দাঁতের মাজনের গুঁড়ো মুড়ে রেখেছি।'

'আমার প্রেমপত্রে ?'

'হ্যাঁ !'

রমণী হৃদয়ের কী কঠিনতা ! কেশবন নায়ার কিছু বললে না আর। কত যে লক্ষ্যহীন দিন কাটলো তার হিশেব নেই। মুখটা তার গম্ভীর থাকে, কারুর সঙ্গে কথা বলে না, কারুর দিকে তাকায় না।

মেয়েদের সে দু-চক্ষে দেখতে পারে না ! 'হাঁদার দল ! আকাট ! পাষাণ-হৃদয়া !' স্যারাম্মা একটা হাঁদার হদ্দ ! আর নিষ্ঠুরহৃদয়া ! কেশবন নায়ার নিজেও হাঁদার হদ্দ একটা। কিন্তু তার হৃদয় কঠিন নয়। পৃথিবীর সব নারী-পুরুষই হাঁদার হদ্দ—প্রত্যেকে ! কেশবন নায়ারের এই মত যখন কেলাসিত হ'য়ে উঠেছে, এমন সময় একদিন সন্ধেবেলায় স্যারাম্মা উঠোনে এসে তার সামনে হাত পেতে দাঁড়ালে, যেন সে কিছু একটা প্রত্যাশা করছে। কেশবন নায়ার ভেবেই পেলে না সেটা কী হ'তে পারে।

স্যারাম্মা বললে : 'আমার মাইনেটা ?'

'মাইনে ? কিসের মাইনে ?' কেশবন নায়ার কেমন বোমকে গেলো। তার এই ভ্যাবাচ্যাকা দশা দেখে স্যারাম্মা ব্যাখ্যা ক'রে বোঝালে। তার গলার স্বরে বেশ ক্ষোভ, যেন সে তার কথা রাখেনি ব'লে স্যারাম্মা দারুণ অপমানিত বোধ করছে, 'ওঃ, ব্যাপারটা তাহ'লে এই রকম ! আমার আগেই তা বোঝা উচিত ছিলো। লোকে কি আর সাধে এ-কথা বলে যে আমার মাথায় কেবল চাঁদের আলোটালো পোরা আছে ? ঐ ভীষণ খাটুনির কাজটা নেবার পর পনেরো দিন কেটে গিয়েছে !'

'ওঃ !' কেশবন নায়ারের মুখের মেঘ কেটে গেলো, চোখ চকচক ক'রে উঠলো ! আকস্মিক সুখে তার বুক ফুটবলের মতো ফুলে উঠলো, বুকের বাঁ দিকের পাঁজরে কেমন একটা চাপ।

'সোনা ! এ-কথা তুমি আমাকে বলোনি কেন ?'

স্যারাম্মা আহত স্বরে নালিশ করলে : 'এই এত ছোট্ট আয়ুটায় জীবন যখন টগবগ ফুটছে তারুণ্যে আর বুকে ভ'রে আছে প্রেমের সুগন্ধে—লোকে যদি তখন মুখ করুণ ক'রে আত্মহত্যার কথা বিড়বিড় করে, কিছু শোনেও না, দ্যাখেও না—তবে আমার কী করার থাকে ?'

'আর-কোনো খবর নেই তবে, না কি আছে ?

'না !'

কেশবন নায়ার হুকুমের স্বরে বললে : 'এসো !'

সে এগিয়ে গেলো, আর স্যারাম্মা গেলো তার পেছন-পেছন ! সিঁড়ি বেয়ে উঠলো তারা দোতলায়, কেশবন নায়ার ঢুকে পড়লো তার ঘরে, স্যুটকেসটা খুললো, বার ক'রে নিলে দুটো দশটাকার নোট, তার বুকে তখন টিপটিপ ক'রে আওয়াজ হচ্ছে, সে একটা খামের মধ্যে নোট দুটোকে পুরে ওপরে লিখলো 'শ্রীমতী স্যারাম্মার সমীপে,' তারপর সেটা তার হাতে তুলে দিলে।

স্যারাম্মা জিগেশ করলে : 'এ কি কোনো প্রেমপত্র নাকি ?'

কেশবন নায়ার কোনো কথা বললে না। প্রেমপত্র ? তা ভাবুক না স্যারাম্মা যা-খুশি !

কিন্তু স্যারাম্মার মধ্যে উদ্বেগের কোনো চিহ্নই দেখা গেলো না। পাকা ব্যবসাদারের মতো সে খাম থেকে নোটগুলো বার ক'রে নিলে, তারপর আলোয় তুলে ধ'রে খুব গম্ভীরভাবে সেগুলো উলটেপালটে দেখতে লাগলো।

'জাল নোট নয় তো এগুলো, অ্যাঁ ?'

কেশবন নায়ার কিছু বললে না।

'বেশ,' স্যারাম্মা সাবধান ক'রে দেবার স্বরে বললে, 'এর পর থেকে কিন্তু আর এ-রকম দেরি কোরো না। আমার মাইনেটা একেবারে কাঁটায়-কাঁটায় চাই—একেবারে মাসপয়লায়।'

কেশবন নায়াঁরের ইচ্ছে হচ্ছিলো স্যারাম্মাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে একশো হাজার চুমোয় ওকে ভরিয়ে দেয়। সে তার কাছে এগিয়ে গেলো।

স্যারাম্মা বললে, 'চার হাত দূরে দাঁড়ালেই হবে—অত কাছে না—'

'আমি তোমাকে চুমু খেতে চাই।'

'আমাকে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু এ-রকম কোনো কথা তো চুক্তিতে ছিলো না, তাই না?'

কেশবন নায়ার কিছু বললে না।

এইভাবে এক-এক ক'রে পাঁচমাস কেটে গেলো। সব মিলিয়ে একশো টাকা হাত বদল হ'লো। কেশবন নায়ার ঘুণাক্ষরেও জানতে চায়নি ও-টাকা দিয়ে সে করছে কী, কিন্তু তৃতীয় মাসে স্যারাম্মা তাকে জানালে যে সে একটা লটারিতে হাজার টাকা জিতেছে। কেশবন নায়ার তাকে যে-মাইনে দিয়েছিলো, তারই থেকে এক টাকা দিয়ে সে লটারির টিকিট কিনেছিলো—সেই টাকাটার কল্যাণেই জিতেছে! কেশবন নায়ার কিন্তু এ-কথায় খুব একটা পাত্তা দিলে না। তুচ্ছ টাকাকড়ির ব্যাপারে সে মন দেয় কী ক'রে? সে তো প্রেমের জোৎস্নায় আলো হ'য়ে আছে, তার প্রাণাধিকা প্রিয়তমা তাকে যা-ই বলে তাতেই সে বিশ্বাস করে, প্রতিদানে সে যে কিছুই পাচ্ছে না, এতে তার কিছুই এসে যায় না। যা তার ইচ্ছে, তাতেই তথাস্তু। সে যেদিকে যেতে বলবে, কেশবন নায়ার সেদিকেই যাবে। স্যারাম্মার ইচ্ছে অনুযায়ীই কেশবন নায়ার দূর-দূর জায়গায় চাকরির দরখাস্ত পাঠাতে লাগলো। কেন? না, স্যারাম্মা তাকে পাঠাতে বলেছে। তবে স্যারাম্মা তাকে করতে বলেনি, এমন কাজও কেশবন নায়ার করছে বৈ কি! স্যারাম্মার অসুখ করলে ডাক্তার-বদ্যি ডেকে আনছে, তার জন্য ওষুধ-পথ্য কিনেছে, তার আর তার সৎমার মধ্যে যাতে ভাব হয় সেজন্য চেষ্টা করছে, পিতামাতার দায়িত্ব সম্বন্ধে স্যারাম্মার বাবার কাছে লেকচার দিচ্ছে—এইসব। স্যারাম্মার কিন্তু তার এ-সব কাজের জন্য মুখ ফুটে ধন্যবাদ দেয়া দূরের কথা তাকে দেখলে মোটেই একটুও কৃতজ্ঞ ব'লেও বোধ হয় না। কেশবন নায়ার সব সহ্য করছে হাসি মুখে। কিন্তু যেটা তার একেবারে অসহ্য ঠেকে সেটা হ'লো স্যারাম্মার এই ভঙ্গিটা, কোনো কথা পাড়বার আগে সে সবসময় ভণিতা হিশেবে বলে: 'এই এত ছোট্ট আয়ুটার জীবন যখন টগবগ ক'রে ফুটছে তারুণ্যে আর বুক ভ'রে আছে প্রেমের সুগন্ধে—' এ-কথাটা শোনবামাত্র কেশবন নায়ার কেমন পাণ্ডুর হ'য়ে যায়। যখনই স্যারাম্মা কিছু বলবার জন্য মুখ খোলে, সে উৎকণ্ঠায় থাকে এই বুঝি সে ঐ কথা দিয়ে শুরু করছে। ও-কথা সে না-বললে কেশবন নায়ার খুব একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফ্যালে। এ-সব সত্ত্বেও তার প্রেম কি একটুও কমেছে? একতিলও না। বরং দিনে-দিনে প্রেম

তার বেড়েই চলেছে। সব সময়েই তার স্যারাম্মাকে চোখে-চোখে রাখতে ইচ্ছে করে। তাকে জড়িয়ে ধ'রে তার চুমো খাবার ইচ্ছে করে, আর—। তার কামনার কি কোনো শেষ আছে?

আর স্যারাম্মা? সে যে কেশবন নায়ারের প্রেমে পড়েছে এমন কোনো লক্ষণই তার হাবভাবে দেখায় না—না কথায়, না কাজে, কিছুতেই মনে হয় না যে সে কেশবন নায়ারকে ভালোবাসে।

তারপর একদিন এলো, যখন দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ অত্যাসন্ন হ'য়ে উঠেছে। দূরের কোন-এক শহরে একটা চাকরি পেয়েছে কেশবন নায়ার, মাইনে পাবে আড়াইশো টাকা। স্যারাম্মার পরামর্শ অনুযায়ী কেশবন নায়ার লিখে জানিয়েছে যে সে চাকরিটা নেবে। স্যারাম্মা বলেছে 'এখন থেকে, তাহ'লে, আমার মাইনে হবে একশো পঁচিশ টাকা।'

ব্যস, শুধু এই। তার যেন আর কিছুই বলার নেই। তবু, স্যারাম্মা তাকে মনে করিয়ে দিয়েছে: 'প্রতি মাসেব এক তারিখে তুমি মানি অর্ডার করবে। ঠিকানাটা তো জানো, না ভুলে গেছো?'

কেশবন নায়ার কিছুই বলেনি।

স্যারাম্মা জিগেশ করেছে. 'তা, কবে যাচ্ছো, শুনি!'

কেশবন নায়ার বলেছে: 'তুমি তো জানোই আমাকে দশ দিনের মধ্যে কাজে যোগ দিতে হবে। ভাবছি পরশু রওনা হবো। ব্যাঙ্কের কাজটায় আমি ইস্তফা দিয়ে দিয়েছি।'

'যাবে ব'লেই ঠিক করেছো তুমি, তাই না?'

'এ আবার কেমনতর প্রশ্ন?'

'আমি তো এখনও তোমার জীবনের দেবী, তাই নয় কি?'

'হ্যাঁ।'

'আমার জন্য তুমি কি মরতেও রাজি আছো?'

'নিশ্চয়ই।'

'শপথ ক'রে বলতে পারবে?'

'আমি দিব্যি গেলে বলছি।'

স্যারাম্মা বলেছে: 'অবশ্য, মরতে তোমাকে হবে না। তবে আমি যদি বলি এ-চাকরিটা নিয়ো না, তবে নেবে না তো?'

চাকরিটা নেবে না? সে যে তাহ'লে আচ্ছা ফ্যাসাদে প'ড়ে যাবে। বাড়ি

ভাড়া দিতে পারবে না, খেতে-পরতে পাবে না। তাকে ঘুরে বেড়াতে হবে রাস্তায়-রাস্তায়, ভবঘুরে, বাউণ্ডুলে! ভাবুক-ভাবুক মুখ ক'রে গালে হাতে দিয়ে কেশবন নায়ার চুপ ক'রে মেঝের দিকে তাকিয়ে থেকেছে।

স্যারাম্মা উঠে প'ড়ে এগিয়ে গেছে সিঁড়ির দিকে। কেশবন নায়ার কষ্ট-কষ্ট গলায় ডেকেছে তাকে: 'স্যারাম্মা, তোমাকে একটা কথা বলতে চাই।'

স্যারাম্মা ফিরে এসেছে।

'প্রেমের কথা যদি বলতে চাও, তবে শোনো—ও-কথা শুনলেই আমার গা রী-রী ক'রে ওঠে!'

কেশবন নায়ার কিছু আর বলেনি।

স্যারাম্মা বলেছে: 'কী হ'লো? বলো! আমি যখন মাইনে পাই, তখন কী ক'রে বলি যে তোমার কথা শুনবো না।'

'আচ্ছা, স্যারাম্মা, সবকিছুই তোমার কাছে ঠাট্টা ব'লে মনে হয়, তাই না?'

'তুমি কি এ-কথাটা বলবার জন্যে আমায় ডেকেছিলে?'

'না।'

'তাহ'লে?'

'স্যারাম্মাকেও আমার সঙ্গে আসতে হবে। আমি ওখানে একা থাকতে পারবো না।'

স্যারাম্মাকে দেখে মনে হয়েছে, সে বুঝি এক্ষুনি হাসিতে ফেটে পড়বে। জিগেশ করেছে: 'ভয় করছে তোমার?'

'না, আমি স্যারাম্মা। আমি তোমাকে ভালো···'

'স্যারাম্মা, আমি তোমাকে ভালোবাসি! এ-কথাটা বোধহয় একশো হাজার বার শুনেছি! তা এই ভালোবাসা ব্যাপারটা কী?'

এ-কথার জবাব দেয়া খুবই কঠিন! কেশবন নায়ার খুব ভালো ক'রেই জানে ভালোবাসা কাকে বলে। কিন্তু সেটা মুখ ফুটে বলতে তার কেমন যেন লজ্জা করে।

'স্নেহ, ভালোবাসা—এ-সব যেন চাঁদের আলোর মতো···প্রেম হ'লো যেন সুবাসিত জোৎস্না,'—

'চাঁদের আলো! জোৎস্না!' স্যারাম্মা ভারি অবাক হ'য়ে গেছে। 'তুমি না বলেছিলে এ-সব থাকে মেয়েদের মগজে?'

কেশবন নায়ার সায় দিয়ে ঘাড় নেড়েছে। একটু পরে বলেছে: 'তুমি আমার সঙ্গে আসবে, স্যারাম্মা?'

'এসে করবোটা কী?'

'আমার বউ হ'য়ে থাকবে।'

'আমাদের দুজনের ধর্ম কি আলাদা নয়?'

'তাতে কী হয়েছে? আমরা রেজিস্ট্রি ক'রে বিয়ে করবো।'

'কোনো পণ চাই না তোমার? যৌতুক?'

'স্যারাম্মাই আমার যৌতুক! স্যারাম্মাই আমার…'

'থামো, থামো! আমার আরো-সব খটকা আছে!'

'কী সে-সব?'

'আমাদের স্বামী-স্ত্রী হিশেবে থাকার বিস্তর ঝামেলা আছে। একজন যখন পুজো দিতে মন্দিরে যাচ্ছে, আরেকজন যাচ্ছে চার্চে—উপাসনায়! আমরা দুজনে মিলে একসঙ্গে কী করতে পারবো? গির্জে আর মন্দির—এ দুটো সবসময়েই আমাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকবে—তাই না?"

কেশবন নায়ার খুশিতে ডগমগ ক'রে উঠেছে। 'এ আর এমন কী?' সে ব'লে উঠেছে · 'ও-সব গির্জেটির্জে মন্দিরটন্দির ছাড়াই আমাদের চলবে—চলবে না? চার্চ আর মন্দির যদি স্যারাম্মা আর কেশবন নায়ারকে না-চায়, তবে স্যারাম্মা আর কেশবন নায়ারেরও চার্চ আর মন্দিরে কোনো কাজ নেই। ভেবে দ্যাখো একবার, স্যারাম্মা! ভেবে দ্যাখো, কত কষ্ট তুমি সয়েছো! তোমার বাবা আর সৎমা তোমার সঙ্গে বেদম খারাপ ব্যবহার করেননি অ্যাদ্দিন? চার্চ তখন তোমার কী করেছিলো? কী করেছিলেন তখন, ঈশ্বর? মন্দিরও আমার কোনো উপকার-টুপকার করেনি! এক কথায়, যদি ঈশ্বর, চার্চ আর মন্দির আমাদের না-ই চায়, তবে তাই-সই—আসুক তারা, আমাদের পায়ে প'ড়ে থাকুক!'

'অতীব খাঁটি কথা!' স্যারাম্মা বলেছে: 'কিন্তু আমার আরো অনেক সংশয় আছে!'

কেশবন নায়ার বলেছে: 'বলো, স্যারাম্মা, বলো। তোমার এই কেশবন নায়ার তোমার সব সংশয় ঘুচিয়ে দেবে!'

হঠাৎ একটু লাজুক হ'য়ে পড়েছে স্যারাম্মা। বলেছে: 'আরেকটা ব্যাপার আছে—'

'বলো, বলো?'

সে বলেছে: 'আমাদের ছেলেমেয়ে হবে না? তাদের ধর্ম কী হবে? আমি ওদের হিন্দু হিশেবে বড়ো ক'রে তুলতে চাই না। আবার খ্রীস্টান হিশেবেও যে

তাদের বড়ো করা হবে—আমার—আমার স্বামী তা চাইবে না। সেক্ষেত্রে তাদের ধর্ম কী হবে?'

কেশবন নায়ারের ঘাম বেরিয়ে গিয়েছিলো! এ-কথাটা তো তার মাথায় আসেনি। অত্যন্ত সংগত প্রশ্ন এটা—ছেলেমেয়েদের ধর্ম কী হবে? কেশবন নায়ার এ নিয়ে ভাবনায় প'ড়ে গিয়েছিলো। অনেক, অনেক ভেবেছে সে—গভীর ভাবে, প্রখর ভাবে। তার কপালের শিরগুলো দাঁড়িয়ে উঠেছে দু-ধারে। কপালে ঘাম ফুটে বেরিয়েছে। এই জটটা খুলে তবু কোনো সহজ সমাধান তার চোখে পড়েনি! অন্ধকারে হাৎড়েছে সে ব্যাকুল ভাবে। কোথাও কোনো আলোর লেশও দেখা যায়নি! শেষটায় বিদ্যুৎচমকের মতো একটা ভাবনা ঝিলিক দিয়ে উঠেছিলো তার মাথায়। যেন আলোজালা একটা দরজা খুলে গেছে সামনে, তার ও-পাশে আছে একটা চমৎকার বাগান। সে উত্তেজিত ভাবে চেঁচিয়ে উঠেছে: 'হ্যাঁ, পেয়েছি!'

'কী?'

'বলছি,' কেশবন নায়ার তাকে জানিয়েছে। 'কোনো ধর্ম অনুযায়ীই আমরা ছেলেমেয়েদের বড়ো করবো না। কোনো ধর্ম ছাড়াই তারা বড়ো হ'য়ে উঠবে!'

'আর তারপর?'

'কেন, ওরা যখন বড়ো হবে, আমরা নিরপেক্ষভাবে সবগুলো ধর্মের কথাই ওদের ব'লে দেবো। কুড়ি-একুশ বছর বয়েসে, তারপরও, যদি ওদের কোনো ধর্ম কাজে লাগে, তাহ'লে যে-ধর্ম ইচ্ছে সেই ধর্মেই ওরা দীক্ষা নেবে।'

কেশবন নায়ারের মুখের দিকে না-তাকিয়েই স্যারাম্মা খুশি-খুশি গলায় বলেছে 'এতে অবশ্য যুক্তি আছে···আর নাম? ধরা যাক, প্রথমে আমার এক ছেলে হ'লো। তো ছোট্ট সোনার নাম কী হবে?'

কেশবন নায়ার মুশকিলে পড়েছে আবার। 'সত্যি তো, ছোট্ট সোনার নামটা কী হবে? ওকে আমরা হিন্দু নামও দিতে পারবো না, আবার খ্রীস্টান নামও দিতে পারবো না।' কেশবন নায়ার ভেবেছে একটু গভীরভাবে, তারপর আবার উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠেছে: 'জানো, আমরা অন্য কোনো সম্প্রদায় থেকে বেছে-বেছে কোনো দারুণ নাম দিতে পারি ওকে, ছিমছাম, সপ্রতিভ, সুন্দর!'

'তখন ও-সম্প্রদায়ের লোকেরা কি ভাববে না যে সে তাদেরই একজন?'

'ঠিক!' কেশবন নায়ার তক্ষুনি সায় দিয়েছে। 'যদি কোনো মুসলমানি নাম দেয়া হয় তো লোকে ভাববে যে সে বুঝি মুসলমান। পার্শি নামের বেলাতেও তথৈবচ। কোনো রুশী-চীনে নামেও সেই একই ঝামেলা বেঁধে বসবে।'

কী নাম দেবে ছেলের ? এমন-একটা নাম হওয়া চাই, যেটা এর আগে আর-কেউ ব্যবহার করেনি। নাম শুনে যেন কেউ ধর্মটর্ম সম্বন্ধে কোনো আঁচই না-পায়। এমন নাম কোত্থেকে পাবে ওরা ?

হঠাৎ স্যারাম্মা তখন বলেছে : 'একটা চীনে নাম কেমন শোনাবে ?'

কেশবন নায়ার একটা দৃষ্টান্ত চাখিয়েছে : 'সিং লি ফো।'

'সিং লি ফো ?' স্যারাম্মা তার প্রথমজাত শিশু, তার সোনামণির নামটা উচ্চারণ করেছে। 'ওরে হতচ্ছাড়া, ওরে সিং লি ফো, কোথায় গেলি হতভাগা ?—সিং লি ফো ?'

'বাঃ, কেমন একটা স্টাইল আছে, না ?'

'উহু,' স্যারাম্মার মোটেই পছন্দ হয়নি। 'না, আমার ছেলের জন্য অমন নাম আমি চাই না !'

'তাহ'লে রুশী নাম। যে-কোনো একটা নামের পেছনে "স্কি" জুড়ে দাও।'

স্যারাম্মা বলেছে : 'কোন্ "স্কী" ?'

'যে-কোনো নামের সঙ্গে জুড়ে দাও।'

'স্কি ··স্কী···উঁহু ! চলবে না !'

'এইবারে পেয়েছি !—দারুণ নাম, দারুণ স্টাইল !' কেশবন নায়ারের কল্পনা বল্গাহীন ছুটে বেরিয়েছে, সে একটার পর একটা নাম ব'লে গেছে : 'ভারতবর্ষ। প্রেমপত্র। ছোটোগল্প। তুফান। সাহারা। আকাশ। চন্দ্রালোক। মুক্তো। প্রতীকীবাদ। তাল। লজেনচুষ। নবনাট্য। সাগর। চিংড়িচোখো। গদ্যকবিতা। পোখরাজ। অগ্নিশিখা। অধ্যাত্মবাদ। তারা—'

'থামো, থামো ! আমি একবার পরখ ক'রে দেখি নামগুলো : "কই রে বেটা, চিংড়িচোখো ! মায়ের সোনা চিংড়িচোখো !"···না—!'

সে অন্য নামগুলোও হেঁকে দেখেছে। 'কই রে সোনা, গদ্যকবিতা ? ওরে হতচ্ছাড়া, ছোটোগল্প ! ওরে দুষ্টু, চন্দ্রালোক !'

কেশবন নায়ার বলেছে : 'এসো, বরং কাগজের টুকরোয় নামগুলো লিখে চোখ বুঁজে তুলে নিই। দুজনে দুটো—। ডবোল নাম আজকাল খুব খাচ্ছে—দারুণ ফ্যাশন !'

স্যারাম্মা রাজি হয়েছে।

ছোটো-ছোটো কাগজের টুকরোয় নামগুলো লিখে তারা সেগুলো মিশিয়ে দিয়েছে। স্যারাম্মা তারপর একটা কাগজ তুলেছে, কেশবন নায়ার আরেকটা। কেশবন নায়ার তার কাগজটা খুলে বলেছে : 'লজেনচুষ !'

স্যারাম্মাও তার কাগজটা খুলেছে, নিচু গলায় বলেছে : 'আকাশ !'

দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়েছে তারপর।

স্যারাম্মাই সাহস ক'রে চেঁচিয়ে ডেকেছে তার ছেলেকে : 'লজেনচুষ-আকাশ ! ওরে, নচ্ছার, লজেনচুষ-আকাশ !··· আমার সোনা লজেনচুষ-আকাশ !···'

'ভুল !' কেশবন নায়ার তাদের ছেলের নামটা শুধরে দিয়েছে, গম্ভীর গলায় ডেকেছে : 'আকাশ-লজেনচুষ !'

স্যারাম্মার সেটা দারুণ মনে ধরেছে। সে একেবারে স্নেহে গ'লে গিয়ে ডেকেছে : 'আকাশ-লজেনচুষ ! ···আমার সোনা আকাশ-লজেনচুষ ! আকাশ-লজেনচুষ, কোথায় তুই ?'

'চমৎকার !' কেশবন নায়ার তার রায় দিয়েছে : 'মিস্টার আকাশ-লজেনচুষ ! শ্রীযুক্ত আকাশ-লজেনচুষ ! কমরেড আকাশ-লজেনচুষ !'

স্যারাম্মা আঁৎকে উঠেছে : 'আমার সোনামণি কি কমিউনিস্ট না কি ?'

কেশবন নায়ার হেসে উঠেছে : 'প্রশ্নের ছিরি দ্যাখো ! ও যা হ'তে চায়, তাই হোক না, ক্ষতি কী ! ওর যা খুশি, ও তা-ই হবে—'

'হ্যাঁ, আমার ছেলে যে-দলেই যোগ দিতে চাক, দেবে !'

আমার ছেলে ? স্যারাম্মার ছেলে ? কেশবন নায়ার চ'টে উঠেছে ! স্বার্থপর !

সে তাকে মনে করিয়ে দিয়েছে : 'স্যারাম্মা, এতক্ষণ ধ'রে তুমিই কেবলই বলেছো, "আমার সোনা", "আমার ছেলে"—সেটা তোমার খেয়াল আছে ? এমন স্বার্থপরতা মোটেই ভালো কথা না ! লোকে যদি তোমার কথা শোনে তবে ভাববে যে আকাশ-লজেনচুষের ওপর বুঝি আমার কোনো দাবিই নেই ! এখন থেকে তোমাকে বলতে হবে "আমাদের ছেলে"। নারী, তুমি বুঝিয়াছো ?'

স্যারাম্মাও অমনি তেলেবেগুনে জ'লে উঠেছে। 'ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছো !' তার মুখ দেখে মনে হয়েছে সে বুঝি তেতো একটা বড়ি গিলেছে। 'আমি কেবল এ-প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে চাচ্ছিলুম, ব্যস, এইমাত্র ! ভুলেও ভেবো না যে আমি তাই ব'লে তোমার বউ হ'য়ে গিয়েছি। বুঝলেন, মিস্টার কেশবন নায়ার ?'

অমনি কেশবন নায়ারের মুখ করুণভাবে ঝুলে পড়েছে। সে কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলেছে, 'কিন্তু, স্যারাম্মা, তুমি আগে কী বলছো ?'

'কী বলেছি ?'

'যে তুমি আমার বউ হবে ?'

'আর তারপর ?'

'আঃ, স্যারাম্মা, তুমি কেবল আমাকে ঠাট্টা করছো!'

'ঠাট্টা? তুমি জানো হাসিকৌতুক জীবনের কী?'

'আমি জানতে চাই না।'

'বাঃ, চমৎকার! তুমি আমার কথাটাও শুনতে চাও না! আমি তোমার কাছে নিছকই একটা "নারী"। আমি না তোমার জীবনসঙ্গিনী! আমি না তোমার জীবনের দেবী!'

'বলো, স্যারাম্মা, কী সেটা?'

'কোনটা?'

'জীবনের কাছে হাসিকৌতুক কী?'

'আঃ, ও-রকম একটা হাসি—' সে উঠে দাঁড়িয়েছে, সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে-যেতে চেঁচিয়ে বলেছে: 'জীবনেরই সুবাস!'

কৌতুক, তবে, জীবনেরই সুবাস। না, মোটেই খারাপ নয় কথাটা!

'স্যারাম্মা, কাল খুব ভোরেই আমাকে চ'লে যেতে হবে।' সন্ধে হচ্ছে তখন, কেশবন নায়ার বললে স্যারাম্মাকে, 'চূড়ান্ত-কিছু আমাকে তোমার বলার আছে, স্যারাম্মা—কোনো শেষ কথা?'

স্যারাম্মা বললে: 'এই এত ছোট্ট আয়ুটায়, জীবন যখন টগবগ ক'রে ফুটছে তারুণ্যে আর হৃদয় ভ'রে আছে প্রেমের সুগন্ধে—কতগুলো প্রশ্ন আছে।'

হঠাৎ কেশবন নায়ারের ভীষণ মন খারাপ হ'য়ে গেলো।

স্যারাম্মা ব'লে চললো: 'প্রশ্ন এক—বাবার কাছে বাড়িভাড়া সব চুকিয়ে দিয়েছো?'

'দিয়েছি!'

'চমৎকার! প্রশ্ন দুই—রেস্তোরাঁর সব টাকা শোধ দিয়েছো?'

'দিয়েছি।'

'প্রশ্ন তিন—তোমার রাহাখরচ সব আছে?'

'আছে।'

'তাহ'লে আরো-একটি ছোট্ট আনুষঙ্গিক প্রশ্ন—টাকা পেলে কোত্থেকে?'

'হাতঘড়িটা আর সোনার আংটিটা বেচে দিয়েছি।'

'শাবাশ! তাহ'লে মাননীয় কেশবন নায়ার একবার এখান থেকে চ'লে গেলে তাঁর কথা আর-কারু ভুলেও কখনো মনে পড়বে না। আমি তাঁকে আমার

যাবতীয় শুভেচ্ছা জানাই!'

এই ব'লে স্যারাম্মা হাসতে-হাসতে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেলো।

বুকে কেমন একটা কষ্ট নিয়ে কেশবন নায়ার চেঁচিয়ে ডাক দিলে: 'স্যারাম্মা!'

কে শোনে ওর ডাক? কঠিন হৃদয়েরই অন্য নাম স্ত্রীলোক। ঠিক তাই—এর মধ্যে আর-কোনো কথাই নেই!

কেশবন নায়ার চুপচাপ ব'সে রইলো একটা জ্যান্ত মড়ার মতো। রাত্রি এলো। আকাশে উঠে এলো চাঁদ। কেশবন নায়ার ব'সেই রইলো। শেষটায় যখন সে উঠে গিয়ে বাতি জ্বাললো, তার অ্যালার্ম ঘড়ি বললে রাত বাজে এগারোটা।

ভোর চারটের জন্য অ্যালার্ম লাগিয়ে দিয়ে সে দরজা বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়লো বিছানায়, অবসন্ন। শেষ রাত এটা! খিদে, তেষ্টা—তার কোনো বোধই তার নেই। কেশবন নায়ার শুয়ে রইলো, চোখ-দুটি খোলা। কিছুই ভাবছে না সে, অথচ চোখ-দুটি জলে ভ'রে উঠছে। নিষ্ঠুর জন্তু এই মেয়েরা! পুরুষরা কত ভালো! ভগবান কেন এই মেয়েদের সৃষ্টি করেছেন? এর পেছনে তাঁর কি কোনো উদ্দেশ্য ছিলো? কেশবন নায়ার প্রায় কান্নায় ফেটেই পড়ে বুঝি।

হঠাৎ বাইরে এক গলার স্বর··· নরম, গানের সুরের মতো: 'ঘুমিয়ে পড়েছো?'

ও! ঘৃণ্য! নিষ্ঠুর! পাষাণ হৃদয়ের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি!

কেশবন নায়ার চুপ ক'রে রইলো!

আবার সেই একই গলা: 'খোলো! আমি এসেছি!'

কেশবন নায়ার উঠে প'ড়ে দরজা খুলে দিলে।

স্যারাম্মা ঢুকে পড়লো ভেতরে। কেশবন নায়ার দাঁড়িয়েই রইলো দরজায়।

স্যারাম্মা খুব নরম ক'রে বললে, 'একটু কাছে এসো না। তোমাকে একটা কথা বলবো।'

কেশবন নায়ার ফিরে এসে বিছানায় বসলো। স্যারাম্মা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ বাইরে তাকিয়ে রইলো চুপচাপ। সব ঠিক আছে। সে দরজা বন্ধ ক'রে, চেয়ারটা বিছানার কাছে টেনে নিয়ে, ব'সে পড়লো। তার চুল খোলা—কনুই দুটো বিছানায় ভর দেয়া। দুই হাতের ফাঁকে তার গাল, তার স্তন দুটি ছুঁয়ে আছে জাজিম।

কেশবন নায়ারের ইচ্ছে করছিলো ঐ স্তন দুটোয় চুমো খায়। কিন্তু সে নিজেকে কঠিনভাবে শাসন ক'রে বালিশে হেলান দিলে। তার চোখ দুটো এখনও জলে ভরা।

স্যারাম্মা জিগেশ করলে: 'তুমি কাঁদছো কেন?'

কেশবন নায়ার কোনো সাড়া দিলে না। স্যারাম্মা উঠে বিছানায় বসলো, তারপর কেশবন নায়ারের দিকে ঝুঁকে হঠাৎ তার ঠোঁটে একটা সাংঘাতিক মিষ্টি চুমো খেলো!

মৃদুস্বরে ফিশফিশ ক'রে জিগেশ করলে 'আমার ওপর আর-কোনো টান নেই বুঝি তোমার?'

'আছে।' কেশবন নায়ার তাকে বুকে টেনে আনলে। আর তার কোনো কষ্ট হচ্ছে না, কিন্তু তার হাসির মধ্যে দেখা গেলো তবু তার গাল বেয়ে দরদর ক'রে চোখের জল ঝরছে।

স্যারাম্মা বললে: 'এ যেন বৃষ্টির মধ্যে রৌদ্রের একটা ঝলক—'

'তোমার মাথায় কত কী উপমা খেলে যায়—তোমাকে ভোরবেলায় সাড়ে-চারটের সময় আমার সঙ্গে যেতে হবে ট্রেনে ক'রে?'

'কোথায়?'

'আমি যেখানে যাবো।'

'যদি আসি—'

'উঃফ, স্যারাম্মা সবসময় আমাকে কেবল ঠাট্টা করে।'

'কৌতুক জীবনের কী, সেটা জানো?'

'আমি জানি। আমার মধুরার ঠোঁটে যা আছে, ইত্যাদি।'

'বেশ! আমাকেই ঠাট্টা করো তবে।' স্যারাম্মা তার ব্লাউসের ভেতর থেকে একটা পুরু খাম বার ক'রে সেটা কেশবন নায়ারের হাতে গুঁজে দিলে। 'শুধু ট্রেন ছাড়বার পরেই খামটা খুলে ভেতরে কী আছে দেখবে তুমি!'

'বেশ ভারি দেখছি!' কেশবন নায়ার বললে: 'এ কি কোনো প্রেমপত্র?'

'হ্যাঁ, প্রেমপত্রই!' স্যারাম্মা ছোট্ট ক'রে হাসলো। 'তোমাকে কিন্তু দিব্যি গেলে বলতে হবে—ট্রেন ছাড়ার আগে এটা তুমি খুলবে না!'

সে বললে: 'আমি দিব্যি করছি!'

'উঁহু, তাতে হবে না। তোমাকে এমন-একটা কিছুর নামে শপথ করতে হবে যার ওপর তোমার বিশ্বাস আছে, শ্রদ্ধা আছে।'

কেশবন নায়ার স্যারাম্মার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে শপথ করলে: 'আমার স্যারাম্মা—যার ওপর আমার অগাধ আস্থা আছে, যাকে আমি ভালোবাসি ও শ্রদ্ধা করি—আমার সেই স্যারাম্মার নামে শপথ ক'রে বলছি, শুধু ট্রেনে ওঠবার পরেই আমি খামটা খুলে দেখবো ভেতরে কী আছে!'

স্যারাম্মা উঠে প'ড়ে দরজা খুললো। 'ভোরবেলায় যাবার আগে আমাকে জাগিয়ে দিয়ো। এবার শান্তিতে একটু ঘুমোও।'

ঘড়িতে অ্যালার্ম বেজে উঠলো।

কেশবন নায়ার প্রায় তড়াক ক'রে ঘুম ভেঙে জেগে উঠলো। ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় চারটে বাজে। সে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে যাত্রার জন্য তৈরি হ'লো। জামা-কাপড় প'রে সে তার বিছানাপত্র বেঁধে নিলে। তার অন্যসবকিছুই তোরঙ্গে সাজানো হয়েছে, আগেই। বাইরে গিয়ে সে একটা গাড়ি ডাকলো, গাড়োয়ান তার জিনিশ পত্তর গাড়িতে তুলে দিলে। তারপর কেশবন নায়ার এসে তার টর্চ জেলে স্যারাম্মার ঘরের জানলা দিয়ে আলো ফেললো, নিচু গলায় ডাক দিলে: 'স্যারাম্মা! স্যারাম্মা!' কিন্তু কোথাও কারু কোনো সাড়াশব্দ নেই। সে দরজায় ধাক্কা দিলে আস্তে।

দরজাটা খুলে গেলো।

সে চারপাশে টর্চের আলো ফেললে। ভেতরে কেউ নেই!... না স্যারাম্মা, না বা তার স্যুটকেশ!... অ্যাঁ, কী ব্যাপার এটা? কোথায় যেতে পারে ও? আলো এসে পড়লো টেবিলের ওপর একটা খামের গায়ে। তার বুক ঢিপঢিপ করছে, সে খামটা খুলে পড়লো:

এ-চিঠি স্যারাম্মা লিখছে তার বাবা আর সৎমাকে: এই এত ছোট্ট আয়ুটায়, জীবন যখন টগবগ ক'রে ফুটছে তারুণ্যে আর বুক ভ'রে আছে প্রেমের সুগন্ধে —এমতো সময়ে আমি যেহেতু একটা উঁচু মাইনের কাজ পেয়েছি, আমি তাই কাজের জায়গায় চ'লে যাচ্ছি। আমি এমন একজনকেও পেয়েছি যে আমাকে কোনো পণ না-নিয়ে আমি যেমন আছি তেমনি সাজেই আমাকে বিয়ে করতে রাজি! আমি যেহেতু তাকে ভালোবাসি আর সেও আমাকে ভালোবাসে, আমি তাই চাই তোমরা যেন এ-বিষয়টা ভালো ক'রে ভেবে দ্যাখো। তোমাদের আশীর্বাদ প্রার্থনা ক'রে—

আমি
আমার বাবা ও সৎমায়ের একান্ত
স্যারাম্মা

কেশবন নায়ার চিঠিটা টেবিলে রেখে দিলে, তারপর দরজা বন্ধ ক'রে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠে বসলো। স্টেশনে এসে দ্যাখে, স্যারাম্মা দাঁড়িয়ে আছে, মুখে মৃদু হাসি।

স্যারাম্মা জিগেশ করলে: 'কী ক'রে টের পেয়েছিলে যে আমি এসেছি?'

'দৈবজ্ঞান ! পুরুষের প্রজ্ঞা !'

'পুরুষের প্রজ্ঞা ! তোমার মাথা ! আমার বাবা আর সৎমাকে যে-চিঠিটা লিখেছি সেটা চুরি ক'রে প'ড়ে নয় বুঝি ?'

'বলবো ! ওহে রমণী, সবই বলবো তোমাকে।'

কেশবন নায়ার গিয়ে দুটো টিকিট কিনে আনলে। দুজনে সব লটবহর নিয়ে উঠে পড়লো ট্রেনের কামরায়। ট্রেন সোল্লাসে একটা বাঁশি বাজিয়ে ছেড়ে দিলো। তারা কাঁধে কাঁধ দিয়ে ব'সে আছে চুপচাপ। কামরাটা ফাঁকা হবার আগে তিন-তিনটে স্টেশনে থামলো ট্রেন।

ট্রেন আরেকটা স্টেশনে থামলো। কেশবন নায়ার চাওলাকে দু-পেয়ালা চা দিতে বললে। স্যারাম্মা বললে তারা দুজনেই কফি খাবে এখন। কেশবন নায়ার বললে তারা দুজনে এখন চা খাবে। দুজনেই চ'টে আগুন। শেষটায় কেশবন নায়ার খেলে এক গেলাশ কফি আর স্যারাম্মা চুমুক দিলে একটা চায়ের পেয়ালায়। সূর্য উঠলো। ট্রেন আস্তে-আস্তে একটা ব্রিজ পেরুলো, তার তলায় ব'য়ে যাচ্ছে একটা সোনারং ছোট্ট নদী। তারা দুজনেই তাদের একটু আগের চা আর কফি নিয়ে ঝগড়াটা ভুলে গেলো। অবিমিশ্র আনন্দের সঙ্গে কেশবন নায়ার নিচু গলায় স্যারাম্মাকে বললে : 'আমার মধুরা, আমার সুগন্ধ, আমার সোনা !'

স্যারাম্মা কাছে ঘেঁষে এলো, জিগেশ করলে : 'কী বলছে আমার আকাশ-লজেনচুষের বাবা !'

'আমার সোনার চাঁদের আলো !'

স্যারাম্মা একটা চিমটি কাটলো কেশবন নায়ারকে। কেশবন নায়ার বললে : 'মেরে তোমায় পাট ক'রে দেবো।'

স্যারাম্মার দু-চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এলো। মেয়ে তো, চোখের জলের আর অভাব কোথায় ? সে অকারণেই কাঁদতে লাগলো। তা দেখে পুরুষ কেশবন নায়ার খুব কষ্ট পেলে। সে তার চোখের পাতায় চুমু খেলে।

'না !' স্যারাম্মা বললে, 'তুমি আমাকে ছোঁবে না !'

'কেন না ?'

'তোমার জন্য অত-কিছু ত্যাগ করার পরও তুমি কি না আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছো !'

'কেমন ব্যবহার ? তাছাড়া তোমার ত্যাগগুলো কী শুনি স্যারাম্মা ?'

'আমার প্রিয় বাবা ও সৎমাকে ছেড়ে আমি কি তোমার সঙ্গে চ'লে যাচ্ছি না ?'

'তুমি আমার সঙ্গে আসছো। তো কী?'

'একটু কফি খাও, অন্তত আমার খাতিরে··· অন্তত একটু, একটুখানি ত্যাগ স্বীকার করো···আর এখন কি না তুমি বলছো আমায় মেরে পাট ক'রে দেবে!'

'ওহে ত্যাগের প্রতিমা! ওহে নারী, আকাশ-লজ্ঞেনচুষের জননী!'

'বলুন, আমার জীবনদেবতা!'

'আজই আমরা রেজিস্ট্রারের কাছে গিয়ে বিয়ে ক'রে আসবো। লোকের জানা উচিত। তোমার তা মনে হয় না?'

স্যারাম্মা কিছু বললে না।

কেশবন নায়ার তার উরুতে চিমটি কেটে বললে 'তোমার তা মনে হয় না?

'বললুম না হঁ্যা? মৌনং সম্মতিলক্ষণম্।'

'শুধু তিনটে ব্যাপারে তোমাব সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে।'

'শুধু তিনটে তুচ্ছ নগণ্য ব্যাপারে?'

'হ্যাঁ। খাওয়া-দাওয়া, জামাকাপড় আর ধর্মবিশ্বাস।'

'তবে কি আমাদের বাড়িতে দুটো রান্নাঘব থাকবে?'

'একটা, ছোট্ট, একরত্তি রান্নাঘর!'

'আমাকে কি দু-রকম খাবার রান্না কবতে হবে?'

'শুধু একরকম।'

'কার ইচ্ছে মতো?'

'আমার রান্নাঘরেব কর্ত্রীঠাকরুনের ইচ্ছেমতো।'

স্যারাম্মা মৃদু হাসলো। 'সকালে আমি শুধু কফি বানাবো!'

'ওঃ··· ঠিক আছে, পরে আমি বাইবে গিয়ে চা খেয়ে আসবো।'

'সে আমি হ'তে দেবো না। তোমার পুরো মাইনেটা—বুঝলে তো—সবটাই আমাকে দিতে হবে—আমার হাতে থাকবে সব, শুধু আমার!'

'ওহে মেয়েমানুষ, তাহ'লে আমি চা খাবো কী ক'রে?'

'চা ছেড়ে দাও! যে-মেয়েমানুষটা এত সব ছেড়ে দিয়ে এলো তার দিকে তাকিয়ে একটু শেখো!'

'আমি কি তোমার হুকুমে মাথায় ভর দিয়ে দাঁড়াইনি?'

'হুঁ···সে নাকি আবার বাহাদুরির ব্যাপার! প্রেমের জন্য কেউ-কেউ রাজ্য সিংহাসনও ছেড়ে দেয়নি কি? প্রেমের জন্যে লোকে ড্র্যাগনের সঙ্গেও লড়াই করেনি কি?'

'ওহে রমণীকুলরত্ন ! ওহে চাঁদের আলো ! তুমি যদি চাও তবে আমি আরাম-কেদারায় ব'সে দশ-দশটা সাম্রাজ্যও ছেড়ে দিতে পারি ! অথবা হাজারটা ড্র্যাগনের সঙ্গেও লড়তে পারি ! কিন্তু একবার প্রেমের খাতিরে নিজের মাথায় ভর দিয়ে মুণ্ডু তলায় পা উপরে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা ক'রে দ্যাখো ! ওহে মেয়েমানুষ ! প্রেমের জন্য এমন কীর্তি কে কবে স্থাপন করেছে ? কেশবন নায়ারই শুধু তার স্যারাম্মার সামনে মাথায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে। ইতিহাসে তার আর কোনো সমান্তর নেই ! এর চেয়ে বড়ো কোনো ত্যাগ কোথাও হ'তে পারে ?'

'ওহে আকাশ-লজেনচুষের বাবা !'

'কী বলিতে চাহো, নারী ?'

'বলছি।'

ব'লে সে ঝুঁকে প'ড়ে তার পায়ের ধুলো নিলে। কেশবন নায়ার তাকে জোর ক'রে টেনে তুলে বুকে টেনে নিলে। ট্রেন চলেছে দুলকি তালে। কে বাইরে থেকে আর উঁকি দিয়ে দেখছে ওদের ?

স্যারাম্মা হঠাৎ কেশবন নায়ারের পকেটে তার হাত ঢুকিয়ে দিলে।

'কী খুঁজছো, গন্ধসুমধুর চাঁদের আলো ?'

'যে-খামটা তোমাকে দিয়েছিলুম !'

'প্রেমপত্রটা ! আরে ! সেটাই পড়তে কি না ভুলে গিয়েছি !'

কেশবন নায়ার খামটা খুললো। ভেতর থেকে কাগজগুলো বার ক'রেই হাঁ হ'য়ে গেলো—নোট, কারেন্সি নোট, এক বাণ্ডিল কারেন্সি নোট !

এক-এক ক'রে গুনলো সে। একহাজার নিরেনব্বুই টাকা !

'শোনো—ঐ দিয়ে তোমায় একটা হাতঘড়ি আর একটা সোনার আংটি কিনতে হবে। বুঝলে ?'

টাকা দেখে খুশি হ'লেও কেশবন নায়ার প্রেমপত্রটার জন্য উৎকণ্ঠিত হ'য়ে পড়েছিলো : সে জিগেশ করলে : 'আর ওটা কোথায় ?'

'ওটা আবার কী ?'

'প্রেমপত্রটা ?'

'পড়তে চাও বুঝি ? খুব ইচ্ছে করছে ?'

'একবার শুধু দেখতে চাই, আমার সোনার টুকরো !'

'তাহ'লে দ্যাখো !' সে একটু লাজুকভাবে সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো, তারপর সরাসরি কেশবন নায়ারের চোখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললে : 'দেখতে পাচ্ছো

না তুমি? আমিই প্রেমপত্র। তরুণ, তরুণী—সে-ই তো প্রেমের চিঠি!'

তক্ষুনি কথাটা কেশবন নায়ারের দারুণ মনে ধ'রে গেলো। 'তুমি আর আমি! চমৎকার! কিন্তু ওটা কই? দেখাও?'

স্যারাম্মা তার ব্লাউসের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে চিলতে কাগজ বার ক'রে আনলে, দিনের পর দিন ঘাম লেগে-লেগে কাগজটা বিবর্ণ হ'য়ে গেছে, তারপর সেটা সে কেশবন নায়ারের হাতে তুলে দিলে। সে ভাঁজ খুলে হাত বুলিয়ে সমান ক'রে আলোয় তুলে ধরলে কাগজটা। একটা চিঠি—আগেই সে এটা দেখেছে, কবে কোন অতীতে অনাদি কালে লেখা চিঠি। সে সেটা পড়তে শুরু করবামাত্র স্যারাম্মা তার গলা জড়িয়ে ধ'রে চুমু খেলে। বললে: 'এই এত ছোট্ট আয়ুটায় জীবন যখন টগবগ ক'রে ফুটছে তারুণ্যে তার বুক ভ'রে আছে প্রেমের সুগন্ধে—তোমাকে বলিনি আমি, আগেই? আমরাই প্রেমপত্র!'

'নারী, বুঝিলাম সবকিছু। সব টের পেয়ে গেছি। এবার আমার কান দুটো ছেড়ে দাও। চিঠিটা শুনতে দাও আমায়।'

'না, তুমি শুনবে না।' সে তাকে বুকে টেনে নিয়ে গালে মুখে ঘাড়ে চুমুর পর চুমু খেতে লাগলো। ট্রেন ফুর্তিতে বাঁশি বাজালো, আর জোর গতিতে এগিয়ে চললো, স্যারাম্মা তার দুই স্তনের মধ্যে থেকে যে-কাগজটা বার ক'রে এনেছিলো সেটা পড়তে চেষ্টা ক'রে বিস্তর বেগ পেতে হ'লো কেশবন নায়ারকে। কিন্তু তবু সে চেঁচিয়ে পড়লো থেমে-থেমে:

প্রিয়তমা স্যারাম্মা

কেমন ক'রে আমার প্রিয় কমরেড কাটাচ্ছে তার এই এত ছোট্ট পরমায়ু যখন জীবন টগবগ ক'রে ফুটছে তারুণ্যে আর বুক ভ'রে আছে প্রেমের সুগন্ধে?

আমার কথা যদি ধরো—আমার জীবন কাটে পলে-পলে স্যারাম্মারই প্রেমে। আর তোমার, স্যারাম্মা?

খুব ভালো ক'রে এটা ভেবে দেখবার জন্য মিনতি করছি তোমায়, আমাকে একটা মধুর, সদয় জবাব দিয়ে কৃতার্থ কোরো।

স্যারাম্মারই একান্ত
কেশবন নায়ার

অনুবাদ: মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গুড্ডির নানী
ইস্মৎ চুগতাই

খোদাই মালুম তার আসল নাম কী ছিল। অন্তত তাকে কেউ কখনো সেই নামে ডাকেনি। নাকভর্তি সর্দি নিয়ে যে ছোট্ট মেয়েটা অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়াত, তাকে সবাই বলত বাফতানের লেড়কি। তার পর সে হয়ে গেল বসিরের বিবি, তারও পরে বিসমিল্লার আম্মা। আর যখন বাচ্চা বিয়োতে গিয়ে বাপ-মা-মরা গুড্ডিকে রেখে মরল, সেই থেকে সে 'গুড্ডির নানী'। আর মরণ অবধি ওই 'গুড্ডির নানী'ই সে থেকে গেল।

এমন ফাঁক-ফিকির নেই, যা বাঁচবার তাগিদে নানী জীবনের কোনো না কোনো সময় ধরেনি। যে-বয়সে আর পাঁচটা বাচ্চার সঙ্গে হেসে-খেলে বেড়ানোর কথা, ঠিক সেই বয়সেই সে ঢুকে পড়েছে রইস আদমিদের বাড়ি ফাইফরমাশ খাটার কাজে, বদলে জুটেছে দু-বেলার খাবার আর কিছু ঝরতি-পড়তি জামাকাপড়। কাকে যে সত্যিই টুকিটাকি ফাইফরমাশ বলে, সে শুধু তারাই জানে, যারা—যে-বয়সে তাদের অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হেসেখেলে বেড়াবার কথা—সে-বয়স থেকে শুধু সে-কাজেই হাত পাকিয়েছে। এই টুকিটাকি ফরমায়েশের চৌহদ্দির মধ্যে পড়ে, বিচ্ছিরি যত কাজ—বাচ্চার ঝুমঝুমি বাজানো থেকে খোদ মালিকের মাথা টেপা পর্যন্ত। বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে সে একটু-আধটু রসুই পাকাতে শিখল আর জীবনের কয়েকটা বছরই পার করে দিল রাঁধুনি হয়ে। কিন্তু যখন তার নজর খারাপ হতে শুরু করল, মসুর ডালে টিকটিকির ফোড়ন আর রুটিতে মাছির ময়ান দিতে লাগল সে, তখন রসুইয়ের কাজে তাকে ইস্তফা দিতে হলো। তার পর থেকে শুধু যা তার এলেমে কুলোত, তা হলো শুধু অন্যের কেচ্ছা গাওয়া আর চুগলি কাটা। অবিশ্যি এ-কাজেও মোটামুটি মুনাফা মেলে। সব মহল্লাতেই কোঁদল-কাজিয়া লেগেই থাকে; এক দলের খবর অন্য শিবিরে বয়ে বেড়ানোর এলেম থাকলে ভালো খাতিরই মেলে। তবে এ এমন এক খেলা যার আয়ু সামান্যই। শিগগির দু-দলই বুঝতে পারে, নানী কোনো তরফেরই লোক নয় আর চুগলি কাটার জন্য লোকে তাকে বলতে থাকে দাগাবাজ। নানী যখন টের পেলে যে এ-কাজে আর ভবিষ্যৎ নেই, সে-সব শেষ, আর দিন গুজরানের সেরা নাফার উপায়টাই বেছে নেয়—পুরোদস্তুর এক চৌকশ ভিখিরি বনে গেল সে।

খাবার সময় নানী শুধু নাকের বাঁশি ফুলিয়েই বুঝতে পারত, কোন বাড়িতে কী রান্না চড়েছে। আর যে-গন্ধটা তার মনে ধরত শিকারী কুকুরের মতো শুঁকে-শুঁকে ঠিক বের করে ফেলত সেই বাড়িটা, হনহন করে ছুটত তার হদিশে, গিয়ে দিব্যি হাজির হতো যেখানে তার সব চেয়ে পছন্দের রান্নাটা চড়েছে।

'আরভি দিয়ে গোস্ত পাকাচ্ছ, বিবিজি ?' এমন ভাবে সে জিগেস করত, যেন জবাবটায় তার কোনো আগ্রহই নেই।

'না, নানী। আজকাল আরভি বেজায় শক্ত, তা দিয়ে আর গোস্ত পাকানো যায় না। আলু দিয়েই করছি।'

'আলু দিয়ে! কী খাশা খোশবু! বিসমিল্লার বাবা, আহা, আল্লা তাকে শান্তিতে রাখুন, বড়ো ভালোবাসত। জান, রোজই বলত, আজ তবে আলু দিয়ে গোস্ত হোক। আর এখন—' নানী একটা বড়োসড়ো নিশ্বাস ছাড়ে, 'কদ্দিন যে হয়ে গেল আলু-গোস্ত চোখেই দেখি না।' বলতে-বলতে হঠাৎ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠত নানী, 'তা হ্যাঁ বিবিজি, মাংসে ধনেপাতা দিয়েছ তো ?'

'না, নানী। আমাদের ধনেগাছগুলো সব গেছে। ওই বদমায়েশ ভিস্তিওলার কুকুরটা বাগানে ঢুকে গাছগুলোর ওপর এমন গড়াগড়ি দিয়েছে যে গাছগুলো বিলকুল খতম।'

'আহা, গোস্তে ধনেপাতা দিলে তার সোয়াদই আলাদা! তা হাকিম সাহেবের বাগানে তো অনেক রয়েছে, বিবিজি ?'

'তাতে আমাব কোনো ফায়দা নেই, নানী। কাল হাকিমের লেড়কা আমার সাবান মিঞার ঘুড়ি কেটে দিয়েছে। আমি বলেছি, ও-কালামুখ যদি ফের নজরে পড়ে তো তাকে দেখে নেব।'

'আহা, সে কী কথা! আমি কি বলেছি যে তুমি নিজে ধনেপাতা আনতে যাবে ?' বোরখায় নিজেকে ভালো করে ঢেকে, খড়মের খট-খট করতে-করতে, নানী হাকিম সাহেবের বাগানের দিকে চলে যায়। রোদ্দুরে বসবার অছিলায় সে বাগানে ঢুকে পড়ে আর তারপর ধনেপাতা ঝোপের গা ঘেঁষে বসে। খুব স্বাভাবিক ভাবেই একটা ধনেপাতা তুলে বুড়ো আঙুলে কচলে নাকে তার গন্ধ নেয়। হাকিমজির ছেলের দুলহান যেই বাগান ছেড়ে ঘরের দিকে ফেরে, চকিতে একমুঠো পাতা তুলে নিয়ে নানী পালায়। আর সত্যিই তো, ধনেপাতা এনে দেওয়ার পরে কি আর তাকে এক কামড় গোস্ত না-দিলে চলে ?

হাত-সাফাইয়ের এই জবর এলেমের জন্য মহল্লায় নানীর বেশ নামডাকই ছিল।

সে ধারেকাছে থাকলে খাবার-দাবারের ওপর কড়া নজর রাখতে হতো। কড়াই তুলে বাচ্চাদের পুরো দুধটা দু-চুমুকে শেষ করে দেওয়া, হাতের পাতায় চিনির ডেলা নিয়ে নিমেষে তা মুখে ফেলা, এমনকি একদলা গুড় মুখে নিয়ে রোদে পিঠ দিয়ে আয়েস করে চোষা নানীর পক্ষে ছিল নেহাতই স্বাভাবিক। তার পোশাকটাও ছিল এ-সব হাত সাফাইয়ের পক্ষে জুতসই, তার কোমরবন্ধটাকেও চমৎকার কাজে লাগাত নানী। কখনো গোটা দুই চাপাটি কি দু-টুকরো সুপুরি চুরি করে গুঁজে রাখে কোমরের পট্টিতে, মোটা কুর্তাটার জন্য কিছুই বাইরে থেকে ধরা পড়ে না। চুরির মাল নিয়ে নানা তার স্বভাবসিদ্ধ গতিতেই খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে ঘুরে বেড়াত। এ-সব কথা জানত সবাই, তবে কিছু বলবার সাহস কিন্তু কারোরই ছিল না; কারণ, বুড়ো হলে কী হয়, নানীর হাত চলত বিজলির ঝিলিকের মতো আর বেকায়দায় পড়লে, মুখে যা থাকে, তা পুরোপুরি গিলে ফেলতে তার বিন্দুমাত্র অসুবিধে হতো না। তার ওপর নামমাত্র সন্দেহ করলেই নানী এমন হুলুস্থুল বাধাত যে লোকজন পালাবার পথ পেত না। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে যে-কোনোরকম কিরা কাটতে তার আটকাত না, এমনকি কোরানশরীফের নামে হলফ করার ভয়ও সে দেখাত! কোরানশরীফের নামে মিথ্যে শপথে কে আর তাকে বাধ্য করতে সাহস পাবে?

শুধু চুগলি কাটা আর চুরি-জোচ্চুরিই নয়, মিছে কথা বলাতেও নানী ছিল পয়লা দরের। তার সব চেয়ে বড়ো মিথ্যে ছিল তার বোরখাটা, সবসময়ই যা তার পরনে থাকত, অথচ কেন যে নানী সেটা পরত, তা বোঝা দায়! একসময় বোরখার একটা ওড়না ছিল বটে। কিন্তু পাড়ার বুড়োগুলো যখন একে-একে মরতে লাগল, অথবা যারা রইল, তাদেরও চোখে পড়ল ছানি, ওড়নাটাকে নানী বিদায় দিল। ওড়নাটা গেলেও জালির কাজ-করা সেই বাহারে টুপিটা ছাড়া নানীকে কেউ কখনও দেখেনি, যেন ওটা তার মাথার খুলির সঙ্গেই প্রায় এক হয়ে গিয়েছে। বোরখাটা প্রায় সময়ই খোলা থাকত, এমনকি নানী যখন কোনো ভিতরের জামা ছাড়া একটা ফুরফুরে গা-দেখানো কুর্তা পরে ঘুরত, তখনো বোরখাটা বাদশার পোশাকের মতো পিছনে ঝুলত। বোরখাটা যে শুধু নানীর মাথা ঢেকে রাখার উপায় ছিল, তাই নয়, ওটাকে সে আজব আচানক যে-কোনো কাজেই ব্যবহার করত। কখনো তা নানীর বিছানার চাদর: আবার তাকে গুটিয়ে-গুটিয়ে তৈরি হতো বালিশ। কচিৎ কখনো নানী যদি-বা গোসল করত, ওই বোরখাটাই নিত গামছার ভূমিকা। দিনে পাঁচ-পাঁচবার নামাজ পড়বার সময় ওটাই আবার নানীর জায়নামাজ। রাস্তার

কুকুরগুলো যখন দাঁত বের করে তেড়ে আসত নানীকে, বোরখাই ছিল তার নিজেকে বাঁচাবার ঢাল। নানীর পায়ের গুলের কাছে কোনো কুকুর এগিয়ে এলে, বোরখার ভারি ভাঁজের হিসহিস শব্দ হাজির হতো কুকুরের মুখের কাছে। তো, তার এই বোরখাটাকে নানী বেজায় ভালোবাসত। অবসর সময়ে বসে সে দারুণ দুঃখে কেবল বিলাপ করত—বোরখাটা বড্ড পুরনো হয়ে যাচ্ছে, আরো যাতে ছিঁড়ে ফেঁসে না-যায়, সেজন্য হাতের কাছে যে-কাপড়ের ফালি পেত তাই দিয়েই তালি দিত—একদিন যে এ আর থাকবে না, এই ভাবনায় সে শিউরে উঠত। আরেকটা বোরখা বানাতে কোথা থেকে যে আট গজ শাদা কাপড় সে জোটাবে! তার নসিব যদি নেহাত পয়মন্ত হয় তবেই না তার কাফনের কাপড় জুটবে!

নানীর কোনো পাকাপাকি আস্তানা ছিল না। খাঁটি সেপাইয়েব মতো সব সময়ই সে আছে পায়ের ওপর; আজ এ-বাড়ির বারান্দা থেকে কাল সে-বাড়ির পিছন দিকের উঠোন। মানানসই কোনো জায়গা পেলেই নানা সেখানে শিবির পাতে, আব জায়গার মালিক তাড়িয়ে দিলে আবার নতুন আস্তানার খোঁজে ছোটে। বোরখার আধখানা মাটিতে পেতে, বাকি আধখানায় নিজেকে ঢেকে সে যেখানে-সেখানে শুয়ে পড়ে।

কিন্তু বোবখাটা নিয়ে তার যত দুশ্চিন্তা তার চেয়েও বেশি দুশ্চিন্তা তার সবেধন নাতনি গুড্‌ডিকে নিয়ে। সদ্য ডিম-ভেঙে বেরোনো ছানাকে যেমন করে কোনো বুড়ি মুরগি তার ডানার আড়ালে ঢেকে রাখে, গুড্‌ডিকেও সেইভাবেই আগলে রাখত নানী—কিছুতেই তাকে চোখের আড়াল হতে দিত না। তবে একটা সময় এল, যখন নানীর আর টৈ-টৈ করার উপায় রইল না; যখন মহল্লার সবাই নানীর ব্যাপারটা টের পেয়ে গেল, তখন দূর থেকে তার খড়মের খটখট শোনা-মাত্র তারা তটস্থ হয়ে যেত আর অমনি প্রতিরোধ-ব্যবস্থা বিলকুল তৈরি · তারপর নানীর যাবতীয় ইশারা-ইঙ্গিত মাঠেই মারা যায়—কারোরই কানে পৌঁছয় না। কাজেকাজেই গুড্‌ডিকে তার বংশানুক্রমিক কাজে জুতে দেওয়া ছাড়া নানীর আর-কোনো উপায় থাকে না: রইস আদমিদের বাড়ি টুকিটাকি ফাইফরমাশ খাটার কাজেই সে বহাল হয়ে যায়। নানী ভেবেছিল বিস্তর, আর শেষটায় ডেপুটি সাহেবের বাড়িতে খাওয়া-পরা আর দেড় টাকা মাইনের চাকরিতে সে গুড্‌ডিকে ঢুকিয়ে দেয়। নানী তাই বলে গুড্‌ডিকে ছেড়ে কখনোই খুব দূরে যেত না, ছায়ার মতো লেপটে থাকত তার সঙ্গে। এক মিনিট সে চোখের আড়াল হলেই হুলুস্থুল বাধিয়ে বসত।

কিন্তু একজোড়া বুড়ো হাত কী করেই বা পারে নসিবের লেখা খণ্ডাতে? তখন দুপুর বেলা। ডেপুটি সাহেবের বিবি গেছেন ভায়ের বাড়ি—ভাইজানের মেয়ের সঙ্গে নিজের ছেলের শাদি সম্ভব কি না, তাই নিয়ে আলোচনা করতে। বাগানের পাশেই গাছের ছায়ায় নানী তার দিবানিদ্রাটুকু সেরে নিচ্ছে। মালিক ও মিঞাও ঘুমোচ্ছেন ভেজা খশখশ টাঙানো ঠাণ্ডা ঘরে। আর গুড্ডি, যার তখন পাখার দড়ি টানার কথা, সে ঢুলে পড়েছে দড়ি হাতেই। পাখা থেমে গেল, মালিক ও মিঞার ঘুম ভেঙে গেল, ভিতরের জানোয়ারটা চেতিয়ে উঠল, আর গুড্ডির নসিবে ঢেড়া পড়ে গেল।

লোকে বলে, জরা ঠেকাবার নানান উপায় বলতে গিয়ে মালিশ দাওয়াই ছাড়াও হাকিম-বদ্যিরা আর একটা পথ বাতলাত, তা হলো কোনো ছানা মুরগির সুরুয়া—তা ন-বছর বয়সী গুড্ডি তো নিজেই একটা মুরগিছানা বৈ কিছু নয়।

ঘুম ভেঙে উঠে নানী দেখল, গুড্ডি হাওয়া। সারা তল্লাট ঢুঁড়ে বেড়ালো নানী, কিন্তু গুড্ডির কোনো হদিশ নেই কোথাও। রাত্তিরে কাহিল হয়ে নানী আস্তানায় ফিরে দেখে, ঐ তো গুড্ডি এক কোণে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে, জখম পাখির মতো। নানী কিছু বলবে কি, ভয়ে বেহাল হয়ে আছে; তবু নিজের বেজুত ঢাকতে সে জোর করেই খিস্তি শুরু করে দিলে, 'বলি, হ্যাঁরে হতভাগী খানকি, তুই এখানে এসে বসে আছিস? আর এদিকে আমি সারা পাড়া তোকে খুঁজে হয়রান—পা দুটো ফুলে ঢোল! দাঁড়া, বলছি তোর মালিককে, মেরে তক্তা করবে যখন, বুঝবি।'

সেদিন সত্যিই কী ঘটেছিল, তা কিন্তু খুব বেশিদিন গুড্ডি নানীর কাছে লুকিয়ে রাখতে পারল না, আর সব সত্যিটা জেনে ফেলে নানী কপাল ঠোকে আর ডুকরে কাঁদে। পাশের বাড়ির মহিলা তো সব শুনে ভয়ে আঁতকে মাথায় হাত দিলে। কাজটা যদি ডেপুটি সাহেবের লেড়কা করত তা হলেও অন্তত কিছু-একটা বলা যেত। কিন্তু ডেপুটি সাহেব, তিনি মহল্লার মাতব্বর, নাতি-নাতনি তিন-তিনজন তাঁর মুত্তাকি আদমি, রোজ পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়েন, তার ওপর আবার ক-দিন আগেই এলাকার মসজিদে গালচে আর সোরাহী কিনে দিয়েছেন—তাঁর নামে এমন কথা তুলবে কে?

কাজেই নানী—হামেশা যাকে অন্যের দয়ায় কাটাতে হয়—মনের দুঃখ মনেই চেপে রেখে গুড্ডির গায়ে সেঁক-তাপ দিল, মেঠাই দিয়ে ভোলাতে চাইল তাকে আর কষ্টটা যেমন করে পারে সয়ে যাবার চেষ্টা করল। গুড্ডি দিন-দুই বিছানায়

শুয়ে কাটাল, তার পরেই ফের হেঁটে চলে বেড়াতে লাগল। ক-রোজ পরেই দেখা গেল সে সব কিছুই বেমালুম ভুলে গিয়েছে।

মহল্লার বিবি আওরাতরা অবশ্য ভোলেনি। তারা চুপি-চুপি গুড্‌ডিকে ডেকে পাঠাত, ব্যাপারটা সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিত।

'না-না, নানী আমায় বেদম ঠ্যাঙাবে,' গুড্‌ডি পাশ কাটাতে চাইত।

'এই যে, নে না, এই রেশমি চুড়িগুলো, তোর নানী কিছু আন্দাজ পাবে না'— কৌতূহলী বিবিসাহেবানরা তাকে তোয়াজ করত।

'কী হয়েছিল রে? কী করে হয়েছিল?' তারা সব খুটিনাটি জানতে চাইত, আর গুড্‌ডি—একে বেজায় ছেলেমানুষ, তায় সংসারের হালচাল কিছুই জানে না, এ-সবের মানে কী, তা সে আদপেই বুঝতে পারত না; যতটা পারে, গুছিয়েই সব বলে দিত তাদের, আর তারা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে খুশিতে হেসে উঠত।

গুড্‌ডি ভুলে যেতে পারে, কিন্তু প্রকৃতি পারে না। আপনি যদি কোনো ফুলের কুঁড়িকে তুলে নিয়ে তাকে পুরোপুরি ফুটিয়ে তুলতে চান, তার পাপড়ি সব ঝরে যায়, বাকি থাকে শুধু তার ডাঁটিটা। কে জানে কত নিষ্ফল পাপড়ি ঝরিয়েছিল গুড্‌ডির মুখখানা। তার মুখ রপ্ত করে নিলে এক পাকা বেশরম ভাব—যা তার বয়স, তা থেকে অনেক বড়ো দেখাল তাকে। গুড্‌ডি শিশু থেকে কিশোরী হয়নি, এক লাফে হয়ে উঠেছে দস্তুরমতো নারী, আর প্রকৃতির কুশলী অভ্যস্ত হাতে গড়া সাবলীল সহজ কোনো নারী নয়, বরং যেন এমন-এক চেহারা, যাকে কোনো জিন এসে তার মস্ত দু-গজ লম্বা পায়ে মাড়িয়ে দিয়ে গেছে—হোঁৎকা, মোটা, ফাঁপা-ফোলা, যেন এমন একটা মাটির পুতুল, শুকিয়ে শক্ত হবার আগেই যার ওপর কুমোর হাঁটু চেপে বসে পড়েছিল।

কোনো তেলচিটে নোংরা ন্যাকড়ায় কেউ যদি নাক ঝাড়ে, কেউ তাতে খুব কিছু মনে করে না। ছোকরারা খেলার ছলে খোলা রাস্তায় গুড্‌ডিকে চিমটি কাটে, মেঠাই খাওয়ায়, গুড্‌ডির চোখ দুটো বেলাহাজ আলোয় নাচতে শুরু করে দেয়… এখন আর নানী তাকে মেঠাই দিয়ে ভোলায় না; বরং তাকে ঠেঙিয়ে গায়ে কালশিটে ফেলে দেয়। কিন্তু তেলচিটে ন্যাকড়া থেকে আপনি ধুলো ঝাড়বেন কী করে? গুড্‌ডি যেন একটা রবারের বল: লাথি কষান, দেখবেন আবার লাফিয়ে আপনার কাছে ফিরে এসেছে।

কয়েক বছরের মধ্যেই গুড্‌ডির বেলেল্লাপনা তাকে গোটা মহল্লার আপদ বানিয়ে তুলল। গুজব ছড়াল, ডেপুটি সাহেব তাঁর ছেলের সঙ্গে গুড্‌ডিকে নিয়ে

ঝগড়া করেন··· তারপর রটে গেল পালকিওলা রাজভা খোদ মোল্লাহ্‌কে বেধড়ক ঠেঙিয়েছে ·· তারপর খবর এল কুস্তিগির সিদ্দিকের ভাগ্নের সঙ্গে হররোজ গুড্‌ডির লটর-পটর চলে। রোজ গুড্‌ডির নাক কাটা যাওয়ার দাখিল হয়, আর অলিতে-গলিতে তাকে নিয়ে মারপিট হট্টগোল চলে।

গুড্‌ডিকে ধরে রাখার পক্ষে জায়গাটা বড্ড বেশি গরম হয়ে উঠল। তার পক্ষে কোথাও নিশ্চিন্তে এক পা-ও যাওয়ার উপায় রইল না। গুড্‌ডির তাজা বয়সের জেল্লা আর সিদ্দিকের ভাগ্নেটির কাঁচা বয়সের তেজ দুয়ে মিলে গোটা মহল্লার জীবনটাই অতিষ্ঠ করে তুলল। লোকে বলে দিল্লি বোম্বাইয়ের মতো জায়গায় এমন মালের নাকি বেজায় কদর। গুড্‌ডিরা দু-জনে হয়তো তেমন কোথাওই পালিয়ে গিয়েছিল।

গুড্‌ডি যেদিন পালায়, নানীর মনে আদপেই কোনো সন্দেহ আসেনি যে কী ঘটতে যাচ্ছে। ক-রোজ ধরেই বেচারা অস্বাভাবিক চুপচাপ ছিল, এমনকি নানীকেও কোনো গালমন্দ করেনি, বরং অনেকটা সময় একা-একা চুপচাপ বসে থাকত, কোনদিকে যে চেয়ে আছে, বোঝা যেত না।

'আয় গুড্‌ডি, রাতের খাওয়াটা সেরে নে,' নানী বলত।

'আমার খিদে নেই, নানী।'

'দেরি হয়ে যাচ্ছে, গুড্‌ডি, যা, শো গে তবে।'

'আমার ঘুম পায়নি, নানী।'

সে-রাতে গুড্‌ডি গিয়ে নানীর পা টিপতে বসে, 'নানী, দ্যাখো তো, আমি নামাজের শুভানাক আল্লাহ্‌উম্মা বলছি, আমার ঠিক মনে আছে কি না।' এক মুহূর্ত না-ভেবে গুড্‌ডি পুরোটা বলে যায়। নানী শোনে, 'ঠিক আছে। তুই এখন যা। এবার তোর ঘুমিয়ে পড়া উচিত।' নানী পাশ ফিরে শোয়, ঘুমোতে চেষ্টা করে।

একটু পরেই সে উঠোনে গুড্‌ডির চলাফেরার আওয়াজ পায়। 'হারামজাদী এখন আবার কী করতে উঠল?' নানী বিজবিজ করে, 'কোন বেজন্মাকে ঘরে নিয়ে এল? বেটি খানকি! আজকাল এমনকি পিছনের উঠোনটাও কাজে লাগায়।' কিন্তু আধবোজা চোখে উঁকি মেরে উঠোনের দিকে তাকিয়ে নানী আঁৎকে ওঠে। গুড্‌ডি ঈশা পড়ছে, দিনের শেষ ওক্তের নামাজ। আর পরদিন সকালে সে উধাও।

কাঁহা-কাঁহা দূর-দূর মুলুক থেকে লোকে যখন আমাদের এখানে ফিরত, মাঝে-মধ্যে তারা গুড্‌ডির খবর আনত। একজন বললে সে কোন-এক মস্ত খান নাকি তাকে খাশ কসবি করে রেখেছে, গাড়িঘোড়া, গা-ভরা গয়না। আরেকজন জানালে

যে গুড্‌ডিকে সে দেখেছে ডায়মণ্ড মার্কেটে, অর্থাৎ হীরামণ্ডিতে, অন্যরা বলত তাকে দেখা গেছে ফরাস রোডে বা সোনাগাছিতে।

কিন্তু নানীর গল্পটা ছিল, হঠাৎ কলেরা হয়ে কেউ কিছু জানার আগেই গুড্‌ডি রাতারাতি মারা গেছে।

গুড্‌ডির জন্য শোকের সময়টা কেটে যেতেই নানীর মনটা কেমন ছন্নছাড়া হয়ে গেল। পাশ দিয়ে যেতে-যেতে রাস্তায় ঘাটে লোকজন মশকরা করত, তাকে নিয়ে রগড় তামাশা করত।

'কী নানী, শাদি করছ না কেন?'

নানী খেপে উঠত, 'কাকে করব রে? তোর মিনসেকে?'

'মোল্লাসাহেবকে শাদি কর না কেন? আল্লার দোহাই, বিশ্বাস কর সে তোমার জন্য বেহুঁশ হয়ে উঠেছে।'

তারপর বইত খিস্তির ঝড়। আর নানীর খিস্তি এমনই রঙদার আর আনকোরা যে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কারো কিছু করার থাকে না।

'একবার যদি হাতে পাই, দেখিস কী করি ওর। কোটনা ব্যাটার দাড়ি যদি ছিঁড়ে না-নিয়েছি তো তোরা আমায় যা খুশি বলিস।' অথচ যেই মোল্লার সঙ্গে রাস্তার মোড়ে দেখা হয়ে যায়, বিশ্বাস করুন চাই না-করুন, নানী একেবারে শরমে জড়িয়ে যেত।

মহল্লার দামাল ছোকরাগুলো ছাড়া নানীর আজন্মের দুশমন ছিল বাঁদরগুলো —'বজ্জাত, বদমায়েশ বাঁদরগুলো।' ক-পুরুষ ধরেই আপদগুলো মহল্লায় আছে আর সব লোকজনের হাঁড়ির হাল অব্দি তাদের জানা ছিল। তারা জানে, মরদ-গুলো মোটেই নিরাপদ নয়, বালবাচ্চাগুলোও সব হাড়জ্বালানে, তবে শুধু মেয়ে-ছেলেগুলোই ওদের ভয় পায়। তবে নানী তো সারাটা জীবন প্রায় ওদের মধ্যেই কাটিয়েছে। নানী বাঁদরগুলোকে ভয় দেখাবার জন্য কিছু বাচ্চাদের গুলতি জোগাড় করেছিল, আর যখন সে তার বোরখাটাকে মাথায় পেল্লায় একটা পাগড়ির মতো জড়িয়ে নিত আর গুলতি বাগিয়ে ওদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ত, বাঁদরগুলো তখন সত্যি এক ঝলকের জন্য ভয় পেয়ে যেত—এমনিতে সাধারণত যে-ঔদাসীন্য ছিল নানীর প্রতি, সেটা অবশ্য ফিরে আসতে দেরি লাগত না।

হররোজ বাঁদরগুলোর সঙ্গে বাসি পচা খাবারের টুকরোগুলো নিয়ে নানীর কাজিয়া লেগেই থাকত। মহল্লায় কখনো যখন শাদি হয়, কিংবা জানজাব বা সুন্নতের উৎসব, নানী সেখানে হাজির, উচ্ছিষ্ট কুড়োচ্ছে, যেন এ-কাজটার ঠিকে

তাকেই দেওয়া হয়েছে। যেখানে গরিব-গরবাদের মধ্যে খাবার বিলি করা হচ্ছে সেখানে তো তার ভাগ নেওয়ার জন্য চারবার গিয়ে হাজির হবার ফিকির বার করত। এভাবে সে খাবার মজুদ করত, সে এক ইলাহি ব্যাপার, তারপর সে মজুদ খাবারের দিকে আফশোসের ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকত, আহা, আল্লা যদি তাকে উটের মতো পেট দিতেন তাহলে সে চারদিনের রসদ একবারেই ঠেসে রাখতে পারত। আল্লা দস্তুরই করেছেন যে তার খাবারের জোগান হবে এলোমেলো, বে-নিয়মি। তো কেন তাহলে খোদা তাকে খাবার জন্য এমন-এক বেকায়দা কল-কব্জা দিয়েছেন যে সে একবারে যদি কুল্লে দু-বারের খানা ঠাসে, তো কিছুতেই তার উদরযন্ত্র তার মোকাবিলা করতে পারে না? কাজেই নানী এক কায়দা বার করে ফেলেছিল: শুকিয়ে ফেলার জন্য কোনো ছেঁড়া চটে সে খাবারগুলো ছড়িয়ে রাখত, তাবপর সে-সব একটা পাতিলের মধ্যে তুলে রাখত। খিদে পেলে খানিকটা বের করে এনে গুঁড়ো করে নিত, একফোঁটা জল, একছিটে ঝালনুন মেশাত, ব্যস, অমনি তার মুখে পোরার জন্য তোফা এক মণ্ড তৈরি। কিন্তু গরমকালে কিংবা বৃষ্টি-বাদলার মরশুমে এই খানা প্রায়ই তার বরদাস্ত হতো না, দাস্ত শুরু হয়ে যেত। কাজেই যখন তার মজুদ খাদ্য পচে উঠত বা বোঁটকা গন্ধ ছড়াত, সে বেজায় মন খারাপ করে সে-সব লোকের কাছে যে-কোনো দামে বেচে দিত—কুকুর-ছাগল খাওয়াতে লাগবে। গোলটা হলো এই যে কুকুর-ছাগলের পেট নানীর মতো অত মজবুত নয়, ফলে লোকে তার এই মুখরোচক খানা উপকার হিসেবে নিতেই রাজি হতো না—তো পয়সা দিয়ে কেনা! সব সত্ত্বেও এই টুকিটাকি খাবারের কণা নানীর কাছে ছিল তার কলিজার চেয়েও পেয়ারের, এগুলো জোগাড় করতে তাকে অগুনতি লাথি-ঝাঁটা গালাগাল সইতে হয়েছে, আর সেগুলো রোদে শুকোতে দেবার মানেই তো গোটা বাঁদর জাতটার সঙ্গে জিহাদ। যেই সে খাবারগুলো রোদে বিছিয়ে দিয়েছে, অমনি খবরটা যেন বেতারে বাঁদর জাতটার কাছে পৌঁছে যায়, আর দলের পর দল এসে পাঁচিলের ওপর হানাদারদের মতো আস্তানা গেড়ে বসে, অথবা টালির ওপর লাফঝাঁপ করে হুলুস্থুল কাণ্ড লাগিয়ে দেয়। চাল থেকে খড় টেনে নিত তারা, সে কী কিচিরমিচির আর পথচারীদের তাগ করে সে কী ভ্যাংচানি আর বিকট আওয়াজ! নানী তখন নামত তাদের বিরুদ্ধে লড়াইতে। বোরখাটাকে মাথায় পেঁচিয়ে হাতে গুলতি নিয়ে সে দাঁড়াত তেরিয়া মেজাজে। দিনভর লড়াই গর্জাত, নানী বাঁদরগুলোকে ভয় দেখিয়ে বার-বার তাড়াচ্ছে, আর যখন সন্ধে নামত, লুঠতরাজের পর যতটুকু খাবার পড়ে থাকত, সে কুড়িয়ে নিত আর একেবারে আঁতের

মধ্যে থেকে উঠে আসত তার গালাগালের তোড়, আর এই ধকলে বেজায় লবেজান হয়ে যাওয়া শরীরটাকে কোনোমতে টেনেটুনে তার নামমাত্র ঘরটায় ঘুমুতে ঢুকে পড়ত।

বাঁদরগুলো নিশ্চয়ই নানীর ওপর একটা বিশেষ আক্রোশ গজিয়ে তুলেছিল। না-হলে আর কী করে আপনি ব্যাখ্যা করবেন কেন তারা অন্য কোনো-কিছুকে মোটেই পাত্তা না-দিয়ে কেবল নানীর ওই কুড়িয়ে আনা খানার লোভেই হানা দিত? আর এও বা কী করে ব্যাখ্যা করবেন কেন এক পেল্লায়, বদমায়েশ, লালপাছা বাঁদর নানীর বালিশটাকে নিয়েই চম্পট দিলে—যে-বালিশটা ছিল নানীর জানের চেয়েও পেয়ারের? গুড্‌ডি হাওয়া হয়ে যাওয়ার পর এই বালিশটাই ছিল দুনিয়ায় তার সবচেয়ে কাছের আর আদরের। বোরখাটা নিয়ে তার যত দুশ্চিন্তা আর আদিখ্যেতা, ঠিক ততটাই ছিল এই বালিশটাকে নিয়ে। সবসময় সে বালিশটাকে মোটা-মোটা ফোঁড়ে সেলাই দিয়ে মেরামত করত, তালি লাগাত। কত সময় সে বসত একলা কোনো নিরিবিলি কোণে, আর কোনো বাচ্চা মেয়ে যেমন তার পুতুল নিয়ে খেলা করে, তেমনি তার বালিশটা নিয়ে খেলা করত। বালিশটা ছাড়া এখন আর কেউ তো তার নেই যার কাছে সব দুঃখের গাওনা শুনিয়ে সে তার দিলটাকে হালকা করতে পারে। আর বালিশটার জন্য যত তার পেয়ার উথলে উঠত, ততই সে তার জোড়ের সেলাইগুলোকে মজবুত করার জন্য জোরদার ফোঁড় লাগাত।

আর, দ্যাখো এখন, কী ইয়ারকিই না করল বদ নসিব। সে বসেছিল পাঁচিলে হেলান দিয়ে, বোরখাটা গায়ে জড়িয়ে, কোমরবন্ধ থেকে উকুন বাছছিল, এমন সময় কোত্থেকে এক বাঁদর বেমক্কা লাফ দিয়ে পড়ল, ছোঁ মেরে তুলে নিল বালিশটা—আর বেমালুম হাওয়া হয়ে গেল। দেখলে আপনার মনে হতো নানীর বুক থেকে কেউ যেন দিলটা খুবলে নিয়েছে। চেঁচিয়ে, কেঁদে, নানী এমন শোরগোল তুলল যে গোটা মহল্লাটাই হুড়মুড় করে এসে হাজির!

জানেনই তো বাঁদুরে স্বভাব কেমন হয়। ওৎ পেতে থাকে, যেই দেখে কেউ খেয়াল করছে না অমনি পেয়ালা বা কটোরা ছোঁ মেরে নিয়ে দে চম্পট, তারপর গিয়ে পাঁচিলের ওপর বসে দু-হাতে সেটাকে পাকড়ে দেয়ালে ঘস্‌টায়। যার জিনিস সে নিচে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে দেখে, কত তোয়াজ করে, তোষামোদ করে, চাপাটি বাড়িয়ে ধরে কিংবা এক কোয়া পেঁয়াজ; কিন্তু বাঁদর অত সহজে ভোলে না, বিস্তর সময় নেয়, তারপর যখন নিজের পেট ভরে রঙ-তামাশায় খুশমেজাজ হয়, তখন জিনিশটা নিচে ছুঁড়ে ফেলে নিজের তালে চলে যায়। নানী একটা পাত্তিল ভরা

খাবার-দাবার উপুড় করে ফেলল, কিন্তু বাঁদরটার সব খেয়াল ওই বালিশটাতেই, আর, অতএব, যা হবার তাই। নানী কত-কী করল, কত তোয়াজ, খোশামোদ, কিন্তু বাঁদুরে দিল কিছুতেই গলল না, বরং যেমন করে পেঁয়াজেব খোসা ছাড়ায় তেমনি করেই বেজায় খুশিতে বাঁদরটা বালিশটার পরতের পর পরত আপনি খুলতে লাগল—আর ওই পরতগুলো নানী কিনা নিজের হাতে সেলাই করেছে, ছানিপড়া পানিভরা চোখে, যাতে ফোঁড়গুলো বালিশটাকে টিকিয়ে রাখে! আর বাঁদরটা একটা করে নতুন পরত ছেঁড়ে আর নানীর আছাড়ি-পিছাড়ি শোরগোলও বেড়ে চলে। আর এইবার শেষ খোলটা খুলে এল, আর বাঁদরটা এক-এক করে ভেতরের জিনিসগুলো ছুঁড়তে লাগল নিচে—তুলোর পাঁজা মোটেই নয়, বরং…সাবান মিঞার দোলাই…বন্নু মশকওলার কোমরবন্ধ …হাসিনার কাঁচুলি…বাচ্চা মুন্নির গুড়িয়ার পায়জামা, রাজভের ছোট্ট দোপাট্টা…খয়বাতির ইজের…খৈরানের ছোটো ছেলের খেলনা পিস্তল…মুন্সিজির গলবন্ধ…ইব্রাহিমের কামিজের হাতা (বোতাম সমেত)…সিদ্দিকের ল্যাঙটের টুকরো…আমিনার সুরমার শিশি আর বাফতানের কাজললতা…সাকিনার চুমকির বাক্স…মোল্লার তসবিরের পুঁতি, বাকির মিঞার জায়নামাজ…বিসমিল্লার কোমরের ঘুন্সি আর গুড্ডির একবছরের জন্মদিনে যে হলুদের টুকরোটা সুতোয় গেঁথে পরানো হয়েছিল…কিছু নসিব-ভালো-করা শেকড়-বাকড় আর একটা রুপোর আংটি…আর বসির খানের সেই গিলটি করা মেডেলটা সরকার বাহাদুর যেটা তাকে দিয়েছিল লড়াই থেকে বহাল তবিয়তে ফেরবার জন্য। দর্শকদের যা তাজ্জব করে দিয়েছিল তা কিন্তু এ-সব তুচ্ছ গয়নাটয়না নয়। তাদের চোখে পড়ছিল শুধু চোরাই মালের এই খানদানি বহর—যা কি না নানী বছরের পর বছর লুঠপাট চালিয়ে মজুদ করে রেখেছে।

'চোর !…ফেরেব্বাজ !…বুড়ি কুচ্ছিৎ !…দাও, বার করে দাও বুড়ি ডানটাকে। কোতোয়ালিতে ধরিয়ে দাও! দ্যাখো তো ওর বিছানাপত্তর ঘেঁটে : না-মালুম আরো কত মাল বেরিয়ে পড়বে।' অর্থাৎ সরাসরি তারা যা মুখে এল তাই বলে শোরগোল তুলল।

আচমকা নানীর চিল্লানি থেমে গেল। তার চোখের জল শুকিয়ে সারা, মাথাটা হেঁট, কেমন হতভম্ব আর বোবা…সে-রাতটা নানী উবু হয়ে বসে কাটালো, দু-হাতে হাঁটুদুটো জড়ানো, কেমন একটা শুকনো বোবা কান্নায় সারা শরীর থরথর করছে, বিলাপ আর থামে না, এই একবার সে আম্মাজান আর আব্বাজানের নাম ধরে ডাকছে, কখনো-বা তার মরদের, কখনো তার বেটি বিসমিল্লার বা নাতনি

গুড্‌ডির। মাঝে-মধ্যে পলকের জন্য ঢুলে পড়ছে, ঝিমিয়ে আসছে, পরক্ষণেই আবার ডুকরে জেগে উঠছে, যেন কোনো পুরনো দগদগে জখমের জায়গায় পিঁপড়ে-গুলো কুটুস-কুটুস কামড়ে দিচ্ছে। মধ্যে-মধ্যে পাগলের মতো হাসিকান্না, নিজেকেই শোনায় সাতকাহন, তার পরেই হঠাৎ, কোনো কারণ নেই, মুচকি হেসে ফ্যালে। আর তার পরেই যেন আঁধার থেকে পুরনো স্মৃতি তাকে তাগ করে সড়কি ছোঁড়ে আর খ্যাপা কুকুরের মতো সে আধা-মানুষের গলায় ডুকরে ওঠে, গোটা মহল্লাটাকেই তার কাৎরানিতে জাগিয়ে তোলে। এইভাবেই কেটে যায় দু-রোজ, আর মহল্লার লোক আস্তে-আস্তে একটু অসোয়াস্তিই বোধ করে নিজেদের ব্যবহারে, একটু আফশোস, একটু মন-খারাপ। সত্যি তো, ওই খোলামকুচিগুলোর কারুরই কোনো দরকার ছিল না। সে তো কত বছর আগেই ওগুলো উধাও হয়েছিল, আর সে-সময় ও নিয়ে বিস্তর কান্নাকাটি হয়েছে ঠিকই, তবে কবেই তো সে-সবের কথা লোকে বেমালুম ভুলে গিয়েছে। আসলে তারা নিজেরাও তো এক-একজন রাজা-বাদশা নয়, আর কখনো-সখনো এ-রকম সময় একটা খড়কুটোও ভারি পিলপের মতো বুকে চেপে বসে। কিন্তু এ-সব জিনিসের অভাব তাদের মোটেই খতম করে ফেলেনি। সাবান মিঞার দোলাইয়ের উম কবেই উধাও, ঠাণ্ডার মোকাবিলা করার এলেম তার আর ছিলই না, আর ওটা ফেরত পাওয়ার অপেক্ষায় থেকে ওর বড়ো হয়ে ওঠা আটকায়নি। হাসিনার তো কবেই মনে হয়েছে যে ওই কাঁচুলি পরবার বয়স সে কোনকালেই পেরিয়ে এসেছে। গুড়িয়ার পায়জামা মুনুনির আজ আর কোন কাজেই বা লাগবে? সে তো ঢের আগেই পুতুলখেলা ছেড়ে রান্নাবাটি খেলছে আর মহল্লার কেউই তো নানীর রক্ত ছেটাবে বলে শপথ করে বসেনি।

সে এককালে থাকত এক জিন। জিনের জান থাকত এক মস্ত কালো ভোমরার মধ্যে। সাত সাগর পেরিয়ে সে-এক গুহায় থাকত এক পেল্লায় সিন্দুক, তার মধ্যে ফের আরেক সিন্দুক, তার মধ্যে ছোট্ট এক পেটি—তাতেই থাকত মস্ত কালো ভোমরাটা। কোন দূর মুলুক থেকে এসেছিল এক শাহাজাদা—গোড়ায় সে ছিঁড়ে ফেলেছিল ভোমরার একটা ঠ্যাং, আর জাদুর লা-জবাব এলেম দ্যাখো, জিনের একটা পা ভেঙে গিয়েছিল। তার পর শাহাজাদা আর-একটা ঠ্যাং ছেঁড়ে, জিনের আরেক ঠ্যাং ভেঙে যায়। তার পর শাহাজাদা পিষে মারে ভোমরাটাকে, আর জিন অমনি অক্কা পায়।

নানীর জান ছিল ওই বালিশটায়, জাদুবালিশটা তার দাঁত দিয়ে ছিঁড়েছে বাঁদরটা আর নানীর কলেজেতে বিঁধে গেছে গনগনে লাল লোহা।

এমন-কোনো দুঃখদুর্দশা দুনিয়ায় নেই কিসমৎ যা দিয়ে নানীকে নাস্তাখাস্তা করেনি। যখন তার মরদের ইন্তেকাল হলো আর নানীর হাতের চুড়ি ভেঙে গেল, নানী মনে করেনি যে খুব বেশি দিন তাকে বেঁচে থাকতে হবে : মৌত নজদিক ; যখন বিসমিল্লার শরীর কাফনে মুড়ে দেওয়া হলো, সে ঠিক জানত উটের পিঠে এটাই শেষ খড়। আর যখন গুড্‌ডি তাকে বেইজ্জত করে পালিয়ে গেল, নানী ভেবেছিল মোক্ষম মার বুঝি এটাই।

সেই যেদিন জন্মেছিল, তখন থেকে এমন-কোনো রোগদরদ নেই, যা সে ভোগ করেনি। বসন্ত তার মুখে দাগ রেখে গিয়েছিল। ফি-বছর, কোনো পরব-মজলিশে, তার বদ-হজম দাস্ত লেগেই থাকত।

পরের জঞ্জাল সাফ করে-করে তার আঙুল হাড্ডিসার ; পরের বাসন ধুয়ে-ধুয়ে তার হাতে হাজা ধরেছে। ফি-বছরই দু-একবার সে অন্ধকারে সিঁড়ি থেকে আছাড় খেত নিচে, বিছানা নিত দু-একদিনের জন্য, তার পর ফের খোঁড়াতে-খোঁড়াতে কাজকারবারের ধান্দায় বেরুত। গত জন্মে নির্ঘাৎ কুকুরের গায়ের এঁটুলি পোকা ছিল নানী ; সেইজন্যই তাকে ঘায়েল করা এমন মুশকিল। মনে হচ্ছিল, মরণও যেন এতকাল তার থেকে বিস্তর তফাতে থেকেছে। সে ঘুরঘুর করেছে সারাক্ষণ, ছেঁড়া খুরখুরে পোশাক লটকে আছে গা থেকে, কেউ মারা গেলে, তার জামাকাপড় দিতে চাইলে নানী যে কিছুতেই তা নিত না তা নয়, স্রেফ তার ধারকাছেও ঘেঁষতে দিত না। কে জানে, সেলাইয়ের ফোঁড়ে-ফাড়ে যদি মরণ লুকিয়ে থাকে, আর লাফিয়ে পড়ে তার ঘাড়ে, এমন লাজুক নানীকে যদি পাকড়ে ধরে। এটা কে আন্দাজ করেছিল যে শেষকালে বাঁদরগুলোই তার নিকেশ করবে, তার দফা সারবে? ভোরবেলায় যখন ভিস্তিওলা এল তার মশক নিয়ে, দেখতে পেল নানী উবু হয়ে বসে আছে সিঁড়িতে, তার মুখটা খোলা, হাঁ-করা, আর আধবোজা চোখের কিনারে মাছি ঘুরছে। লোকে তো কতই দেখেছে নানীকে এমনি ভাবেই ঘুমিয়ে থাকতে, আঁৎকে ভেবেছে বুঝি মরেই গেছে। কিন্তু নানী ফের গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছে, গলা ঝেড়ে হ্যাক করে ফেলেছে কফ, আর যে-বেচারা তার নিদ ভাঙিয়েছে তার ওপর ঝরিয়েছে খিস্তির পশলা। সেদিন কিন্তু নানী উবু হয়ে বসেই রইল সিঁড়িতে। মৃত্যুর মধ্যে নিথর, নানী দুনিয়াটাকে লক্ষ্য করে বেদম খিস্তি করে যেতে লাগল। তার সারাজীবনে, এক লহমাও আরাম পায়নি সে, সোয়াস্তি পায়নি, আর যেখানেই সে চিৎ হয়ে শুয়েছে সেখানেই গজিয়ে উঠেছে কাঁটাঝোপ। নানীর কাফনও হলো সেইরকম, যেমনকার তেমন, উবু হয়ে বসে। তার শরীরে

আড় ধরে গেছে চটপট, হাজার টানাহ্যাঁচড়াতেও শরীরটা আর সোজা করা গেল না।

কেয়ামতের দিন বেজে উঠল ভেরী, আর চটকা ভেঙে জেগে উঠল নানী, উঠে পড়ল খকখক কেশে, গলা ঝেড়ে, যেন তার কানে এসে পৌঁছেছে কোনো লঙ্গর-খানার আওয়াজ···ফরিস্তাদের খিস্তি করতে-করতে, দু-ভাঁজ হয়ে নুয়ে পড়লে কী হয়, তবু কোনোরকমে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে চলল নিজেকে বেহেস্তে, সিরাতের সেতুর ওপর দিয়ে, আর হুড়মুড় করে হাজির হলো ইলাহী আলমীন আল্লাহ্‌তালার সামনে···আর মানুষের এই হালহালাক, এই তাপ-অপমান দেখে খোদাতালার মাথা হেঁট হয়ে যায়, তাঁর চোখ দিয়ে দরদর করে রক্ত ঝরে পড়ে। আর খোদা-তালার সেই রক্তে রাঙা চোখের জল ভিজিয়ে দেয় নানীর বে-তদ্বির কবর, আর জলজ্বলে লাল মোরগ ফুল গজিয়ে ওঠে সেখানে, আর হাওয়ায় দুলে-দুলে নেচে ওঠে।

অনুবাদ : অপরাজিতা সেন ও রুশতী সেন

জায়গিরদার আর তাঁর কুকুর

পান্নালাল প্যাটেল

বিলেত থেকে ফিরে জায়গিরদার সেই প্রথম আমাদের গাঁ দেখতে আসবেন ব'লে সবাই তাঁর আসার অপেক্ষা করছিল।

প্রায় এক হপ্তা ধরেই 'তালাতি' দুধের পাত্র সাজিয়ে রাখছিল। কে বলতে পারে কখন হঠাৎ 'বাপু'র আবির্ভাব ঘটবে? চারপায়া আর রাশি-রাশি গুজনি-তোষকও আনা হয়েছে। মুখীর ওপর নির্দেশ, সে যেন গ্রাম ছেড়ে কোথাও না যায়; আর নাপিত, মুচি আর ভিস্তিওলাদের সবসময় তৈরি থাকতে হুকুম দেয়া হয়েছে। একদল পুলিশ দিনরাত পাহারা দিচ্ছে, এমনকি বাড়িতে খেতে যাবার সময়েও তারা তাদের বদ্‌লি রেখে গেছে কাউকে।

তাঁর খানশামা, চাকরবাকর আর পাইক-বরকন্দাজ এসে পৌঁছেছে আজ ভোর বেলায়, আর সেইসঙ্গে আস্ত গাঁটাকে ছেয়ে রেখেছে কৌতূহল আর উৎকণ্ঠার ঢেউ।

খানশামা এসেই রান্নাঘরের হাল ধরেছে, গাঁয়ের চারজন তাকে সাহায্য করবে; আর জায়গিরদারের দলবলের আপ্যায়ন করতেই মুখী সারাক্ষণ শশব্যস্ত। বাসন-কোসন, দুধ, দই এ-সব জোগাড় করতে গাঁয়ে বেরিয়ে পড়েছে পুলিশের লোক; আর বেনের দোকান থেকে আরো-সব রান্নার জিনিশপত্র কেনাকাটা করা হয়েছে—বলা বাহুল্য যে আস্ত গাঁ-কেই সকলে মিলে খরচের ঝামেলাটা পোহাতে হবে!—আর জায়গিরদারের চাকরবাকরেরা সবকিছু গোছগাছ করে রাখতে শুরু করেছে, যাতে সবকিছু সাফ-সুফ আর পরিপাটি দেখায়।

খানিকটা অস্থির হয়েই পায়চারি করছিল 'তালাতি', গায়ে চাপিয়েছে গাঁয়ের ওস্তাগর দালার তৈরি সেই বছর পাঁচেক আগেকার কুর্তা আর আঁটো পাজামা, মাথায় গোলাপী পাগড়ি, সারাক্ষণ একটা চোখ রাস্তার ওপর।

হঠাৎ কে যেন ব'লে উঠল, 'গাড়িটা আসছে বোধ হয়,' আর অমনি সবাই ধাবমান গাড়িটার আওয়াজ শোনবার জন্য উৎকর্ণ। মোড়ের মাথায় মস্ত ভিড় জমে গেল। 'ঐ যে আসছে···ঐ যে দেখছ না ধুলো উড়ছে···এই দেখা গেল ব'লে—'

পুলিশগুলো ভিড়ের দিকে তাড়া করে গেল, 'আরে, হাঁদারা! রাস্তা জুড়ে দাঁড়াসনে! সার দিয়ে দাঁড়া! এই ভূতগুলো, কোনো গণ্ডগোল নয়, একদম চুপ! বাপু যখন আসবেন—শুনছিস তো, আকাটগুলো—নুয়ে ওঁকে সেলাম ঠুকবি।'

মাথানোয়ানো গ্রামবাসীদের ওপর ধুলো উড়িয়ে বাপুর গাড়ি এল আর গাঁয়ের মেলার মাঠের পাশে এসে থামল।

দরজা খুলে গেল, আর বাপু গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালেন, আর তাঁর পেছন-পেছন নামল তুষার-শাদা এক প্রাণী, লম্বা-লম্বা কান আর খাটো-খাটো পা, আর সারা শরীরটা পুরু লোমের আস্তরে ঢাকা। বাপুর নায়েব নেমে এল পেছনের আসন থেকে।

জায়গিরদার ছোকরা মানুষ, বয়েস হবে আটাশ। মুখটা তেমন সুন্দর নয়, কিন্তু শরীর সুগঠিত, আর দারুণ চালে সেজেছেন—কোট, পাৎলুন, টাই, জুতো মোজা, কবজিতে ঘড়ি, চোখে কালো চশমা, আঙুলে চমৎকার একটা আংটি। এক হাতে ছড়ি, আর অন্য হাতে শেকলের মতো কী-একটা দেখে মনে হচ্ছিল, যেন জাহাজ থেকে নামছেন!

কিন্তু তাঁর দিকে কেউ মন দিচ্ছিল না—এমনকি তাঁকে সেলাম ঠোকবার সময়ও তাদের নজর পড়ে রইল তাঁর পায়ের কাছের ঐ অদ্ভুত ছোট্ট জীবটার দিকেই।

নিজেদের মধ্যে বলাবলি করার সময়েও তারা বিলেত থেকে ঘুরে আসার পর জায়গিরদারের মধ্যে কী বদল হয়েছে তার বদলে বরং ঐ জন্তুটার কথাই আলোচনা করতে লাগল। কে-এক সবজান্তা বললে যে এ হলো গিয়ে বিলিতি ইঁদুর, কিন্তু একজনের মনে হলো এ বুঝি কোনো কুকুরছানা। একজন আবার এও বললে যে এ-বুঝি চিতাবাঘেরই কোনো বিলিতি জাতভাই! কারু-কারু অবশ্য একে কুকুর, বেড়াল অথবা খরগোশ কোনোটাই মনে হলো না, তবে এই অদ্ভুত ক্ষুদে জীবটা যে কী তা তারা ভেবে বার করতে পারলে না। আলোচনা ক্রমেই উত্তেজনায় জট পাকিয়ে যাচ্ছে; কেউ-কেউ আবার এ নিয়ে বাজিও ধরে ফেলল। খবরটা যতই ছড়াল, ততই ভিড় বাড়তে লাগল, আর নতুন লোকেরা এসেই সবাই একই ধুয়ো তুললে, 'এই আজব জীবটা কে বটে?' কেউ আবার সত্যি ভয় পেয়ে গেল। 'বাপু জানোয়ারটাকে শেকল বেঁধে রাখলেই ভালো করতেন, নইলে কে জানে বাপু কাকে কখন মেরেই ফ্যালে!'

এদিকে কতগুলো ছোকরা এসে হাজির—এ যে একটা কুকুর, এই সঠিক খবরটা তারা নিয়ে এসেছে। এমনকি নামটাও নাকি তারা শুনে এসেছে, তবে এ নিয়ে খানিকটা খটকা আছে। ছোকরাদের একজন বললে, এর নাম 'শিবল্লার।' দ্বিতীয়-জন বললে, 'উঁহু, শিবলো,' তবে তৃতীয়জন বললে, 'শিলু-ফিলু কিছু-একটা হবে বোধ হয়।' কেউ-কেউ অবিশ্যি নাম নিয়ে মোটেই মাথা ঘামালে না, বরং কুকুরটারই

সাত কাহন শুরু করে দিলে। 'আরে ব্বাস। কী চমৎকার একটা কুকুর! কানগুলো এমন লম্বা যে বুঝি প্রায় ভুঁয়েই লুটোচ্ছে। পাগুলো কী-রকম খাটো, দেখেছ? আর কী চুল! যেন সাধুবাবাদের জটা! আর কেমন ধবধবে শাদা!' একজন আবার একটা নতুন কথা পাড়লে, 'আচ্ছা, কুকুরটার লোমগুলো রুপোর জরি নয় তো! শেঠজি সেদিন বলেছিলেন বিলেতের মেয়েদের নাকি সোনার চুল থাকে, তা কুকুরটার হয়তো রুপোর চুল আছে। কে জানে বাবা! বিলেত দেশে সবকিছুই সম্ভব।'

এ-কথা শুনে সবাই হেসেই বাঁচে না, তবে এ-বিষয়ে মনে-মনে কারু কিন্তু অন্য মত নেই, 'তা, বাপু আর যা-ই হোন, কোনো সাধারণ নেড়ি কুকুর নিয়ে আসবেন না নিশ্চয়ই।' গোটা গাঁটাই এই সারমেয় প্রসঙ্গে তোলপাড় হয়ে গেল। এমনকি মাঠের ওপাশে দাঁড়ানো মেয়েরা শুদ্ধ এ-নিয়ে নানা রকম আজব জল্পনা করছিল। কিন্তু মুখী এসে সাবধান করে দিয়ে গেল, 'বাপুর কুকুর নিয়ে কিন্তু গাড়লের মতো কিছু ব'লে ফেলিসনে। উনি আবার কুকুরটাকে নিজের ছেলের চাইতেও বেশি ভালোবাসেন।' কে-এক ছোকরা সে-কথাটায় সায় দিলে, 'জান্নু মিঞাও একই কথা বলছিল।'

বাপুর মেজাজ-মর্জির সাথে সুপরিচিত কেউ একজন বললে, 'একে কেউ কিন্তু কুত্তাটুত্তা বোলো না। মনে রেখো, এ হলো গিয়ে খোদ বাপুর কুকুর।'

বাপুর পেছন-পেছন কুকুরটা ঘুরঘুর করছে—শয়ে-শয়ে চোখ তার ওপর এঁটে রইল।

বাপু যেই খাটিয়ার ওপর চড়ে বসলেন, কুকুরটাও অমনি লাফিয়ে তাঁর পেছন-পেছন উঠে পড়ল। তার পর যেই বাপু 'সিলাউন' (সিট ডাউন) গোছের কী একটা কথা বললেন অমনি কিনা কুকুরটা শান্ত হয়ে খাটিয়ায় বসে পড়ল!

লোকে তো একেবারে তাজ্জব। কেউ ভাবলে 'সিলাউন' বুঝি কুকুরটার নাম, আরেকজন.অবশ্য ভাবলে যে এ হলো বসতে হুকুম করা।

সে যাই হোক, সবাই এটা বুঝে ফেললে জায়গিরদারের নায়েবের চাইতেও কুকুরটাকে বেশি সম্মান করা উচিত, এমনকি জায়গিরদারের ছেলের চাইতেও বটে। কারণ বছর-তিন আগে জায়গিরদার যখন আরেকবার এখানে এসেছিলেন, তাঁর নিজের ছেলেও এমন অবাধে খাটিয়াটার ওপর লাফিয়ে ওঠেনি।

কুকুরটার নাম সিলু—সিলভারেরই অপভ্রংশ—আর গাঁয়ের লোকেরা তাকে সিলু-ভাই ব'লে ডাকতে শুরু করে দিলে। যেই তারা শুনলে যে কুকুরটার দাম

পড়েছে পাঁচশো টাকা, তাদের মুখে আর রা সরে না—সবাই এমনই তাজ্জব ; অত টাকায় তো কেউ গোটা কুড়ি বলদ কিনতে পারে কিংবা গোটা পাঁচেক ঘোড়া আর আরেকজন তো ব'লেই বসল যে এ যে দেখছি একেবারে হাতির মতোই বহু-মূল্য ! 'রুপোর ওজনে এর দাম—ভেবেছ একবার !' একজন মন্তব্য করলে।

কিন্তু গাঁয়ের কুকুরগুলো তো আর অতটা বোধ-বিবেচনা ধরে না। তারা যেই সিলুকে দেখতে পেলে অমনি ঘেউ-ঘেউ জুড়ে দিলে—অচেনা কোনো কুকুর দেখলেই চিরকাল তারা তা-ই করে। তাদের ঘেউ-ঘেউ শুনে সিলুও বেজায় চ্যাঁচাতে শুরু করে দিলে। সব্বাই থরহরি কম্পমান। 'আরে ব্বাস ! এর ডাকের বহর শোনো—ঠিক যেন বাঘের হাঁক !'

'হাঁদার মতো কথা বোলো না,' এক ছোকরা প্রতিবাদ করলে, 'দাও না একে একবার আমাদের গাঁয়ের কুকুরগুলোর সঙ্গে লড়তে—বাজি ধরে বলতে পারি অমনি শ্রীমান একেবারে হেরে ভূত হয়ে যাবে। কেবল চেহারা দেখেই বিচার কোরো না। এমনকি গাঁয়ের সব চেয়ে নেড়ি কুকুরটাও এর চেয়ে—'

গাঁয়ের লোকেরা কিন্তু এই যুক্তিতে মোটেই ভুলল না। তারা বরং ভাবলে বাপু যদি একবার একে ছেড়ে দেয় তো গাঁয়ের বেচারা কুকুরগুলোকে এ নির্ঘাৎ একহাত দেখিয়ে দেবে। কেউ-কেউ এমনকি স্বয়ং জানু মিঞার কাছে গিয়ে হাজির : 'জানুভাই ! সিলুভাইকে একবার বেরিয়ে আসতে দিচ্ছেন না কেন ? শুধু একবার ছেড়ে দিন না। ঠিক জানি এই কুত্তাগুলো অমনি ল্যাজ গুটিয়ে পালাবে। দারুণ জমে যাবে তা হলে।'

হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন জায়গিরদার। 'আরে হাঁদারা, হাঁ করে দেখছিস কী ? বেজন্মা কুত্তাগুলোকে তাড়িয়ে দে।' অমনি সবাই ঢিল ছুঁড়ে কুকুরগুলোকে তাড়াতে শুরু করে দিলে।

কুকুরগুলো পালাল বটে, কিন্তু ঘেউ-ঘেউ থামাল না। আর অন্যান্য অলিগলি থেকেও তাদের ডাকের সাড়া উঠল।···কুকুররা এমনিতে মানুষজনের চেয়েও বেশি মরিয়া ভাবে নিজেদের আস্তানাগুলো আঁকড়ে থাকে। যেই গাঁয়ের লোকেরা পেছন ফিরল, অমনি কুকুরগুলো আবার এসে হাজির—এবার দলে আরো ভারি, কারণ অন্য সব অলিগলি থেকেও তাদের স্যাঙাতরা এসে জুটেছে।

দশ মিনিটের মধ্যেই অবস্থা আবার ঘোরালো হয়ে উঠল। জায়গিরদারের কাছে গিয়ে ভিড়ের মনোবাসনা ব্যক্ত করলে মুখী, 'বাপু, একটিবার শুধু ছেড়ে দিন সিলুভাইকে—এই খেঁকিগুলো আর এ-তল্লাট মাড়াবেই না কখনো !'

'উঁহু, একবার যদি এ ক্ষেপে যায় তো একে বাগ মানানো একেবারে মুশকিল হয়ে উঠবে। এখন বেশ আমার কথা শুনছে,' গোঁফ চুমরে জায়গিরদার জানালেন।

'তা অবশ্যি ঠিক—এ খুব বাধ্য কুকুর,' মুখী সায় দিলে।

এক বুড়ো তাচ্ছিল্যভরে হাসল। 'বাপু, এই কুকুর কি বাঘের সঙ্গে লড়তে পারবে?'

একজন অমনি এই টিপ্পনীটাকে মোলায়েম করার চেষ্টা করলে। 'কী? সিলুভাইয়ের কথা বলছ? কোনো সাধারণ চিতা তো সিলুভাইকে দেখে নয়ানজুলিতে লাফিয়ে নামবে।'

কিন্তু বুড়ো অত সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। 'তাই নাকি, বাপু?'

'একটা চিতাকে এনেই ছাখ না,' সাবধান করে দিয়ে মুচকি হাসলেন বাপু। আবারও কুকুরগুলোর ঘেউ-ঘেউ মনোযোগ কেড়ে নিল।

সিলুভাই এদিকে নিজের কারদানি দেখাবার জন্য অধীর হয়ে উঠছে। কিন্তু বেচারা করবেই বা কী? তাকে তো বাপুর বাধ্য হয়েই থাকতে হবে, না?

বাপু তার গলায় একটা শেকল পরিয়ে দিয়ে যেই উঠে পডতে যাবেন, অমনি মুখী এক পেয়ালা চা নিয়ে এসে হাজির। বাপু 'দাও' ব'লে হাত বাড়াতে গিয়েও মত পালটে ফেললেন। হাত গুটিয়ে নিয়ে জিগেস করলেন, 'তোমাদেব এখানে কোনো টেবিল-ফেবিল নেই?'

মুখী একটু ঘাবডেই গেল; টেবিল কাকে বলে, তা সে ভেবেই পেলে না। তার পর হঠাৎ তার দুম করে মনে পড়ে গেল যে জায়গিরদারের সঙ্গে সদরে যখন একবার গিয়েছিল তখন একটা হোটেল দেখেছিল সে। ঘাবড়ে গিয়ে বললে, 'চেয়ারের কথা বলছেন, হুজুর? তা…'

'আচ্ছা হাঁদা তো! চেয়ার দিয়ে কী হবে? আমি শুধু এই পেয়ালাটা রাখতে চাচ্ছি…'

গাঁয়ের লোকেরা একটু বোমকে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। এবার হঠাৎ যেই কথাটা মাথায় ঢুকল, তারা টেবিলের খোঁজে চার পাশে ছুটল। কিন্তু আনেটা কী? একটা ঝুড়ি এনে অবশ্যি উপুড় করে রাখা যায়, তবে সে তো বড্ড নিচু হয়ে পড়বে। পেল্লায় একটা পাথর-টাথর পেলেও হতো, সেটাই না-হয় জায়গিরদারের জন্য নিয়ে আসা যেত।

আচমকা ঐ বুড়োর মাথাতেই একটা বুদ্ধি খেলে গেল। 'যাও না, একটা পিপে-টিপে কিছু নিয়ে এসো না?'

বুড়োর বুদ্ধি দেখে মুখী হিংসেয় একেবারে জলে গেল। মনে-মনে বললে, 'এমন সহজ কথাটাও আমার মাথায় এল না—অথচ পিপেটা কি না আমার নাকের ডগাতেই ঝুলছে!' একজন কেউ যদি চেষ্টা করত, তবে পিপেটা নিয়ে তখুনি হাজির হতে পারত। কিন্তু জনাতিনেক যদি হন্তদন্ত হয়ে ছোটে তো সময় একটু বেশি লাগারই কথা।

কিন্তু মুখী যখন পেয়ালাটা পিপের ওপর নামিয়ে রাখতে যাবে, জায়গিরদার খেঁকিয়ে উঠলেন, 'তোদের কি আক্কেল ব'লে কিছু নেই? অন্তত ধুলোটা ঝেড়ে দে।'

কয়েকজন উঠে সোৎসাহে ধুলো ঝাড়তে শুরু করে দিলে। এক ছোকরা তার কাঁধের গামছা দিয়ে বেদম আছড়াতে লাগল। কুকুরটার গায়ে গিয়ে একরাশ ধুলো পড়ল, জায়গিরদার বেশ চটেই গেলেন। বুড়ো বললে, 'সাবধান, দেখিস সিলুভাইয়ের গায়ে যেন ধুলো না-পড়ে।'

বাপুও ফোড়ন কাটলেন : 'আকাট।'

এক ছোকরা জিগেস করলে; 'সিলুভাইয়ের গা ঝেড়ে দেব?'

ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসলেন জায়গিরদার। 'কেন? তোর কাঁধের তোয়ালেটা সাফ করতে?'

লোকে বেশ বিমূঢ়ই দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ, কিন্তু শেষটায় বুড়োই তাদের বাঁচালে, 'সিলুভাই তোদের জামাকাপড়ের চেয়েও ফরসা।' সবাই হো-হো করে হেসে উঠল, কিন্তু ছোকরাটি একটু আহত বোধ করলে। 'হতে পারে বরফের মতো শাদা, তাই ব'লে কুকুর বৈ তো আর-কিছু নয়?'

'সিলুভাই-এর চায়ের জন্য কী ব্যবস্থা করব?' মুখী খানিকটা কাহিল ভাবেই জিগেস করলে।

'কেন, আর চা নেই তোদের?' বাপুর গলার স্বর কঠোর।

'চা তো তৈরিই আছে, বাপু।'

সাহেব-কুকুর কেমন করে চা খায় তা দেখবার জন্য লোকজনের কৌতূহলের আর শেষ নেই।

'আমি বরং পেয়ালাটা হাতে করে আছি, তোরা কেউ গিয়ে আরেকটা পিপে নিয়ে আয়।'

বাপু আবারও খেঁকিয়ে উঠলেন। 'আরে গাধা, আবার একটা পিপে চাই কেন? এ তো আর পেরালা-পিরিচ থেকে চা খাবে না। আমার হতচ্ছাড়া চাকরবাকর-গুলো গেল কোথায়?'

পুলিশের লোকজন আর চাকরবাকররা ভেতরে গরম চা খাচ্ছিল—তারা ভয়ে কাঁটা হয়ে উঠল। কিন্তু তারা এসে হাজির হবার আগেই একটা ব্যবস্থা হয়ে গেল।

সিলুভাই-এর জন্য মেঝেয় একটা বিছানা পাতা হলো আর একটা কাঁসার বাটিতে করে চা আনা হলো।

গাঁয়ের লোকেরা অমনি সিলুভাই সম্বন্ধে সব উৎসাহ-আগ্রহ হারিয়ে বসল। বলাবলি করল, 'আমাদের কুকুরগুলোও তো অমনি করেই জল-টল খায়।'

এদিকে গাঁয়ের কুকুরগুলো আবার ক্ষেপে উঠেছে। পাহারারা সবাই সিলুভাই-এর কারদানি দেখতেই ব্যস্ত, 'কেমন করে চা খাচ্ছে দ্যাখো,' আর এই ফাঁকে তারা বেশ কাছেই এসে পড়েছে। কিন্তু জায়গিরদার বললেন, 'যা, ওখানে বসে আগে তোর চা খেয়ে নে, তারপর যা ইচ্ছে করিস।'

গাঁয়ের লোকেরা অমনি আবার কৌতূহলী হয়ে উঠল। গাঁয়ের নেড়িগুলোর সঙ্গে সিলুভাই-এর লড়াই দেখবে ব'লে এতই তারা হা-পিত্যেশ করে ছিল যে, কুকুরগুলো কাছে দাঁড়ালেও তারা তাদের তাড়াবার কোনো চেষ্টা করলে না। শেষটায় বাপু তাঁর কুকুর নিয়ে খোলামেলায় এসে দাঁড়াতেই গাঁয়ের সবখান থেকে লোকজন এসে জটলা করে দাঁড়ালে তাঁর কাছে—রোদ পড়ে সিলুভাই-এর গলার শেকল ঝিকিয়ে উঠছে!

কুকুরগুলোকে সরিয়ে যারা কাছে এসে ভিড় করেছিল তাদের দিকে তাকিয়ে বাপু গর্‌র্‌র্‌ করে উঠলেন। 'আরে, এই বোকা হাঁদা, পথ আটকে দাঁড়াস না। সিলু, চল তো।'

সিলু গর্‌র্‌র্‌ করে ডোরাকাটা একটা খেঁকির দিকে তেড়ে গেল। কিন্তু ডোরা-কাটা কয়েক পা পেছিয়ে গেল। 'পালাস কোথা? আয় না।'

ঠিক তখুনি জায়গিরদার দেখলেন যে ডোরাকাটা এগিয়ে আসছে, অমনি সিলুকে সেদিকে লেলিয়ে দিলেন। কিন্তু ডোরাকাটা ভারি চালাক, তাক না-বুঝে সে কিছুই করবে না। সিলু গর্‌র্‌র্‌-গর্‌র্‌র্‌ করছে, কিন্তু ডোরাকাটা তাতে মোটেই ভয় পায়নি। হঠাৎ কে চেঁচিয়ে উঠল, 'বাপু! সাবধান!'

কিন্তু ততক্ষণে কেলে কুকুরটা বাপুর পায়ে কামড়ে দিয়েই ছুটে পালিয়েছে। এর পরে যে-ঝামেলা পাকালো, তার ফাঁকে সিলু ততক্ষণে বাপুর হাত ছাড়িয়ে ছুটে এসেছে। চার পাশে হৈ-হৈ রৈ-রৈ। কেউ বাপুর পায়ের জখম পরীক্ষা করে দেখছে, কেউ ছুটেছে সিলুকে উদ্ধার করতে—গাঁয়ের কুকুরগুলো তাকে তখন চারপাশ থেকে ঘিরে ধরেছে। বেচারার হাউ-হাউ কানে আসছে সবার, কিন্তু সিলু যে

কোথায় সেটাই তারা খুঁজে বার করতে পারছে না। কুকুরগুলোর ওপর ঢিল ছুঁড়তে শুরু করলে তারা, লাঠি দিয়ে পেটালে, গোটাকয় কুকুর তো বেশ জখমই হলো, কেউ ছুটল পড়ি-মরি পাঁই-পাঁই করে, কিন্তু সিলুকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। বাপু চ্যাচাচ্ছেন, 'আমার বন্দুকটা নিয়ে আয় না, গাধাগুলো !'

লোকে আঁৎকে উঠল। একজন একটা বন্দুক নিয়ে এসে হাজির। 'আরে গাধা, এটা নয়—অন্যটা নিয়ে আয় !'

কিন্তু বন্দুক নিয়ে আসার আগেই লোকে কয়েকটা কুকুরকে পিটিয়েই মেরে ফেলেছে।

অসহায়ভাবে দৃশ্যটার দিকে তাকিয়ে রইলেন বাপু। সিলু রক্তের ধারার মধ্যে শুয়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে, ছটফট করছে, বাকি কুকুরগুলো সব পালিয়ে গেছে। সিলুর নীল চোখগুলো বাপুর বন্দুকের চেয়েও ঢের ভয়ানক। তার চেয়েও ভয়াবহ মুমূর্ষু কুকুরগুলোর করুণ আর্তনাদ আর থমথমে স্তব্ধতা। এ-রকম বীভৎস দৃশ্য কারুর সই-ছিল না, অনেকেই বাড়ি ফিরতে শুরু করে দিয়েছে। এমনকি বাপুর আশপাশে যারা দাঁড়িয়েছিল তারাও সুযোগ পেলে এখান থেকে কেটে পড়ত। কিন্তু সকলেই ভয়ে এমন কাবু হয়ে আছে যে নড়তেও পারছে না।

বাপু আবারও চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হাঁদারা, দাঁড়িয়ে দেখছিস কী ? যা, গিয়ে কুকুরগুলোকে ঐ গলিটার কাছে নিয়ে আয়—কেউ কাছে ঘেঁষবি না—আর সাবধান করে দেবার পরেও কেউ যদি আসিস তো কেউ মারা গেলে আমি কিন্তু দায়ী হবো না, ব'লে রাখছি।'

সবাই ভাবলে যে কেটে পড়াই নিরাপদ, আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই জায়গিরদার ছাড়া জায়গাটা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল।

বেশির ভাগই বাড়ি বসে রইল ; জায়গিদারের চাকর-বাকর বা পুলিশের লোক-দের খপ্পর যারা এড়াতে পারলে না এমনকি তারা শুদ্ধ কোনো ছলছুতোয় কুকুর-গুলোকে তাদের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করলে। সত্যি-বলতে, জায়গিরদারের নিজস্ব লোকজনেরও কাজটা করার কোনো ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু তারা জানত যে জায়গিরদারকে শান্ত করার আর-কোনো উপায় নেই। তারা গাঁয়ের লোকদের বোঝাবার চেষ্টা করলে, 'অন্তত গোটা কয়েক কুকুর ধরে দাও। তাতেই শুধু গোটা গাঁ-টা বিপদ থেকে বাঁচবে।'

গোটা দশেক কুকুরকে তারা ঘিরে ফেললে, কিন্তু তাদের মধ্যে কেবল আদ্ধেক-কেই গলিটার কাছে আনা গেল, জায়গিরদার তো সেখানে বন্দুক হাতে তৈরি তাদের

গুলি করে মারবেন ব'লে। ঐ পাঁচটা কুকুরকেই তিনি লহমার মধ্যে খতম করে দিলেন, চেঁচিয়ে বললেন, 'কই? আরগুলো কোথায়?'

উত্তর দেবার সাহস কারু ছিল না। শেষটায় জানু মিঞা সাহস সঞ্চয় করে বললে, 'আর কাউকে তো পাচ্ছি না। ওরা নিশ্চয়ই গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে।'

'বাজে কথা! এই বদমাশগুলো নিশ্চয়ই ওদের বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছে। যা, খুঁজে বার করে নিয়ে আয়, আর কোথাও কোনো কুকুর দেখতে পেলে বাড়ির মালিককেও সঙ্গে করে ধরে নিয়ে আসবি।' চাকরবাকররা আরেকবার হন্তদন্ত হয়ে ছুটল। কিন্তু জায়গিরদার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আচ্ছা, বাদ দে, জানু। তোরা কেউ কোনো কাজের নোস—সব ক-টা অকম্মার ঢেঁকি। যা, বরং সিলুকে একটা কাপড় পেঁচিয়ে আমার গাড়িতে তুলে দে।'

কাপড় যে কারু কাছ থেকে নেবে, এমন-কারু দেখা পেলে না জানু মিঞা। কেবল সেই ছোকরা ছিল কাছে, যার 'পচ্ছেদি' এত নোংরা ছিল যে এক ঘণ্টা আগেও জ্যান্ত সিলুকে সাফ করবার যোগ্য ছিল না।

ছোকরা ভাবলে, 'হা কপাল! আমি আবার কী অপরাধ করলাম যে আমার "পচ্ছেদি"টা শুদ্ধ কেড়ে নিচ্ছে?' গাড়িটা যখন ধুলো উড়িয়ে গাঁ থেকে বেরিয়ে গেল, তখনো ছোকরা এই এক প্রশ্নই শুধোচ্ছিল নিজেকে। গাঁয়ের সব্বাই জানে যে জায়গিরদারের এই কুকুরের দাম জোগাবার জন্য তাদের সবাইকে ভরতুকি দিতে হবে, কিন্তু এখন অন্তত টান-টান উত্তেজনাটা কমতে সবাই একটু স্বস্তি বোধ করলে। সত্যি-বলতে, জায়গিরদার চলে যেতেই তাদের ফ্যাকাশে মুখগুলো আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল আর বুকগুলোও বেশ স্বাভাবিকভাবে ধুকধুক করতে শুরু করে দিল! আধ ঘণ্টা পরেই জায়গিরদারের সাঙ্গোপাঙ্গরাও গ্রাম ছেড়ে চলে গেল।

রাস্তা পড়ে আছে জনহীন, থমথমে, মরা কুকুরগুলোর ছেঁড়াখোঁড়া শরীরগুলো দৃশ্যটাকে বিকট করে তুলেছে। সব কেমন চুপচাপ, শুধু কাকের ওড়াউড়ির শব্দ আর মুমূর্ষু কুকুরগুলোর গোঙানি স্তব্ধতাটাকেই কেমন যেন বাড়িয়ে তুলেছে। অদ্ভুত, ভয়াবহ, বুকচাপা একটা স্তব্ধতা ছেয়ে আছে গ্রামটাকে, ঠিক যেন মৃত্যুর স্তব্ধতা—যাকে সে ছোঁয় তাকেই সে ধ্বংস করে ফ্যালে।

ততক্ষণে গাঁয়ের ভাঙ্গি এসে হাজির হয়েছে; এমনভাবে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে যেন কোনো প্রেত ঘোরাফেরা করছে কবরখানায়; উদাসীনভাবে তার হুঁকোয় টান দিতে-দিতে কুকুরগুলো কখন মরে, তারই জন্য অপেক্ষা করছিল সে।

অনুবাদ : গৌতম হালদার

দেবতার জন্ম

শিবরাম চক্রবর্তী

বাড়ি থেকে বেরুতে গিয়ে প্রায়ই হোঁচট খাই। প্রথম পদক্ষেপেই পাথরটা তার অস্তিত্বের কথা প্রবলভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়। ক-দিন থেকেই ভাবছি কী করা যায়।

সেদিন বাড়ি থেকে বেরুবার আমার কিছুমাত্র ব্যস্ততা ছিল না, অন্তত অমন ক্ষিপ্রভাবে অকস্মাৎ ধাবিত হবো এমন অভিপ্রায় ছিল না আদৌ, কিন্তু পাথরটার সংঘর্ষ আমার গতিবেগকে সহসা এত দ্রুত ক'রে দিল যে অন্যদিক থেকে মোটর আসছে দেখেও আত্মসংবরণ করতে অক্ষম হলুম। কিন্তু কী ভাগ্যি, ড্রাইভারটা ছিল হুঁশিয়ার—তাই রক্ষে!

সেদিন থেকেই ভাবছি কী করা যায়। আমার জীবন-পথের মাঝখানে সামান্য একটুকরো পাথর যে এমন প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা দেবে কোনোদিন এরূপ কল্পনা করিনি। তাছাড়া ক্রমশই এটা জীবন-মরণের সমস্যা হ'য়ে উঠছে, কেননা ধাবমান মোটর চিরদিনই কিছু আমার পদস্খলনকে মার্জনার চোখে দেখবে এমন আমি আশা করতে পারি না।

তাই ভাবছি একটা হেস্তনেস্ত হোক : হয় ও থাকুক, নয় আমি। ও থাকলে আমি বেশি দিন থাকবো কিনা সন্দেহস্থল। তাই যখন আমার থাকাটাই, অন্তত আমার দিক থেকে, বেশি বাঞ্ছনীয়, তখন একদা প্রাতঃকালে একটা কোদাল জোগাড় ক'রে লেগে পড়তে হ'লো।

একটা বড়ো গোছের নুড়ি, ওর সামান্য অংশই রাস্তার ওপর মাথা উঁচু ক'রে ছিল। বহুক্ষণ পরিশ্রমের পর যখন সমূলে ওটাকে উৎপাটন করতে পেরেছি, তখন মাথার ঘাম মুছে দেখি আমার চারদিকে রীতিমতো জনতা। বেশ বুঝলাম এতক্ষণ এঁদেরই নীরব ও সরব সহানুভূতি আমার উদ্যমে উৎসাহ সঞ্চার করছিল।

তাঁদের সকলের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনারা কেউ চান এই পাথরটা?

জনতার মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল, কিন্তু কারু ঔৎসুক্য আছে কি নেই বোঝা গেল না। তাই আবার ঘোষণা করলাম—যদি দরকার থাকে নিতে পারেন। অনায়াসেই নিতে পারেন। আমার শ্রম তা হ'লে সার্থক বিবেচনা করবো এবং বলা বাহুল্য আমি সুখী হবো।

জনতার এক তরফ থেকে একজন এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে—এটা খুঁড়ছিলেন কেন ? কোনো স্বপ্ন পেয়েছেন নাকি ?

আমি লোকটার দিকে ঈষৎ তাকালাম, তারপর ঘাড় নেড়ে বললাম—না, যা ভাবছেন তা নয় ।

পাথরটাকে রাস্তার এক নিরাপদ কোণে স্থাপিত করলাম । কিন্তু আমার কথায় ওর যেন প্রত্যয় হ'লো না, কয়েকবার আপন মনে মাথা নেড়ে সে আবার প্রশ্ন করলে—সত্যি বলছেন পাননি ? কোনো প্রত্যাদেশ-টত্যাদেশ ?

—কিচ্ছু না !

ভদ্রলোকের উৎসাহকে একেবারে দমিয়ে দিয়ে ওপরে এসে মাকে বললাম দু-কাপ চা তৈরি করতে । আমার জন্যই দু-কাপ । পাথরটার সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে প্রায় প্রস্তরীভূত হ'য়ে পড়েছিলাম, বেশ পরিশ্রম হয়েছিল ।

এরপর প্রায়ই বাড়ি থেকে বেরুতে ও বেরিয়ে ফিরতে নুড়িটার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় ; অনেক সময় হয় না, যখন অন্যমনস্ক থাকি । এখন ওকে আমি সর্বান্তঃকরণে মার্জনা করতে পেরেছি, কেননা আমাকে পদচ্যুত করার ক্ষমতা ওর আর নেই । সে-দৈবশক্তি ওর লোপ পেয়েছে । আমাদের মধ্যে একরকম হৃদ্যতা জমেছে এখন বলা যেতে পারে । এমন সময়ে অকস্মাৎ একদিন দেখলাম নুড়িটার কান্তি ফিরেছে, ধুলোবালি মুছে গিয়ে দিব্য চাকচিক্য দেখা দিয়েছে । যারা সকালে-বিকালে হোস্‌পাইপে রাস্তার জল ছিটোয়, বোঝা গেল, তাদেরই কারু শুভদৃষ্টি এর ওপর পড়েছিল । ওর চেহারার উন্নতি দেখে সুখী হলাম ।

—ব্যাপার কী রকম বুঝছেন ?

হঠাৎ পেছন থেকে প্রশ্নাহত হ'য়ে ফিরে তাকালাম । সেদিনের সেই অনুসন্ধিৎসু ভদ্রলোক ।

জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি কি সেই থেকেই এখানে পাহারা দিচ্ছেন নাকি ? না, কোনো প্রত্যাদেশ পেলেন ?

—না, না, তা কেন ? এই পথেই আমার যাতায়াত কিনা !

ভদ্রলোক কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হন, কিন্তু অল্পক্ষণেই নিজেকে সামলে নিতে পারেন ।

—নুড়িটা দেখছি আছে ঠিক । কেউ নেবে না, কী বলেন ?

প্রশ্নটা এইভাবে করলে যেন যে-রকম দামি জিনিসটা পথে প'ড়ে আছে অমন আর ভূ-ভারতে পাওয়া যায় না এবং ওর গুপ্তশত্রুর দল ওটাকে আত্মসাৎ করবার মৎলবে ঘোরতর ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে ; ছোঁ মেরে লুফে নেবার জন্য হাত বাড়িয়ে

লোলুপ হ'য়ে রয়েছে। আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে জানালাম—আপনার যারা প্রতিদ্বন্দ্বী, সরকার বাহাদুর তাদের ভুল বুঝে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গিয়ে রাঁচীর অতিথিশালায় সযত্নে রেখে দিয়েছেন, একমাত্র আপনিই যখন ছাড়া আছেন তখন তো ভাবার কিছু দেখিনে।

সে একটু হেসে বললে—আপনার যেমন কথা! দেখছেন এদিকে কারা ওর পূজার্চনা ক'রে গেছে?

ভালো ক'রে নিরীক্ষণ করি : সত্যিই তো! ও-বেলা তো দেখিনি, এ-বেলার মধ্যেই কারা এসে পাথরটার সর্বাঙ্গে বেশ ক'রে সিঁদুর লেপে দিয়ে গেছে।

আমি আনন্দ প্রকাশ করলাম—ভালোই হয়েছে! এতদিনে তবু ওর আরেকটি সমঝদার জুটলো!

পাথরটার সমাদরে পুলকিত হবার কথা, কিন্তু লোকটিকে বেশ ঈর্ষান্বিত দেখা গেল। কপাল কুঁচকে সে বললে—সেই তো ভয়! সেই সমঝদার না ইতিমধ্যে ওটিকে সরিয়ে ফ্যালে।

পরদিন সকালে উঠে দেখি কোথাও পাথরটার চিহ্নমাত্র নেই। ওর এই আকস্মিক অন্তর্ধানে আশ্চর্য হলাম খুব। কে ওটাকে নিয়ে গেল, কোথায় নিয়ে গেল, ইত্যাকার নানাবিধ প্রশ্নের অভাবিত উদয় হ'লো, কিন্তু কোনো সঠিক সদুত্তর পাওয়া গেল না। পাথরটার অনুপস্থিতিতে এই পথ দিয়ে হরদম যাতায়াতকারী সেই লোকটি যে বেজায় রকম দ'মে যাবে অনুমান করা কঠিন নয়। এ-কথা ভেবে লোকটার জন্য সহানুভূতিই হ'লো; কিংবা—এ সেই তত্ত্বজিজ্ঞাসুরই কাজ কিনা কে জানে!

অনেকদিন পরে গলির মোড়ের অশথতলা দিয়ে আসছি—ও হরি! এখানে নুড়িটাকে নিয়ে এসেছে যে! নুড়ির স্থূল অঙ্গটা গাছের গোড়ায় এমনভাবে পুঁতেছে যে উপরের গোলাকার নিটোল মসৃণ উদ্ধত অংশ দেখে শিবলিঙ্গ ব'লে ওকে সন্দেহ হ'তে পারে। এই প্রয়োগনৈপুণ্য যার তাকে বাহাদুরি দিতে হবে। নুড়িটার চারি-দিকে ফুল বেলপাতা আতপচালের ছড়াছড়ি। সকালের দিকে এই পথে যে-সব পুণ্যলোভী গঙ্গাস্নানে যায় তারাই ফেরার পথে শস্তায় পারিলৌকিক পাথেয়-সঞ্চয়ের স্বর্ণ-সুযোগরূপে একে গ্রহণ করেছে সহজেই বোঝা গেল। যাই হোক, মহাসমা-রোহেই এখানে ইনি বিরাজ করছেন—অতঃপর এঁর সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কারু দুশ্চিন্তার আর কোনো কারণ নেই।

নুড়িটার পদোন্নতিতে আমি আন্তরিক খুশি হলাম। আমিই একদিন ওকে মুক্তি দিয়েছি, এখন সবাইকে ও মুক্তি বিতরণ করতে থাক—ওর গৌরব সে তো আমারই গৌরব। পৃথিবীর বুকে ওর জন্মদাতা আমি, এই জন্য মনে-মনে পিতৃত্বের একটা গর্ব অনুভব করলাম। এবং কায়মনোবাক্যে ওকে আশীর্বাদ করলাম।

সেই লোকটাকে তার দেবতার সন্ধান দেবো কিনা মাঝে-মাঝে ভেবেছি। পথে-ঘাটে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে, কিন্তু পাথরটার কথা ও আর পাড়ে না। পাথরটার পলায়নে ভেবেছিলাম ও মুহ্যমান হ'য়ে পড়বে, কিন্তু ওকে বরং প্রফুল্লই দেখেছি। এত বড়ো একটা বিচ্ছেদ-বেদনা যখন ও কাটিয়ে উঠতে পেরেছে তখন আর ওকে উতলা ক'রে কাজ নেই।

মাঝে-মাঝে অশথতলার পাশ দিয়েই বাড়ি ফিরি, লক্ষ করি, দিন-দিন নুড়িটার মর্যাদা বাড়ছে। একদিন দেখলাম গোটা-কত সন্ন্যাসী ওখানে আস্তানা গেড়েছে, গাঁজার গন্ধ ও বম্‌বম্‌ শব্দের ঠেলায় ওখান দিয়ে যাতায়াত ঘ্রাণ এবং কর্ণেন্দ্রিয়ের ওপরে দস্তুরমতো অত্যাচার। যখন সন্ন্যাসী জুটেছে তখন ভক্ত জুটতে দেরি হবে না এবং ভক্তির আতিশয্য অনতিবিলম্বেই ইট-কাঠের মূর্তি নিয়ে মন্দিররূপে অভ্রভেদী হ'য়ে দেখা দেবে। দেবতা তখন বিশেষভাবে বনেদী হবেন এবং সর্ব-সাধারণের কাছ থেকে তাঁর তরফে খাজনা আদায় করবার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েমী হ'য়ে দাঁড়াবে।

এব কিছুদিন পরেই একটা চিনির কলের ব্যাপারে কয়েক মাসের জন্য আমাকে চম্পারণ যেতে হ'লো। অশথতলার পাশ দিয়ে গেলেও চলে, ভাবলাম যাবার আগে দেবতার অবস্থাটা দেখে যাই। যা অনুমান করেছিলাম ঠিক তাই, সন্ন্যাসীর সমাগমে ভক্তের সমারোহ হয়েছে। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে ওদের আলাপ-আলোচনা অনুসরণে যা বুঝলাম তার মর্ম এই যে ইনি হচ্ছেন ত্রিলোকেশ্বর শিব, একেবারে পাতাল ফুড়ে উঠেছেন—এঁর তল নেই। অতএব এঁর উপযুক্ত সংবর্ধনা করতে হ'লে একটা মন্দির খাড়া করা চাই।

একবার বাসনা হ'লো, ত্রিলোকেশ্বর শিবের নিস্তলতার ইতিহাস সবাইকে ব'লে দিই, কিন্তু জীবন-বীমা করা ছিল না এবং ভক্তি কতটা ভয়াবহ হ'তে পারে জানতাম; আর তা'ছাড়া ট্রেনের বিলম্বও বেশি নেই—ইত্যাদি বিবেচনা ক'রে নিরস্ত হলাম। সেই লোকটাকে খবর না-দিয়ে দেখলাম ভালোই করেছি, কেননা যতদূর ধারণা হয়, নুড়িটাকে নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠা করাই তার স্বচেষ্টায় অভিরুচি

ছিল, কিন্তু ইনি যে ভক্তের তোয়াক্কা না-রেখেই স্বকীয় প্রতিভাবলে এবং ইতি-মধ্যেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয়েছেন, এই সংবাদে সে পুলকিত কিংবা মর্মাহত কী হ'তো বলা কঠিন।

কয়েক মাস পরে যখন ফিরলাম তখন অশথতলার মোড়কে আর চেনাই যায় না। ছোটোখাটো একটা মন্দির উঠেছে, শঙ্খ-ঘণ্টার আর্তনাদে কান পাতা দায় এবং ভক্তের ভিড় ঠেলে চলা দুষ্কর। কিন্তু সে-কথা বলছি না, সবচেয়ে বিস্মিত হলাম সেই সঙ্গে আরেকজনের আবির্ভাব, কেবলমাত্র আবির্ভাব নয়, কলেবর পরি-বর্তন পর্যন্ত দেখে। মন্দিরের চত্বরে সেই লোকটা—প্রথমতম, সেই আদি ও অকৃত্রিম, উপাসক! গেরুয়া, তিলক এবং রুদ্রাক্ষের অন্তরালে তাকে আর চেনাই যায় না!

—এ কী ব্যাপার?

আমিই গায়ে প'ড়ে প্রশ্ন করি।

—আজ্ঞে, এই দীনই শিবের সেবায়েৎ।

লোকটি বিনীতভাবে জবাব দেয়।

—তা তো দেখতেই পাচ্ছি। দিব্যি বিনি পুঁজির ব্যাবসা ফাঁদা হয়েছে! এই জন্যেই বুঝি পাথরটার ওপর অত ক'রে নজর রাখা হচ্ছিল?

শিলাখণ্ডের প্রতি ওর প্রীতিশীলতা যে অহেতুক এবং একেবারেই নিঃস্বার্থ ছিল না, এটা জেনেই বোধ করি অকস্মাৎ ওর ওপর দারুণ রাগ হ'য়ে যায়, ভারি রূঢ় হ'য়ে পড়ি।

কানে আঙুল দিয়ে সে বললে—অমন বলবেন না। পাথর কী মশাই? শ্রীবিষ্ণু! সাক্ষাৎ দেবতা যে! ত্রিলোকেশ্বর শিব!

সে উদ্দেশ্যে নমস্কার জানায়।

আমি হেসে ফেললাম—ওর তল নেই, না?

এবার সে একটু কুণ্ঠিত হয়—সবাই তো তা-ই বলে।

—তুমি নিজে কী বলো? ওরা তো বলে নিচে যত খুঁড়ে যাও না কেন টিউব-নলের মতো ওই শিবলিঙ্গ বরাবর নেমে গেছে। কিন্তু তোমার কী মনে হয়?

—কী জানি! তা-ই হয়তো হবে।

—কতদূর শিকড় নেবেছে খুঁজে দ্যাখোই না কেন একদিন?

জিভ কেটে লোকটা বললে—ও-সব কথা কেন? ওতে অপরাধ হয়। বাবা আমাদের জাগ্রত।

—বটে? কী রকম জাগ্রত শুনি?

—এই ধরুন না কেন! এবার তো কলকাতায় দারুণ বসন্ত, টিকে নিয়ে কিছু ক'রেই কিছু হচ্ছে না—

—অ্যাঁ, বলো কী? মহামারী নাকি, জানতাম না তো!

—খবরের কাগজেই দেখবেন কী-রকম লোক মরছে। কর্পোরেশন থেকে টিকে দেবার ক্রটি নেই অথচ প্রত্যেক ওয়ার্ডেই—। কিন্তু আমাদের পাড়ায় এ-পর্যন্ত কারু হয়নি দেবতার কৃপায়, আমরা কেউ টিকেও নিইনি, কেবল বাবার চন্নামৃত খেয়েছি। এ যদি জাগ্রত না-হয় তবে জাগ্রত আপনি কাকে বলেন?

এর কী জবাব দেবো তা চিন্তা করবার সময় ছিল না। আগে একবার এই রোগে যা কষ্ট পেয়েছিলাম এবং যা ক'রে বেঁচেছিলাম তাতে বাবা ত্রিলোকনাথের মহিমার ব্যাখ্যা তখন আমার মাথায় উঠেছে।—'আমি এখন চললুম। আমাকে এক্ষুনি টিকে নিতে হবে। আরেকদিন এসে গল্প করবো।'—ব'লে আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না-ক'রে মেডিকেল কলেজের অভিমুখে ধাবিত হলাম।

পথে জনৈক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। গতি রোধ ক'রে সে বললে—আরে, কোথায় চলেছো এমন হন্তে হ'য়ে?

—টিকে নিতে।

—টিকে নিয়ে তো ছাই হচ্ছে। টিকেতে কিস্সু হয় না। তুমি বরং ভেরি-ওলিনাম টু-হানড্রেড এক ডোজ খাওগে, কিং কোম্পানি থেকে। পরের হপ্তায় আরেক ডোজ, তারপরে আরেক—ব্যস, নিশ্চিন্দি। টিকে ফেল করেছে আখছার দেখা যায়. কিন্তু ভেরিওলিনাম—নেভার!

—বলো কী? জানতাম না তো।

—জানবে কোত্থেকে? কেবল ফোঁড়াফুঁড়ি এই তো জেনেছো। অন্য-কিছুতে কি আর তোমাদের বিশ্বাস আছে? আমি হোমিওপ্যাথি প্র্যাক্‌টিস ধরেছি, আমি জানি।

—বেশ, তাই খাচ্ছি তবে।

কিং কোম্পানিতে গিয়ে এক ডোজ দুশো শক্তি ভেরিওলিনাম গলাধঃকরণ করলাম। যাক, এতক্ষণে অনেকটা স্বচ্ছন্দ হওয়া গেল।

একটু পরেই পথ দিয়ে উপরোউপরি কয়েকটা শবযাত্রা গেল—নিশ্চয়ই এরা বসন্ত রোগেই মরেছে? কী সর্বনাশ, ভাবতেও গা শিউরে ওঠে, ওদের থেকে এইভাবে কত লক্ষ-লক্ষই না বীজাণু আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। ভেরি-

গুলিনাম রক্তে পৌঁছতে না-পৌঁছতেই এতক্ষণে এইসব মারাত্মক রোগাণুর কাজ শুরু হ'য়ে গেছে নিশ্চয় ! হাত-পা শিটিয়ে আমার সমস্ত শরীর অবসন্ন হ'য়ে এলো —এই বিপদ-সংকুল বাতাসের নিশ্বাস নিতেও আমার কষ্ট হচ্ছিল।

অতি সংক্ষিপ্ত এক টুকরো প্রাচীরপত্রে প্রসিদ্ধ বসন্ত চিকিৎসক কে-এক কবিরাজের নাম দেখলাম। হোমিওপ্যাথি করা গেছে, কবিরাজিই বা বাকি থাকে কেন—যে-উপায়েই হোক সবার আগে আত্মরক্ষা। বিজ্ঞাপিত ঠিকানায় পৌঁছতেই দেখলাম কয়েকজনে মিলে খুব ধুমধাম সহকারে একটা প্রকাণ্ড শিলে কী যেন বাঁটছে। কবিরাজকে আমার অবস্থা বলতেই তিনি আঙুল দেখিয়ে বললেন—ওই যে বাঁটা হচ্ছে। কণ্টিকারির শেকড়—বেঁটে খেতে হয়। ওর মতো বসন্তের অব্যর্থ প্রতিষেধক আর নেই মশাই ?

ব্যবস্থামতো তাই একতাল খেয়ে একটা রিক্সা ডেকে উঠে বসলাম। শরীরে যেন জোর পাচ্ছিলাম না। মাথাটা ঝিমঝিম করছিল, জ্বর-জ্বর ভাব—বসন্তের আগে নাকি এই রকমই হয়। বাড়ি ফিরে মাকে বললাম—আজ আর কিছু খাবো না, মা। দেহটা ভালো নয়।

উদ্বিগ্ন মুখে মা বললেন—কী হয়েছে তোর ?

—হয়নি কিছু। বোধহয় হবে ! বসন্ত।

—বালাই ষাট। তা কেন হ'তে যাবে ? এই হর্তুকির টুকরোটা হাতে বাঁধ দিকি। আমি তিরিশ বছর ধ'রে বাঁধছি, কত বসন্ত রোগীই তো সেবা করলাম, এরই জোরে বলতে নেই হাম পর্যন্ত—। নে, ধর এটা তুই।

মা তাঁর হাতের তাগাটা খুলে দিলেন।

—তিরিশ বছরে একবারও হয়নি তোমার ? বলো কী ? দাও, দাও তবে। এতক্ষণ বলোনি কেন ? এই এক টুকরোয় কী হবে ? রোগ যে অনেকটা এগিয়ে এসেছে। আমাকে আস্ত একটা হর্তুকি দাও, যদি তাতে আটকায়।

হর্তুকি তো বাঁধলুম, কিন্তু বিকেলের দিকে শরীরটা বেশ যেন জ্বরজড়িত মনে হ'লো। আয়না নিয়ে ভালো ক'রে নিরীক্ষণ করলাম, মুখেও যেন দু-একটা ফুশকুড়ির মতো দেখা দিয়েছে। নিশ্চয়ই বসন্ত, আর তবে বাঁচন নেই। মাকে ডেকে দেখালাম।

মা বললেন—মার অনুগ্রহ না, ও ব্রণ।

আমি বললাম—উঁহু। ব্রণ নয়, নিতান্তই মার অনুগ্রহ।

মা বললেন—অলুক্ষুণে কথা মুখে আনিসনে। ও কিছু না। সমস্ত দিন ঘরে ব'সে আছিস, একটু বাইরে থেকে বেড়িয়ে আয় গে।

এ-রকম দারুণ ভাবনা মাথায় নিয়ে কি বেড়াতে ভালো লাগে? লোকটা বলছিল ওরা সবাই চরণামৃত খেয়ে নিরাপদ রয়েছে। আমিও তাই খাবো নাকি? হয়তো চন্নামৃতের বীজাণুধ্বংসক কোনো ক্ষমতা আছে, কে বলতে পারে? হ্যাঃ, ওর যেমন কথা! ওটা স্রেফ অ্যাকসিডেন্ট—কলকাতার সব বাড়িতেই কিছু আর অসুখ হচ্ছে না! তাছাড়া মনের জোরে রোগ প্রতিরোধের শক্তি জন্মায়, সেটাও ওদের পক্ষে একটা সহায়—কিন্তু ওই যৎসামান্য পাথরটাকে দেবতাজ্ঞান করবার বিশ্বাসের জোর আমি পাবো কোথায়?

এ-সব যা-তা ব্যবস্থা না-ক'রে সকালে টিকে নেওয়াই উচিত ছিল, হয়তো তাতে আটকাত। এখুনি গিয়ে টিকেটা নিয়ে ফেলবো নাকি? টিকে নিলে শুনেছি বসন্ত মারাত্মক হয় না, বড়ো জোর হাম হ'য়ে দাঁড়ায়, আর হামে তেমন ভয়ের কিছু নেই—ও তো শিশুদের হামেশাই হচ্ছে। নাঃ, যাই মেডিকেল কলেজের দিকেই।

টিকে নিয়ে অশথতলার পাশ দিয়ে ফিরতে লোকটার সকাবেলার কথাগুলো মনে পড়লো। ঠিকই বলেছে সে! সত্যিই, এক জায়গায় গিয়ে আর কোনো জবাব নেই, সেখানে রহস্যের কাছে মাথা নোয়াতেই হয়। এই তো আজ বেঁচে আছি, কিন্তু কাল যদি বসন্তে মারা যাই তখন কোথায় যাবো? শেক্সপীয়ারের সেই কথাটা—না, একেবারে ফ্যালনা নয়। এই পৃথিবীর, এই জীবনের, সুদূর নক্ষত্রলোক এবং তার বাইরেও বিস্তৃত অনন্ত জগতের কতটুকু জানি আমরা? ক-টা ব্যাপারেরই বা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে পারি? যতই বিজ্ঞানের দোহাই পাড়ি না কেন, শেষে সেই অজ্ঞাতের সীমান্তে এসে চুপ ক'রে দাঁড়াতেই হয়।

মন্দিরের সম্মুখ দিয়ে আসতে-আসতে ত্রিলোকনাথের উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ জানালাম। মনে-মনে প্রার্থনা করলাম, বাবা, মূঢ়তা মার্জনা করো, মহামারীর কবল থেকে বাঁচাও আমাকে এ-যাত্রা।

খানিক দূর এগিয়ে এসে আবার ফিরলাম। নাঃ, দেবতাকে ফাঁকি দেওয়া কিছু নয়। মুখের ফুশকুড়িগুলো হাত দিয়ে অনুভব করলাম। এগুলো ব্রণ, না বসন্ত?

এবার মাটিতে লুটিয়ে প্রণাম করলাম। বললাম—জয় বাবা ত্রিলোকনাথ! রক্ষা করো, বাবা!

উঠে দাঁড়িয়ে চারিদিক দেখলাম—কেউ দেখতে পায়নি তো?

পেশোয়ার এক্সপ্রেস

কৃষণ চন্দর

যখন পেশোয়ার স্টেশন ছেড়ে আসি তখন আমি তৃপ্তিতে এক দলা ধোঁয়া উগরে তুলেছিলাম। আমার খোপে-খোপে ছিল সব হিন্দু ও শিখ শরণার্থীরা। তারা এসেছিল পেশোয়ার, হটিমর্দন, কোহাট, চরসরা, খাইবার, লাণ্ডি কোটাল, বান্নু, নওশেরা, মানশেরা ইত্যাদি সীমান্ত প্রদেশের সব জায়গা থেকে। স্টেশনটা খুব সুরক্ষিত ছিল এবং সেনাবাহিনীর অফিসারেরাও খুব সজাগ ও দক্ষ ছিলেন। তবে, যতক্ষণ-না সেই রোমাণ্টিক পঞ্চনদীর দেশেব দিকে আমি রওনা দিচ্ছিলাম, তারা অস্বস্তিতেই ভুগছিল। অন্য আর পাঁচজন পাঠানের থেকে অবশ্য এই শরণার্থীদের তফাত করা যাচ্ছিল না। তাদের চেহারা ছিল বেশ লম্বা ও সুদর্শন, শক্ত গড়নের হাত-পা, পরনে ছিল কুল্লা ও লুঙ্গি, কারো-বা শালোয়ার, তাদের ভাষা ছিল গাঁয়ের পুশতু। প্রত্যেক খোপে দুজন ক'রে বালুচি সেপাই খাড়া পাহারায় ছিল। রাইফেল হাতে তারা একটু ক'রে হাসি বিলিয়ে যাচ্ছিল হিন্দু পাঠানদের ও তাদের বৌ-বাচ্চাদের দিকে, যারা তাদের হাজার-হাজার বছরের বসবাসের ভূমি ছেড়ে পালাচ্ছিল। এই পাহাড়ি জমি তাদের শক্তি জুগিয়েছে, তার তুষার-ঝরনা তাদের তৃষ্ণা মিটিয়েছে, এবং এই ভূমির রোদ-ঝলমল বাগান থেকে তোলা মিষ্টি আঙুরের স্বাদে ভ'রে গেছে তাদের প্রাণ। হঠাৎ একদিন এই দেশ-গাঁ তাদের কাছে অপরিচিত হয়ে গেল; শরণার্থীরা, সম্ভবত অনিচ্ছুক ভাবেই, পাড়ি দিল গরম ক্রান্তিদেশীয় সমভূমির এক নূতন দেশে। ঈশ্বরের কাছে তারা কৃতজ্ঞ যে তাদের প্রাণ, ধনসম্পত্তি, ও মেয়েদের ইজ্জত কোনোরকমে বাঁচিয়ে নিয়ে আসতে পেরেছে। কিন্তু রাগে ও দুঃখে হৃদয়ে তাদের রক্তক্ষরণ হচ্ছিল যেন, আর তাদের চোখ যেন সাতপুরুষের ভিটের ঐ গ্র্যানাইট বুকের মধ্যে গর্ত ক'রে খুঁড়ে চ'লে গিয়ে অভিযোগে প্রশ্ন তুলছিল: 'মা, মাগো, নিজের সন্তানদের কেন এভাবে ফিরিয়ে দিলে? কেন তোমার বুকের উষ্ণ আশ্রয় থেকে নিজের মেয়েদের বঞ্চিত করলে? এইসব নিষ্পাপ কুমারীরা, যারা তোমার অঙ্গে আঙুরলতার মতো জড়িয়েছিল, কেন হঠাৎ তাদের টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিলে? মা, মাগো, কেন মা?'

উপত্যকার মধ্য দিয়ে আমি দ্রুত ছুটছিলাম, আর আমার গাড়িগুলোর মধ্য থেকে এই ক্যারাভানের দল সতৃষ্ণ বিষণ্ণ চোখ মেলে দেখে নিচ্ছিল বিলীয়মান

মালভূমি, ছোটোবড়ো উপত্যকা ও তিরতির ক'রে ব'য়ে-যাওয়া আঁকাবাঁকা ছোটো নদী। ঝাপসা চোখের জলে শেষবারের মতো বিদায় জানাচ্ছে যেন। প্রতিটি কোণা-খাঁজড়ে যেন ওদের চোখ সেঁটে-সেঁটে যাচ্ছে, চ'লে যাবার সময়ে বুকের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে যাবে যেন; আমারও কেমন যেন মনে হ'লো আমার চাকাগুলো বোধহয় ভারি হ'য়ে উঠেছে, দুঃখে ও লজ্জায় যেন আটকে যাচ্ছে তারা, আর যেন ছোটবার শক্তি নেই আমার, আমি বোধহয় থেমেই পড়বো এবার।

হাসান আবদাল স্টেশনে আরো শরণার্থীরা এলো। ওরা শিখ, পাঞ্জা সাহেব থেকে আসছে, সঙ্গে লম্বা কৃপাণ, ভয়ে মুখ ওদের পাঁশুটে; বড়ো-বড়ো ডাগর চোখের বাচ্চাগুলো পর্যন্ত যেন এক নাম-না-জানা ভয়ে সিঁটিয়ে রয়েছে। ওরা স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আমার খোপে ঢুকে পড়ল। এর ঘর-বাড়ি সব গেছে, ওকে পালিয়ে আসতে হয়েছে পরনের শালোয়ার-কামিজ মাত্র সম্বল ক'রে; আর একজনের পায়ে কোনো জুতো নেই, ওই কোণার লোকটি এতটাই ভাগ্যবান যে সে তার সবকিছুই নিয়ে আসতে পেরেছে, মায় তার ভাঙা কাঠের তক্তপোশটা পর্যন্ত! যার সবকিছু গেছে সে ব'সে আছে শান্ত, চুপচাপ, গুম হ'য়ে, অন্যজন যে-কিনা সারাজীবনে একটা পিঠের টুকরোও জোটাতে পারেনি সেও তার হারানো লাখ টাকার গল্প বলছে, আর নেড়েদের শাপশাপান্ত করছে। বালুচি সেনারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে মৃদু-মৃদু হাসছে।

তক্ষশিলায় আমাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'লো। আমার গার্ডসাহেব স্টেশনমাস্টারকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, 'আশপাশের গ্রাম থেকে একদল হিন্দু শরণার্থীরা আসছে। তাদের জন্য এই ট্রেনটাকে অপেক্ষা করতেই হবে।' এক ঘণ্টা কেটে গেল। আমার গাড়ির মধ্যেকার লোকজনেরা তাদের পোঁটলা-পুঁটলি খুললো এবং পালিয়ে আসার সময়ে যৎসামান্য যে যা আনতে পেরেছিল তাই খেতে আরম্ভ করল। বাচ্চারা হৈ-হল্লা করছিল আর তরুণী মেয়েরা শান্ত গভীর চোখে তাকিয়ে ছিল জানলার বাইরের দিকে। হঠাৎ দূরে ঢাকের আওয়াজ শোনা গেল। হিন্দু শরণার্থীদের এক জাঠ এদিকেই আসছে। জাঠ আরো কাছে এগিয়ে এল, স্লোগান দিতে দিতে। আরো কিছু সময় কাটল। এবারে দলটা স্টেশনের একেবারে কাছে এসে পড়ল। ঢাকের আওয়াজ আরো জোর হ'লো আর এক ঝাঁক গুলিগোল্লার আওয়াজ কানে গেল। ঐ তরুণী মেয়েরা ভয়ে জানলা থেকে স'রে গেল। এই দলটা ছিল হিন্দু শরণার্থীদের এক জাঠ—প্রতিবেশী মুসলমানদের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে যাদের নিয়ে আসা হয়েছে। প্রতিটি মুসলমানের কাঁধের ওপরে

ঝোলানো রয়েছে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করা এক-একজন কাফেরের মৃতদেহ। এ-রকম মৃতদেহের সংখ্যা ছিল দুশো এবং অত্যন্ত নিরাপদে তাদের স্টেশনে এনে বালুচি রক্ষকদের হাতে দিয়ে দেয়া হ'লো। মুসলমান জনতা চাপ দিল যে, এই মৃত হিন্দু শরণার্থীদের যথোচিত সম্মানের সঙ্গে হিন্দুস্তানের গেট পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে। বালুচি সৈন্যরা নিজেদের কাঁধে এই পবিত্র দায়িত্ব তুলে নিল, এবং প্রত্যেক গাড়ির মধ্যিখানে কয়েকটা ক'রে মৃতদেহ রাখা হ'লো। তারপর মুসলমান জনতা আকাশের দিকে তাক ক'রে গুলির আওয়াজ করল ও স্টেশনমাস্টারকে আদেশ দিল আমাকে প্ল্যাটফর্ম থেকে ছেড়ে দেবার জন্য। আমি সবেমাত্র চলতে শুরু করেছি এমন সময়ে কেউ চেন টেনে আমাকে থামিয়ে ফেলল। তারপর মুসলমান জনতার দলপতি একটা গাড়ির কাছে এগিয়ে এসে বললেন যে, ঐ দুশো-জন শরণার্থীর চ'লে যাওয়ায় তাঁদের গ্রাম তো গোল্লায় যাবে, ফলে ওঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ট্রেনের থেকে দুশোজন হিন্দু ও শিখ নামিয়ে নিতে হবে; যাই হোক না কেন, দেশের জনশক্তির ক্ষতিপূরণ করতেই হবে। বালুচি সৈন্যরা দেশপ্রেমের জন্য উচ্চকণ্ঠে তাঁদের জয়গান করল, এবং বিভিন্ন বগি থেকে দুশোজন শরণার্থীকে বেছে নিয়ে জনতার হাতে তুলে দিল।

'সব কাফেররা সার দিয়ে দাঁড়াও!' ওদের নেতা হুঙ্কার দিল; ঐ নেতাটি আশপাশেব গ্রামের এক শাঁসালো সামন্তপ্রভু। শরণার্থীরা পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল, ম'রে জ'মে গেছে যেন। জনতা কোনোমতে ওদের একটা সারি ক'বে দাঁড় করিয়ে দিল। দুশো লোক ··দুশো জীবন্ত মৃতদেহ···নগ্ন ভয়ে মুখগুলো সব নীল ···চোখের তারায় বৃষ্টির মতো ঝ'রে পড়ছে রক্তলোলুপ তীর···

বালুচি সৈন্যরাই শুরু করল।

পনেরো জন শরণার্থী টলমল পায়ে শ্বাস টানতে-টানতে ম'রে প'ড়ে গেল।

এই জায়গাটা ছিল তক্ষশিলা।

আরো কুড়িজন পড়ল।

এখানেই ছিল এশিয়ার মহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে হাজার-হাজার বছর ধ'রে লক্ষ-লক্ষ ছাত্রেরা মানুষের সভ্যতা বিষয়ে তাদের প্রথম পাঠ নিয়েছে।

আরো পঞ্চাশজন মুখ থুবড়ে পড়ল ম'রে।

তক্ষশিলার জাদুঘরে সুন্দর-সুন্দর মূর্তি ছিল, ছিল অলংকারের অতুলনীয় কারুকৃতি, দুর্লভ শিল্প ও ভাস্কর্যের নিদর্শন, আমাদের গর্বের সভ্যতার ছোটো-ছোটো উজ্জ্বল সব দীপশিখা।

তবুও আরো পঞ্চাশটি প্রাণ পৃথিবী ছেড়ে চ'লে গেল।

এ-সবের প্রেক্ষাপটে ছিল সিরকপের রাজপ্রাসাদ, খেলাধুলাব জন্য এক বিরাট অ্যাম্ফিথিয়েটার আর তারো পেছনে অনেক মাইল জুড়ে একদা-গৌরবান্বিত ও মহান এক নগরীর ধ্বংসাবশেষ।

আরো তিবিশজন মৃত।

এখানে রাজত্ব করতেন কণিষ্ক। ওঁর রাজত্বে প্রজাদের ছিল শান্তি, সমৃদ্ধি আর এক সাধাবণ ভ্রাতৃত্বেব বোধ।

তারা আরো কুড়িজনকে মেরে ফেলল।

এই গ্রামগুলোতেই একদিন বুদ্ধের সেই মহান সংগীতের গুঞ্জন শোনা যেত। ভিক্ষুরা এখানেই ভেবেছিলেন প্রেমের আর সত্যের আর সৌন্দর্যেব কথা আর এক নতুন ধাঁচের জীবনের কথা।

এবং এখন সেই দুশো জনের শেষ কয়েকজন মাত্র তাদের অন্তিম লগ্নের জন্য অপেক্ষা করছে।

ইসলামের বাঁকা চাঁদ প্রথম এখানকার দিগন্তেই তাব আলো দিয়েছিল, সাম্যের, ভ্রাতৃত্বের ও মানবিকতাব প্রতীক ··

সবাই এখন মৃত। আল্লা-হো-আকবব!

প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে রক্তের ধাবা গডিয়ে গেল, এবং এত কাণ্ডের পরে যখন আমি আবাব রওনা দিলাম আমার মনে হ'লো যে, এমনকী আমার নিচেকার লোহার চাকাগুলো পর্যন্ত যেন পিছলে-পিছলে যাচ্ছে।

মৃত্যু স্পর্শ করেছে আমার সবকটা গাড়িকেই। মৃতদেব শোযানো হয়েছিল মাঝখানে, আর চারপাশ ঘিরে ছিল জীবন্ত মৃতেরা। কোথাও একটা বাচ্চা কেঁদে উঠল; কোনো-এক কোণে কারো মা ফোঁপাতে লাগলেন; এক স্ত্রী তার মৃত স্বামীর দেহ আঁকড়ে ছিল। আমি দৌড় লাগালাম ভয়ে আর ত্রাসে এবং রাওয়াল-পিণ্ডি স্টেশনে এসে পৌঁছলাম।

এখানে আমাদের জন্য কোনো শরণার্থী অপেক্ষা করছিল না। কেবল জনা কুড়ি পর্দানশীন মহিলাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে কয়েকজন মুসলমান যুবক আমার একটা গাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল। যুবকদের সঙ্গে ছিল রাইফেল, তারা সঙ্গে ক'রে অনেক বাক্স গোলাবারুদও এনেছিল। তারা আমাকে ঝিলম ও গুজর খাঁর মাঝখানে থামিয়ে দিল এবং নিজেরা নামতে লাগল। হঠাৎ সঙ্গের মহিলারা তাদের পর্দা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে চীৎকার করতে আরম্ভ করল, 'আমরা হিন্দু, আমরা শিখ, ওরা জোর

ক'রে আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে।' যুবকেরা হেসে উঠল, 'হ্যাঁ, ওদের আরামের ঘর থেকে জোর ক'রেই ওদের এনেছি,' ওরা বলল। 'ওরা তো আমাদের লুঠের ধন। সেরকমই সদ্ব্যবহার করা হবে এদের। কে বাধা দেয় দেখি?'

দুজন হিন্দু পাঠান ওদের উদ্ধারের জন্য লাফ দিল। বালুচি সৈন্যরা ঠাণ্ডা মাথায় ওদের শেষ ক'রে দিল। তারপর আরো কয়েকজন আবারো চেষ্টা করল। তাদেরও কয়েক মিনিটের মধ্যে খতম করা হ'লো। তারপর ঐ তরুণী মেয়েদের টানতে-টানতে কাছের এক বনের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হ'লো, আর আমি কালো ধোঁয়ায় নিজের মুখ আড়াল করলাম এবং ঐ জায়গা থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেলাম। মনে হ'লো আমার লোহার ফুশফুশ বোধহয় ফেটে যাবে, আর আমার মধ্যেকার লাল গনগনে আগুনের শিখা যেন গিলে ফেলবে এই বিরাট ঘন অরণ্যকে, যা আমাদের লজ্জার সাক্ষী হ'য়ে রইল।

আমি লালা মুসার কাছাকাছি আসতে-আসতে মৃতদেহের দুর্গন্ধ এতটাই বাড়তে থাকল সে, বালুচি সৈন্যরা ঠিক করলো ওগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হবে। ফেলে দেবার পদ্ধতিটাও তারা চটপট বানিয়ে ফেলতে পারল। যাদের মুখটা দেখতে ওদের পছন্দ হচ্ছে না এ-রকম একজনকে আদেশ করা হবে একটা মৃতদেহ গাড়ির দরজার কাছে আনতে, আর তারপরে সে দরজার কাছে এলে মৃতদেহ শুদ্ধ তাকে ফেলে দেয়া হবে।

লালা মুসা থেকে আমি এলাম ওয়াজিরাবাদে। ওয়াজিরাবাদ হলো পাঞ্জাবের এক অতি পরিচিত শহর। সারা ভারতের হিন্দুরা ও মুসলমানেরা যে ছুরি-ছোরা দিয়ে পরস্পরকে হত্যা করে তা এই ওয়াজিরাবাদ থেকেই রপ্তানি করা হয়। ওয়াজিরাবাদ অবশ্য খুব বড়ো বৈশাখী উৎসবের জন্যও বিখ্যাত। এই বৈশাখীতে হিন্দু ও মুসলমানেরা নবান্নের উৎসবে মিলিত হন। তবে, আমি যখন ওয়াজিরাবাদে পৌঁছলাম তখন সেখানে দেখলাম শুধু শবদেহের মেলা। অনেক দূরে, ধোঁয়ার এক ঘন আস্তরণ শহরের ওপরে ছেয়ে ছিল, আর স্টেশনের কাছে শোনা যাচ্ছিল কাঁসর ঘণ্টার ধ্বনি, উচ্চকিত হাসির রোল আর মত্ত জনতার উদ্দাম করতালি। এ নিশ্চয়ই বৈশাখী উৎসব। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে জনতার ভিড় প্ল্যাটফর্মের দিকে এগিয়ে এল, একদল উলঙ্গ স্ত্রীলোককে ঘিরে নাচতে-নাচতে ও গান গাইতে-গাইতে। হ্যাঁ, তারা ছিল সম্পূর্ণ উলঙ্গ। তাদের মধ্যে ছিল বৃদ্ধা ও তরুণী, ছিল বাচ্চারা, নগ্নতা নিয়ে যাদের কোনো ভয় ছিল না। ছিলেন দিদিমা ও নাৎনি, ছিলেন মায়েরা ও বোনেরা আর মেয়েরা ও স্ত্রীরা, এবং কুমারীরা; এবং ওঁদের

চারপাশ ঘিরে ঐ পুরুষেরা নাচছে ও গাইছে। মেয়েরা সব হিন্দু ও শিখ আর পুরুষেরা মুসলমান এবং তিন সম্প্রদায় মিলেই যেন এক বিচিত্র বৈশাখী উৎসব পালনের জন্য তারা মিলিত হয়েছিল। মেয়েরা সোজা হ'য়ে হেঁটে চলল। তাদের চুল অবিন্যস্ত, শরীর বেইজ্জতে উলঙ্গ, কিন্তু তবুও তারা সোজা হ'য়ে সগর্বে হেঁটে চলল যেন হাজার শাড়িতে তাদের শরীর জড়ানো, যেন কালো করুণামেদুর মৃত্যুর ঘন ছায়ায় তাদের আত্মা আবৃত। তাদের চোখে নেই কোনো ঘৃণার প্রকাশ। লক্ষ-লক্ষ সীতার অকলঙ্ক অহংকারে তাদের চোখ জ্বলছে।

তাদের চারপাশ ঘিরে ঐ জনতার ঢেউয়ের চীৎকার ধ্বনি, 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ! ইস্‌লাম জিন্দাবাদ !! কায়েদ-ই-আজম মহম্মদ আলি জিন্না জিন্দাবাদ !!!'

নাচ-গানের এই হল্লা পেছিয়ে স'রে গেল এবং এই বিচিত্র শোভাযাত্রা এখন সরাসরি গাড়ির মধ্যে জড়ো-করা ঐ শরণার্থীদের ঠিক চোখের সামনে। মেয়েরা নিচু হ'য়ে আঁচলে তাদেব মুখ লুকোলো আর পুরুষেরা গাড়ির জানলা বন্ধ করতে লাগল।

'জানলা বন্ধ কোরো না!' বালুচিরা গ'র্জে উঠল। 'টাটকা হাওয়া ঢুকতে দাও।'

কিন্তু ওরা গ্রাহ্য করল না। জানলাগুলো ওরা বন্ধ ক'রে চলল।

সৈন্যরা গুলি চালাল। কয়েকজন শরণার্থী ম'রে প'ড়ে গেল; অন্যেরা তাদের জায়গা নিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যে আর কোনো জানলাই বন্ধ রইল না।

ঐ উলঙ্গ স্ত্রীলোকদের বলা হ'লো আমার ভেতরে উঠতে আর শরণার্থীদের মধ্যে ব'সে পড়তে, আর তারপর তারা 'ইসলাম জিন্দাবাদ', ও 'কায়েদ-ই-আজম মহম্মদ আলি জিন্না জিন্দাবাদ' চারপাশের এইসব মত্ত ধ্বনির মধ্যে আমাকে সহৃদয় বিদায় জানাল।

রোগা টিংটিঙে একটা ছোটো বাচ্চা আস্তে-আস্তে একজন বৃদ্ধা নগ্ন স্ত্রীলোকের দিকে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'মা, তুমি কি এইমাত্র স্নান করেছ?'

'হ্যাঁ, বাবা, আজ আমার দেশের ছেলেরা, আমার নিজের ভাইয়েরা আমাকে স্নান করিয়েছে।'

'তাহ'লে, তোমার জামা-কাপড় কই, মা?'

'আমার বৈধব্যের রক্তে ঐ কাপড়ে দাগ লেগেছিল, বাবা! তাই আমার ভাইয়েরা সে-কাপড় নিয়ে নিয়েছে।'

আমি যখন দৌড়ুচ্ছি তখন দুই উলঙ্গ তরুণী মেয়ে আমার গাড়ির দরজা দিয়ে লাফ দিল, আমি ভয়ে চীৎকার ক'রে উঠলাম এবং রাত্রির মধ্যে দৌড়ে পালাতে লাগলাম যতক্ষণ-না লাহোর পৌঁছলাম।

লাহোরে আমি এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসে থামলাম। আমার ঠিক উল্টোদিকে দু-নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছিল অমৃতসর থেকে আসা একটা ট্রেন, পূর্ব পাঞ্জাব থেকে মুসলমান শরণার্থীদের ব'য়ে আনছে। কিছুক্ষণের মধ্যে মুসলমান রক্ষীরা আমার গাড়িগুলোতে শরণার্থীদের মধ্যে তল্লাশ চালালো। সমস্ত টাকা-পয়সা, গয়নাগাঁটি ও অন্যান্য মূল্যবান যা-কিছু সব তারা নিয়ে গেল। তারপর ওরা চারশো শরণার্থীকে নির্বাচন করল তুরন্ত হত্যার জন্য। ব্যাপারটা দাঁড়ালো এই রকম: মুসলমান শরণার্থী ব'য়ে-আনা ঐ অমৃতসরের ট্রেনটাকে পথে আক্রমণ করা হয়েছিল এবং চারশো মুসলমান খুন ও পঞ্চাশজন স্ত্রীলোক লুঠ করা হয়েছিল। কাজেই এটাই তো উচিত যে ঠিক চারশো হিন্দু ও শিখ শরণার্থীকে হত্যা করা হবে এবং পঞ্চাশ-জন হিন্দু ও শিখ রমণীর ইজ্জত নষ্ট করা হবে, যাতে পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের মধ্যে সমতা বজায় থাকে।

মোগলপুরাতে রক্ষী বদল হ'লো। বালুচিরা বদলে গিয়ে তাদের জায়গাতে এল শিখ, রাজপুত ও ডোগরারা। আতারি থেকে সমস্ত আবহাওয়াটা বদলে গেল। হিন্দু ও শিখ শরণার্থীরা মুসলমান শরণার্থীদের এত মৃতদেহ এখন দেখতে পাচ্ছে যে সন্দেহ নেই তারা স্বাধীন ভারতের সীমান্তের খুব কাছে এসে গেছে।

অমৃতসর থেকে চারজন ব্রাহ্মণ আমার মধ্যে উঠল। তারা হরিদ্বারে যাচ্ছিল। তাদের মাথা পরিষ্কার ক'রে কামানো, ঠিক মাঝখানে লম্বা শিখা। কপালে তাদের তিলক কাটা, রামনাম ছাপা ধুতি প'রে তারা তীর্থে বেরিয়েছে। অমৃতসর থেকে বন্দুক, বর্শা ও কৃপাণ হাতে দলে-দলে হিন্দু ও শিখেরা পূর্ব পাঞ্জাবে যাওয়া সমস্ত ট্রেনে চ'ড়ে বসল। এরা বেরিয়েছে 'শিকার'-এর খোঁজে। ঐ ব্রাহ্মণদের দেখে ঐ শিকারীদের একজনের সন্দেহ হ'লো। সে জিজ্ঞেস করল, 'ব্রাহ্মণ দেবতা, যাওয়া হচ্ছে কোথায়?'

'হরিদ্বারে।'

'হরিদ্বারে, না পাকিস্তানে?' সে মশকরার সুরে জিজ্ঞেস করল।

'আল্লার নামে শপথ করে বলছি আমরা হরিদ্বারে যাচ্ছি!'

ঐ জাঠ হেসে উঠল, আল্লার নামে, বেশ! তাহ'লে এবার কোতল করে ফেলা যাক। সে তখন চীৎকার ক'রে ডাকল, 'নাথা সিং, এদিকে এসো, বড়ো শিকার মিলেছে!' ওরা একজনকে হত্যা করল। অন্য তিনজন 'ব্রাহ্মণ' পালাবার চেষ্টা করল, কিন্তু তাদের ধ'রে ফেলা হ'লো। 'তোমরা তাহ'লে হরিদ্বারে যাচ্ছো,' নাথা সিং চীৎকার ক'রে উঠল, 'এসো, হরিদ্বারে যাবার আগে তোমাদের ডাক্তারি পরীক্ষা হবে।'

'ডাক্তারি পরীক্ষা'য় ধরা পড়ল ওরা ঠিক যা আশা করেছিল তা-ই—সুব্রত।

'ডাক্তারি পরীক্ষা'র পরে অন্য তিনজন ব্রাহ্মণকেও হত্যা করা হলো।

হঠাৎ এক ঘন অরণ্যের ধারে আমাকে থামানো হলো। সেখানে দু-এক মুহূর্তের মধ্যে আমি চীৎকার-ধ্বনি শুনলাম 'সৎ শ্রী আকাল' ও 'হর-হর মহাদেও' আর দেখতে পেলাম সৈন্যরা ও শিখ ও হিন্দু শরণার্থীরা আমাকে ছেড়ে জঙ্গলের দিকে যাচ্ছে। আমি ভেবেছিলাম মুসলমান দস্যুর ভয়ে ওরা পালিয়ে যাচ্ছে। পরে দেখলাম সে আমার ভুল। ওরা দৌড়ুচ্ছিল—নিজেদের বাঁচাতে নয়,—কয়েকশো গরিব মুসলমান চাষীকে হত্যা করতে, যারা তাদের স্ত্রী পুত্রকন্যা নিয়ে ঐ জঙ্গলে লুকিয়েছিল। আধ ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সব শেষ। পরম আনন্দে বিজেতারা ফিরে আসছে। একজন জাঠ তার বর্শার ডগায় এক মুসলমান শিশুর শব দোলাতে-দোলাতে গান গাইছিল, 'আল বৈশাখী, এই বৈশাখী, হো, হো!'

জলন্ধরের কাছে পাঠান বসতির একটা গ্রাম ছিল। এখানে আবার আমাকে চেন টেনে থামানো হলো, আর সবাই নেমে আবার ঐ গ্রামটার দিকে ধাওয়া করল। পাঠানরা খুব সাহসের সঙ্গে প্রতিরোধ করেছিল বটে, তবে আক্রমণকারীরা অস্ত্রশস্ত্রে ও সংখ্যায় অনেক বেশি জোরালো ছিল। গ্রামের পুরুষেরা সব এই যুদ্ধে প্রাণ দিল। তারপরে এল স্ত্রীলোকদের পালা। এখানে এই বিস্তীর্ণ খোলা মাঠে, পিপুল, শীষম ও সারিন গাছের তলায়, তাদের ইজ্জত কেড়ে নেয়া হলো। এই হলো পঞ্জাবের সেইসব মাঠ যেখানে চাষীরা—হিন্দু, মুসলমান ও শিখ চাষীরা—একসঙ্গে মিলে সোনার শস্য ফলিয়েছে; যেখানে সরষের সবুজ পাতায় ও হলুদ ফুলে সমস্ত গ্রামাঞ্চল যেন এক স্বপ্নের রাজ্যে পরিণত হতো। এইসব পিপুল, শীষম ও সারিন গাছের নিচেই সারাদিনের কঠিন পরিশ্রমের পর স্বামীরা অপেক্ষা করতো কখন তাদের প্রিয়তমা স্ত্রীরা লস্যি নিয়ে আসবে। ঐ তো, ঐ মাঠের পার দিয়ে, তারা লম্বা সার বেঁধে আসছে, হাতের ঘড়ার মধ্যে লস্যি আর বয়ে আনছে মধু, মাখন আর সোনালি গমের চাপাটি। কী সতৃষ্ণ চোখে কিষাণেরা চেয়ে থাকতো কিষাণী বধুর দিকে, আর ঐ চোখের চাহনিতে বউরাও কেঁপে-কেঁপে উঠতো নরম পাতার মতো। এই তো পঞ্জাবের বুকের কলজে। এখানেই জন্মেছিল সোনি আর মাহিওয়াল, হীর ও রঞ্জা! আর এখন! পঞ্চাশটা নেকড়ে; পঞ্চাশজন সোনি আর পাঁচশো মাহিওয়াল। এ-পৃথিবী আর-কখনোই আগের মতো হবে না। চেনাব আর-কখনো তেমন তিরতির ক'রে ব'য়ে যাবে না। হীর, রঞ্জা, সোনি, মাহিওয়াল ও মীর্জা সাহেবানের গান আর কখনো এই বুকে ঠিক তেমনি ক'রে গুঞ্জন তুলবে

না। লক্ষ-লক্ষ অভিশাপ নেমে আস্থক সেইসব নেতাদের মাথায় আর তাদের সাত-সাতে উনপঞ্চাশ পুরুষের মাথায় যারা এই সৌন্দর্য, বীরধর্ম ও মর্যাদাময় ভূখণ্ডকে অসম্মান, প্রতারণা ও হত্যার ছেঁড়াখোড়া টুকরোয় দাঁড় করিয়েছে, যারা এর আত্মায় সিফিলিসের বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছে আর এর শরীরে ভ'রে দিয়েছে হত্যা, লুঠতরাজ ও ধর্ষণের জীবাণু। পঞ্জাব আজ ম'রে গেছে। এর সংস্কৃতি ম'রে গেছে। এর ভাষা ম'রে গেছে। এর সংগীত ম'রে গেছে। এর সাহসী, সদাচারী, নিষ্পাপ প্রাণ ম'রে গেছে। আমার যদিও চোখ ও কান কিছুই নেই, তবু আমি এই মৃত্যু দেখতেও পেলাম, শুনতেও পেলাম।

শরণার্থীরা ও সৈন্যরা পাঠান নারী পুরুষদের মৃতদেহ বহন ক'রে ফিরে এলো। আবার কয়েক মাইল আসার পরে একটা খাল পাওয়া গেল, এখানে আমাকে আবার থামানো হলো। এই খালে সব শবদেহগুলোকে জড়ো ক'রে ফেলা হলো, ও তারপর আমি আবার এগোলাম। যাত্রীরা সকলেই এখন ভীষণ খুশি। রক্ত ও ঘৃণার স্বাদ তারা পেয়েছে, এবং এখন দিশি মদের বোতল খুলে তারা ফুর্তি করতে লাগল।

আবার আমরা থামলাম লুধিয়ানায়। এখানে লুঠেরারা শহরের মধ্যে ঢুকে পড়ল ও মুসলমান মহল্লা ও দোকানগুলোকে আক্রমণ করতে লাগল। ঘণ্টা দুয়েক বাদে তারা স্টেশনে ফিরে এলো। সমস্ত পথ জুড়ে তাদের এই হত্যা ও লুঠ চলতেই থাকল। এবং এতক্ষণে আমার আত্মায় এত ক্ষত জমেছে, এবং আমার কাঠের শরীরে রক্তের দাগে এত ময়লা পড়েছে যে আমার ভীষণ রকমভাবে স্নানের দরকার, কিন্তু আমি জানি যে, পথের মধ্যে কেউ আমাকে সে-স্থযোগ দেবে না!

অনেক রাত্রে আমি আম্বালা পৌঁছলাম। এখানে একজন মুসলমান ডেপুটি কমিশনার, তাঁর স্ত্রী ও বাচ্চাদের সেনাবাহিনীর প্রহরায় এনে আমার একটা প্রথম শ্রেণীর গাড়িতে তুলে দেয়া হলো। সৈন্যদের ওপর কঠোর আদেশ রইল এই মুসলমান কর্মচারীর জীবন ও সম্পত্তি স্থরক্ষিত রাখবার।

রাত্রি দুটোয় আম্বালা ছাড়লাম। মাইল দশেকও বোধহয় আমি আসতে পারিনি এমন সময় কেউ আমার চেন টানল। মুসলমান কর্মচারী যে প্রথম শ্রেণীর গাড়িতে যাচ্ছিলেন তার দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। কাজেই তারা জানলার কাচ ভাঙল। এখানে তারা ঐ মুসলমান ডেপুটি কমিশনার, তাঁর স্ত্রী ও তিনটি ছোটো বাচ্চাকে খুন করল। ডেপুটি কমিশনারের একটি অল্প বয়েসি মেয়ে ছিল। সে খুবই স্থন্দরী ; তাই তারা ওকে বাঁচিয়ে রাখবার সিদ্ধান্ত নিল। ওরা মেয়েটিকে

নিল, গয়নাগাটি ও ক্যাশবাক্স সব নিল, তারপর গাড়ি থেকে নেমে জঙ্গলের দিকে গেল। মেয়েটির হাতে একখানা বই ছিল।

জঙ্গলে গিয়ে ওরা অধিবেশনে বসল। মেয়েটিকে নিয়ে কী করা হবে? ওকে খুন করা হবে, না বাঁচিয়ে রাখা হবে? মেয়েটি বললো, "আমাকে খুন করবার দরকার কী? আমাকে তোমাদের ধর্মে বদল ক'রে নাও। আমি তোমাদের একজনকে বিয়ে করবো।"

"তাই তো, ঠিক কথা," একজন তরুণ বললো, "আমার মনে হয় ওকে আমাদের···"

আর-একজন তরুণ তাকে বাধা দিয়ে মেয়েটির পেটে একটা ছোরা বসিয়ে বললো, "আমার মনে হয় ওকে এখানেই খতম ক'রে দেয়া উচিত। চলো, ফেরা যাক। এ-সব গোলটেবিল বৈঠক ঢের হয়েছে।"

মেয়েটি জঙ্গলের শুকনো ঘাসের ওপরে ম'রে গেল, আর ওর হাতের বইখানা ওরই রক্তের দাগে নোংরা হলো। বইটা ছিল সমাজতন্ত্রের ওপর। হয়তো ও খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে ছিল, হয়তো দেশের ও জাতির সেবায় কাজ করবার এক জ্বলন্ত বাসনা ওর ছিল। হয়তো ভালোবাসার জন্য ওর আত্মা যন্ত্রণায় দীর্ণ ছিল, হয়তো কারো ভালোবাসা পাবার জন্যও, আদরের আলিঙ্গনে মিলিত হবার জন্য, নিজের সন্তানকে চুমো দেবার জন্য। ও তো মেয়ে ছিল, কারো প্রিয়তমা, কারো জননী, সৃষ্টির অজানা রহস্য; আর এখন এই জঙ্গলে ও ম'রে প'ড়ে রইল এবং শেয়ালে ও শকুনে ওর শব খেয়ে যাবে। সমাজতন্ত্র, তত্ত্ব ও প্রয়োগ···জন্তুরা এখন ও-সব খেয়ে ফেলছে।

রাত্রির হতাশ অন্ধকারের মধ্যে আমি এগিয়ে চললাম, দিশি মদে মাতাল কিছু লোককে আমার গাড়ির মধ্যে ব'য়ে নিয়ে; তাদের গলায় চীৎকার, "মহাত্মা গান্ধী কী জয়!"

অনেকদিন পরে আমি বোম্বাইতে এসেছি। এখানে ওরা আমাকে পরিষ্কার করেছে, ধুয়েছে এবং শেডের মধ্যে রেখেছে। আমার শরীরে এখন আর কোনো রক্তের দাগ নেই। খুনেদের রক্ত-জল-করা হাসির হুল্লোড় আর নেই। কিন্তু রাত্রে যখন আমি একলা থাকি, ভূতেরা সব জেগে ওঠে, মৃত আত্মারা যেন আবার প্রাণ ফিরে পায়, আহতেরা জোরে চীৎকার করে, নারীরা ও শিশুরা ভয়ে কঁকিয়ে ওঠে, আর আমি মনে-মনে কামনা করি ঐ ভয়ানক যাত্রায় আর যেন কেউ আমাকে নিয়ে না-যায়। ঐ ভয়ংকর যাত্রার জন্য আমি এই শেড আর-কখনো ছাড়বো না।

কিন্তু আমি অবশ্যই এই শেড ছেড়ে যাবো দীর্ঘ ও সুন্দর যাত্রায় গাঁ-গঞ্জের মধ্য দিয়ে, যখন পঞ্জাবের মাঠ আবার সোনার শস্যে ভ'রে উঠবে, যখন সরষে ফুলে মনে হবে হীর ও রঞ্জার অনন্ত প্রেমের গান গাইছে, যখন চাষীরা, হিন্দু, মুসলমান ও শিখ, সবাই আবার একসঙ্গে চাষ করবে, বীজ বুনবে ও ফসল তুলবে, এবং যখন তাদের হৃদয় আবার কানায়-কানায় ভ'রে উঠবে প্রেমে ও পূজায় ও নারীর প্রতি সম্মানে।

আমি সামান্য একটা কাঠের ট্রেন, কিন্তু প্রতিশোধ ও ঘৃণার ঐরকম ভারি বোঝা কেউ আমার ঘাড়ে আবার চাপিয়ে দিক এ আর আমি কোনোমতে চাই না। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলে আমাকে দিয়ে খাদ্য বওয়ানো হোক। শিল্পাঞ্চলের জন্য আমাকে দিয়ে কয়লা, লোহা ও তেল বওয়ানো হোক। গ্রামে আমাদের চাষীদের জন্য আমাকে দিয়ে সার ও ট্র্যাকটর আনানো হোক। যেখানেই যাই না কেন, সেখানে যেন আমাকে দিয়ে মৃত্যু ও ধ্বংস আর নিয়ে যাওয়া না-হয়। আমি চাই আমার গাড়ির খোপে-খোপে থাকুক সম্পন্ন চাষী ও শ্রমিকের দল ও তাদের সুখী বৌ-বাচ্চারা, খুশিতে ভরপুর, পদ্মফুলের মতো হাসছে যেন ; এইসব বাচ্চারাই তো এক নতুন জীবনের ধারা গ'ড়ে তুলবে যেখানে মানুষ হিন্দুও হবে না, মুসলমানও হবে না, হবে শুধু সেই আশ্চর্য সত্তা—মানুষ !!

অনুবাদ : সৌরীন ভট্টাচার্য

তিসরি কসম

অথবা

ম'রে গেল গুলফাম

ফণীশ্বরনাথ 'রেণু'

হীরামন গাড়োয়ানের পিঠ শুলাচ্ছে !···

গত বিশ বছর ধ'রে গাড়ি হাঁকাচ্ছে হীরামন। গোরুর গাড়ি। সীমান্তের ওপারে মৌরঙ, নেপাল থেকে ধান আর লাকড়ি নিয়ে এসেছে। কনট্রোলের জমানায়ও চোরাবাজারের মাল এপার থেকে ওপার করেছে। কিন্তু এমন কখনও পিঠ শুলায়নি হীরামনের।···

কনট্রোলের জমানা ! হীরামন কি কখনো ভুলতে পারে সেই জমানা ! একবার সিমেণ্ট আর কাপড়ের গাঁটরি নিয়ে ভাগবনী থেকে বিরাটনগর চার খেপ মাল পৌঁছতে হীরামনের কলিজা চুপশে গিয়েছিল। ফারবিসঞ্জের সমস্ত চোরাকারবারি তাকে পাকা গাড়োয়ান ব'লে মানত। বড়ো গদির বড়ো শেঠজি স্বয়ং তার বলদ দুটোর আহা-মরি তারিফ করতেন, নিজের ভাষায়···।

পাঁচবারের বার গাড়ি ধরা প'ড়ে গেল, সীমান্তের এপারে তরাইয়ে। মহাজনের মুনিম গাড়িতেই গাঁটরির মধ্যে জড়োশড়ো হ'য়ে লুকিয়ে বসেছিল। দারোগা-সাহেবের দেড়হাত লম্বা চোরবাতির রোশনি কেমন হয় হীরামন ভালোই জানে। যদি একছটাকও আলো চোখে পড়ে, মানুষ একঘণ্টার জন্যে অন্ধ। আলোর সঙ্গে ভয়ংকর গর্জন—অ্যাই ! থামাও গাড়ি ! শালা, গুলি ক'রে দেবো।···

বিশটা গাড়ি একসঙ্গে ক্যাঁচ ক'রে থেমে গেল। হীরামন আগেই বলেছিল বিশে বিষোবে। দারোগাসাহেব গাড়ির মধ্যে গুটি মেরে থাকা মুনিমজির ওপর আলো ফেলে পিশাচহাস্য হাসলেন—'হা-হা-হা ! মুড়িমজি—ই-ই-ই ! হি-হি-হি !··· অ্যাই শালা গাড়োয়ান, মুখের দিকে কী দেখছিস রে, অ্যাঁ ! এই বস্তার মুখের উপর থেকে কম্বল হঠা।' তারপর মুনিমজির পেটে হাতের ছোটো লাঠির গুঁতো দিয়ে—'এই বস্তাটার ! শ্-শাল্লা !'···

মুনিমজির সঙ্গে দারোগাসাহেবের নিশ্চয়ই অনেক পুরোনো ঝগড়া হবে। তা না-হ'লে অত পয়সা কবুল ক'রেও কেন পুলিশের দারোগার মন টলল না ভাই।

চার হাজার তো গাড়িতে ব'সে-ব'সেই দিচ্ছিল। দারোগার লাঠির আরেক খোঁচা —পাঁচ হাজার! আবার খোঁচা—নামো আগে।···

মুনিমকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দারোগা চোখে আলো মারল। তারপর দুই সেপাই দিয়ে সড়ক থেকে বিশ-পঁচিশ রশি দূরে ঝোপের কাছে নিয়ে গেল। গাড়ি আর গাড়োয়ানদের পাহারা দিচ্ছে পাঁচ-পাঁচজন বন্দুকধারী সেপাই।··· হীরামন বুঝে গেল এবার আর রেহাই নেই ··জেল! হীরামনের জেলের ভয় নেই। কিন্তু তার বলদগুলো না-জানি কতদিন দানাপানি বিনা সরকারি ফাটকে প'ড়ে থাকবে—ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত। তারপর নিলেম হ'য়ে যাবে! দাদা-বৌদিকে আর কখনও মুখ দেখাতে পারবে না সে। নিলেমের বুলি তার কানের কাছে গুঞ্জন ক'রে উঠল—এক-দুই-তিন। দারোগা আর মুনিমের পটছে না মনে হয়।

হীরামনের গাড়ির পাশে দাঁড়ানো সেপাই নিজের ভাষায় নিচু গলায় আরেক সেপাইকে শুধোলো—'কী ব্যাপার? মামলা গড়বড় নাকি?'—তারপর খৈনি দেবার বাহানায় চ'লে গেল। এক-দুই-তিন! তিন-চারটে গাড়ির আড়াল। হীরামন মন স্থির ক'রে ফেলল। বলদের গলার রশি আস্তে ক'রে খুলে নিল হীরামন। তাবপর গাড়িতে ব'সে-ব'সেই দুটোকে একসঙ্গে বেঁধে দিল। বলদদুটো টের পেয়ে গেল কী করতে হবে। হীরামন নামল, গাড়িতে দিল বাঁশের ঠেক্‌নো, তারপর বলদের কাঁধ আলগা ক'রে নিল গাড়ি থেকে। দুটোর কানের পাশে গুডগুড়ি দিয়ে মনে-মনে বলল—'চলো, ভাইজান, জান বাঁচলে এমন ছ্যাকড়া গাড়ি অনেক মিলবে। এক-দুই-তিন। তারপর চালাও এগারো নম্বর!···'

সড়কের কিনারা ধ'রে অনেকদূর অব্দি গাড়ির আড়ে-আড়ে ঘন জঙ্গল। দমবন্ধ ক'রে ঝোপ পার হ'লো তিনজন—নিঃসাড়ে নিঃশব্দে। তারপর এক কদম, দুই কদম, ছুট! দুই বলদই বুক টান ক'রে তরাইয়ের ঘন জঙ্গলে ঢুকে গেল। রাস্তা শুঁকতে-শুঁকতে, নদীনালা পেরিয়ে, ল্যাজ উঁচিয়ে দৌড়। পেছন-পেছন হীরামন। সারারাত দৌড় তিনজনে।

ঘরে পৌঁছে দু-দিন বেহুঁশ হ'য়ে প'ড়ে রইল হীরামন। হুঁশ ফিরলে কানে ধ'রে কসম খেলো—আর কখনও এমন মাল গাড়িতে তুলছে না। চোরাকারবারি মাল? তোবা-তোবা!··· মুনিমজির কী হ'লো কে জানে। ভগবান জানে তার ছ্যাকড়া গাড়ির কী হ'লো। আসলি ইস্পাতের ছিল চাকার বেড়টা। দু-পায়াই নয়, তবে একপায়া একদম নতুন ছিল। গাড়িতে নতুন সুতোর গুছি বড়ো যত্নে গেঁথে লাগিয়ে ছিল হীরামন।··

দুটো কসম খেয়েছিল সে। এক—চোরাবাজারি মাল ঠাশবে না গাড়িতে। দুই—বাঁশ। গাড়ির সব ভাড়াদারকে জিগেস ক'রে নিত সে—'চুরি-চামারির মাল নয় তো? কিংবা বাঁশ। বাঁশ নেয়ার জন্য যদি কেউ পঞ্চাশ টাকাও দেয়, হীরামনের গাড়ি কেউ পাচ্ছে না! অন্য-কোনো গাড়ি দ্যাখো।...'

বাঁশ ঠাশা হয়েছে গাড়িতে। গাড়ির আগে চার হাত বেরিয়ে আছে বাঁশের মুড়ো। আর পেছনে আরো চারহাত বাঁশের ল্যাজা। গাড়ি মাঝে-মাঝেই কব্জার বাইরে চ'লে যাচ্ছে। অমন বেশামাল গাড়ি চালানো মানেই খরৈহিয়া। শহর ব'লে কথা। তার ওপর বাঁশের আগা ধ'রে যাচ্ছিল ভাডাদারের যে মহামাকৃড়া চাকর সে মেয়েদের স্কুলের দিকে দেখতে লেগেছে। ব্যাস, মোড় ঘুরতেই ঘোড়া-গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা। যতক্ষণে হীরামন বলদের রশি টেনে ধরেছে ততক্ষণে বাঁশের আগা ঘোড়াগাড়ির ছাদ ফুটো ক'রে ফেলেছে। ঘোডাগাডিওলা তড়াতড় চাবুক মেরে গালি দিয়েছিল।

বাঁশ তো বটেই, খবৈহিয়া শহর থেকে মাল তোলাই ছেড়ে দিয়েছে হীরামন। যখন ফারবিসগঞ্জ থেকে মৌরঙ পর্যন্ত গাড়ি টানতে শুরু করল তো গাড়িই খোয়া গেল! ...কয়েক বছর হীরামন বলদগুলোকে আধেদারিতে খাটাল। অর্ধেক যে গাডি ভাডা দেবে তার, অর্ধেক বলদের মালিকের। ইশ্‌শ্‌। গাড়োয়ানি কর মিনি মাগনায়। আধেদারির কামাইয়ে বলদদের পেটও ভরে না। গেল বছর নিজের গাড়ি করেছে হীরামন।

দেবী মা ভালো করুন ঐ সার্কাস কম্পানির বাঘের। গত বার এই মেলাতেই বাঘটানা গাডির দুই ঘোড়া ম'রে গেল। চম্পানগর থেকে ফারবিসগঞ্জ মেলায় আসার সময় সার্কাস কম্পানির ম্যানেজার গাড়োয়ান পট্টিতে ঘোষণা ক'রে দিল—একশো টাকা ভাড়া মিলবে! দু-একজন গাড়োয়ান রাজিও হ'লো। কিন্তু তাদের বলদ বাঘের গাড়ির দশহাত দূর থেকেই চিৎকার করতে শুরু করল হাম্বা রবে। দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে গেল। হীরামন নিজের বলদের পিঠে হাত বুলিয়ে বলল,—'দ্যাখো ভাইজান, এমন মওকা আর মিলবে না।' নিজের গাড়ি বানানোর এই সুযোগ। নইলে ফের আধেদারি।.. আর খাঁচায় বন্ধ বাঘকে কীসের ভয়? মৌরঙের তরাইয়ে দৌড়োনো বাঘকেও তো দেখেছি। তাছাড়া পিঠে তো আমি আছিই।...

গাড়োয়ানের দল একসঙ্গে চটাপট হাততালি দিয়ে উঠল। হীরামন সকলের মান রেখেছে। সাহস ক'রে এগিয়ে গিয়ে এক-এক ক'রে বাঘের গাড়ি জুতে নিল। সেরেফ ডানদিকের বলদটা জুতবার পরে একটু বেশি পেচ্ছাপ ক'রে

ফেলেছিল। হীরামন দু-দিন নাক থেকে কাপড়ের পটি খোলেনি। বড়ো গদির বড়ো শেঠজির মতন নাকবন্ধন না-দিলে কেউ সেই বাঘা গন্ধ সইতে পারে না।

তা, বাঘগাড়ির গাড়োয়ানিও তো করেছে হীরামন, কিন্তু এমন কখনো পিঠ শুলায়নি। আজ থেকে-থেকে চম্পার বাস উঠছে গাড়ি থেকে। পিঠ শুলালেই সে গামছা দিয়ে ঝেড়ে নিচ্ছে একবার পিঠটা।

হীরামনের বোধ হচ্ছে গত দু-বছর চম্পানগর মেলার ভগবতী মা তার ওপর প্রসন্ন আছে। নগদ একশো টাকা ভাড়া বাদেও খাবার, চা-বিস্কুট আর রাস্তাভর বাঁদর-ভালুক আব জোকারের তামাশা জুটেছিল ফোকটে!

আর এবারে এই জেনানা সওয়াবি। মেয়ে তো না, যেন চাঁপার ফুল। যখন থেকে গাড়িতে বসেছে গাড়ি থেকে-থেকেই বাস ছাড়ছে।

কাঁচা সড়কে ছোটো একটা গর্তে প'ড়ে গাড়ির ডান দিকের চাকাটা বেমওকা একটা হ্যাঁচকা খেয়ে গেল। হীরামনের গাড়ির ভেতর থেকে হালকা 'ইশ' আওয়াজ এল একটা। হীরামন ডান বলদের পিঠে পাঁচন দিয়ে বাড়ি মেরে বলল—'শালা! ভেবেছ কী, বস্তা ঠাশা হয়েছে!'

—'আহা! মেরো না।'

না-দেখা মেয়ের গলার আওয়াজ হীরামনকে ধন্দে ফেলে দিল। বাচ্চার গলার মতো মিহি বোল্, গ্রামাফোনের সুরেলা বোল্।

মথুরামোহন নৌটঙ্কী কম্পানিতে যে লায়লা সাজে সেই হীরাবাঈয়ের নাম কে না শুনেছে। কিন্তু হীরামনের কথা আলাদা। সাত বছর সে লাগাতার মেলা থেকে ভাড়া নিচ্ছে কিন্তু কখনো নৌটঙ্কী থিয়েটার বা সিনেমা-বায়োস্কোপ গ্যাখেনি। দেখা তো দূরস্থান, লায়লা বা হীরাবাঈয়ের নামও সে কখনো শোনেনি। মেলা ভাঙার দিন রাতদুপুরে কালো ওড়নায় ঢাকা মেয়েছেলে দেখে তার মনে খটকা অবশ্য লেগেছিল। বাক্স-ব'য়ে-আনা চাকর যখন ভাড়া নিয়ে দরাদরির চেষ্টা করল ওড়নাওয়ালি মাথা হেলিয়ে না ক'রে দিল। হীরামন গাড়ি জুততে-জুততে চাকরকে জিগেস করল—'কী ভাই, চুরি-চামারির মাল-টাল নেই তো?'

হীরামন ফের আশ্চর্য হ'লো। বাক্স-বওয়া চাকর হাতের ইশারায় গাড়ি হাঁকাতে ব'লে অন্ধকারে গায়েব হ'লো। হীরামনের তামাক-বেচা বুড়ির কালো শাড়ির কথা মনে হয়েছিল।...

এর মধ্যে কেউ গাড়ি চালায় কী ক'রে?

একে তো পিঠ শুলাচ্ছে। তাছাড়া থেকে-থেকে গাড়িতে চাঁপার ফুল ফুটছে।

আর বলদকে ধমকাবে তো সওয়ারি আবার ইশ উশ করবে। …আর সওয়ারি! একে মেয়ে। তামাক-বেচা বুড়ি নয়। গলা শোনার পর থেকেই সে বার-বার ঘুরে ছইয়ের মধ্যে একবার দেখছে। গামছা দিয়ে পিঠ ঝাড়ছে। …ভগবান জানেন এবার কপালে কী লেখা আছে। গাড়ি যেই পুবের দিকে ফিরল এক টুকরো চাঁদনি গাড়িতে এসে পড়ল। সওয়ারির নাকের পাটায় জোনাকি যেন ঝকমক ক'রে উঠল। হীরামনের কাছে সবই রহস্যময়, কেমন অদ্ভুত ঠেকছে। সামনে চম্পানগর থেকে সিধিয়া গাঁ পর্যন্ত ধু-ধু ময়দান। …কোনো ডাকিনী-পিশাচিনী নয়তো?

হীরামনের সওয়ারি পাশ ফিরল। চাঁদের আলো মুখে পুরো পড়তেই হীরামন চ্যাচাতে গিয়েও সামলে নিল। —আরে বাপ! এ যে পরী!

পরীর চোখ খুলে গেল। হীরামন সামনের রাস্তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলদদের তাড়া দিয়ে ওঠে জিভে-তালুতে লাগিয়ে টি-টি-টি আওয়াজ ক'রে। হীরামনের জিভ না-জানি কখন কাঠের মতন শুকিয়ে গেছে।

—'ভাইয়া, তোমার নাম কী?'

—হুবহু সেই গ্রামাফোনের স্বর। …হীরামনের প্রত্যেক রোমকূপে হর্ষ। মুখ থেকে কথা বেরোয় না। তার বলদ দুটোও কান খাড়া ক'রে আওয়াজটাকে পরখ করে।

—'আমার নাম? নাম আমার হীরামন।'

তার সওয়ারি হাসে। হাসিতে যেন খুশবু পাওয়া যায়।

—'তবে তো মিতে বলব, ভাইয়া নয়…আমার নামও হীরা।'

—'ইশ্‌শ্‌!' হীরামনের প্রত্যয় হয় না! মরদ মেয়েছেলের নামে ফারাক হয়।

—'হাঁ জী, আমার নাম হীরাবাঈ।'

কোথায় হীরামন, আর কোথায় হীরাবাঈ! অনেক ফারাক।

হীরামন বলদদের ধমকে ওঠে—'কান খাড়া ক'রে গপ্‌পো শুনলেই তিরিশ কোশ (মঞ্জিল) কেটে যাবে? বাঁয়ের এই নাটাটার পেটে-পেটে শয়তানি।' —হীরামন পাঁচন দিয়ে বাঁয়ের বলদকে হালকা ক'রে লাগায়।

—'মেরো না—ধীরে-ধীরে যেতে দাও না, তাড়া কীসের?'

হীরামনের মনে প্রশ্ন আসে: কী ব'লে সে গল্প করে হীরাবাঈয়ের সাথে? তুমি, না আপনি? তারা গুরুজনদের আপনি বলে। শহুরে ভাষায় দু-চারটে প্রশ্ন-উত্তর বলে, প্রাণ খুলে গল্প তো লোকে কেবল গাঁয়ের ভাষাতেই করতে পারে!

আশ্বিন কার্তিক মাসের সকালে যে-কুয়াশা ছায় হীরামন তাকে বরাবরই

সন্দেহের চোখে দ্যাখে। অনেকবার সে পথ ভুল ক'রে ধাঁধায় পড়েছে। কিন্তু আজ এই ভোরের কুয়াশা তাকে মগ্ন ক'রে দিয়েছে। নদীর ধারে ধানখেত থেকে পাকা ধানের সুবাস হাওয়ায় ভেসে আসছে। আর তার গাড়িতে এদিকে চম্পার ফুল ফুটেছে। সেই ফুলে ব'সে আছে এক পরী। ...জয় ভগবতী!

হীরামন চোখের কোণা দিয়ে দ্যাখে তার সওয়ারি...মিতা...হীরাবাঈ টলটলে চোখে তারই দিকে তাকিয়ে। হীরামনের মনে অজানা রাগিণী বেজে ওঠে। সারা শরীর শিরশিরিয়ে ওঠে। বলে—'বলদকে মারলে আপনার খুব খারাপ লাগে?'

হীরাবাঈ বুঝে গেছে হীরামন সত্যি খাঁটি হীরা। চল্লিশ বছরের হট্টা-কট্টা কালো-কোলো দেহাতি নওজোয়ান, নিজের গাড়ি আর বলদ ছাড়া দুনিয়ায় আর-কিছুতে তার বিশেষ আগ্রহ নেই। ঘরে আছে বড়ো ভাই, খেতে কাম করে। ছেলেপুলে নিয়ে আছে। হীরামন দাদার চেয়েও মানে ভৌজিকে। ভয়ও করে। বিয়ে হীরামনেরও হয়েছিল। গাওনার আগেই ছেলেবেলায় বউ ম'রে গেল। নিজের বৌয়ের চেহারা মনেও পড়ে না হীরামনের। ...আবার বিয়ে? আবার বিয়ে না-করার অনেক কারণ। ভৌজির জেদ কুমারী মেয়ে ছাড়া বিয়ে দেবে না হীরামনের। কুমারী মেয়ে মানেই পাঁচ-সাত বছরের মেয়ে। কে মানছে আর সারদা কানুন? গরজে পড়লেই তো মেয়ের বাপ দোজবরকে মেয়ে দেয়। বৌদি তার তিন সত্যি ক'রে বসেছে তো বসেছেই। বৌদির উপর দাদা পর্যন্ত কথা বলে না। হীরামন ঠিক ক'রে নিয়েছে বিয়ে সে আর করবে না।

আর সবকিছু ছাড়তে পারে, গাড়োয়ানি ছাড়তে হীরামন পারবে না। হীরামনের মতো এককাট্টা মনের লোক খুব কমই দেখেছে হীরাবাঈ। হীরামন জিগেস করে—'আপনার বাড়ি কোন জেলায়?' কানপুর শুনে এমন হাসি বেরোলো যে বলদ-গুলোও চমকে উঠল। হীরামন মুখ নিচু ক'রে হাসে। 'বাহ্‌রে কানপুর। তাহ'লে তো নাকপুরও আছে?' যখন হীরাবাঈ বলল যে নাকপুরও আছে, হাসতে-হাসতে বেদম হ'য়ে গেল হীরামন।

বাহ্‌রে দুনিয়া। কী-কী সব নাম। কানপুর, নাকপুর? —হীরামন গভীর মনোযোগে হীরাবাঈয়ের নাকের ফুল-এর দিকে তাকিয়ে দ্যাখে। নাকের নাক-ছাবির রঙে যেন তিরতির করে—রক্তের ফোঁটা!

হীরামন কখনো হীরাবাঈয়ের নাম শোনেনি। নৌটঙ্কী কম্পানির মেয়েকে সে মোটেও বাঈজি মনে করে না। কম্পানিতে কাজ-করা ঢের মেয়েলোক সে দেখেছে। সার্কাস কম্পানির মালকিন্ নিজের দুই জওয়ান বিটিকে নিয়ে বাঘের খাঁচার কাছে

আনত, দানা-পানি দিত, ভালোও বাসত খুব। হীরামনের বলদকে ডবোল রুটি-বিস্কুট খাইয়েছিল বড়ো মেয়ে।

হুঁশিয়ার আদমি হীরামন। কুয়াশা কাটতেই নিজের চাদর দিয়ে ছই থেকে পর্দা ক'রে দিয়েছে।—'ব্যাস, আর দু-ঘণ্টা। তারপর রাস্তা চলা মুশকিল। কার্তিকের দুপুরের রোদ আপনার সইবে না। কাজরী নদীর কাছে তেগাছিয়ার গাড়ি লাগিয়ে দেবো। দু-প্রহর কাটিয়ে…'

দূর থেকে গাড়ি আসতে দেখেই সতর্ক হ'য়ে গেল হীরামন। গাড়ি আর বলদের দিকেই যেন মন দিয়ে বসে। পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় গাড়োয়ান জিগেস করে—'কী, মেলা ভাঙছে নাকি, ভাই?'

মেলার কথা সে বলতে পারে না। গাড়িতে আছে "বিদাগী" মেয়ে [বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে এমন মেয়ে]। না-জানি কোন গাঁয়ের নাম বাৎলে দেয় হীরামন।

—'ছত্তাপুর পচীরা আবার কোথায়?'

—'কোথায় দিয়ে আপনি কী করবেন?'—হীরামন নিজের চাতুরীতে হাসে। পর্দা পড়ার পরও তার পিঠ গুড়গুড় করতে থাকে।

হীরামন পর্দার ফাঁক দিয়ে দ্যাখে হীরবাঈ একটা দেশলাইয়ের বাক্সের মতো ছোটো আয়নায় দাঁত দেখছে।··মদনপুরের মেলায় একবার বলদগুলোর জন্য ছোট্ট-ছোট্ট কড়ির মালা কিনেছিল হীরামন। ছোট্ট-ছোট্ট দানা-দানা কড়ির পাঁতি।

তেগাছিয়ার তিনটে গাছ দূর থেকেই চোখে পড়ে। হীরামন পর্দা একটু সরিয়ে বলে—'দেখুন, ঐ হ'লো তেগাছিয়া। দুটো হ'লো জটাধারী বটগাছ, আর একটা …কী নাম ঐ ফুলগুলোর? আপনার এই কুর্তায় যে-ফুলগুলো ছাপা আছে সেই রকম ফুল ফোটে। দারুণ গন্ধ। দু-কোশ দূর অব্দি বাস ছড়ায়। লোকে এমনকী এই ফুল খৈনি, তামাকের সঙ্গেও মেখে নেয়।'

—আর ঐ আমগাছের আড়াল থেকে কোন বাড়ি দেখা যাচ্ছে? ওখানে কোনো গাঁ আছে, না মন্দির? হীরামন বিড়ি ধরানোর আগে শুধোয়—'বিড়ি ধরাবো? আপনার গন্ধ লাগবে না তো?…ওটা হ'লো নামলগড় দেউড়ি। যে-রাজার মেলা থেকে আমরা আসছি তারই…'

বাহ্‌রে দিনকাল!

হীরামন এই 'বাহ্‌রে দিনকাল' ব'লে গল্পে রসাল দেয়। হীরাবাঈ ছইয়ের পর্দার কোণটা সরায়।…হীরাবাঈয়ের হাসি!

—'কোন্ দিনকাল ?'—থুৎনিতে হাত রেখে সাগ্রহ প্রশ্ন।

—'নামলগড় দেউড়ির দিনকাল। কী ছিল আর কী হ'য়ে গেল।'—হীরামন গল্প রসানোর গূঢ় কৌশল জানে। হীরাবাঈ বলে—'তুমি দেখেছো সেই দিনকাল ?'

—'দেখিনি, শুনেছি। রাজত্ব কেমন ক'রে গেল সে বড়ো চমকদার কাহিনী। শুনেছি ঘরে দেওতা জন্ম নিয়েছিল। দেওতা তো দেওতাই, বলুন! তাই না? ইন্দ্রাসন ছেড়ে যদি মর্তভুবনেও জন্ম নেন তাঁর তেজ কি কেউ শামলাতে পারে? স্যযমুখি ফুলের মতো মাথার চারদিকে জ্যোতি ফুটে থাকতো। কিন্তু কেউ কি নজর ক'রে দেখল, চিনল! একবার উপনয়নে লাটসাহেব মায় লাটনিকে নিয়ে মটর গাড়ি চেপে এসেছিলেন। লাটসাহেবও পারেননি। শেষমেষ লাটনি চিনতে পারলেন। সূর্যমুখি জ্যোতি দেখে ব'লে উঠেছিলেন—"প্রিয় রাজাসাহেব, শুনুন, ইনি মানুষের ছেলে নন, দেবতা।" '

হীরামন লাটনির কথা নকল করার সময় খুব ডাম—ফ্যাট—লট্ চালায়। হীরাবাঈ প্রাণ খুলে হাসে। ··তার সারা শরীর দুলে-দুলে ওঠে। হীরাবাঈ আপনার ওডনা শামলায়। হীরামনের মনে হয় যেন—যেন—

—'তারপর ? তারপর কী হ'লো, মিতে ?'

—'ইশ্‌শ্। গল্প শোনার আপনার বড়ো শখ, না?···কিন্তু কালা আদমি, রাজাই হোক আর মহারাজাই হোক, কালা আদমিই থাকে। সাহেবের মতো বুদ্ধি কী ক'বে হবে? সবাই হেসেই উড়িয়ে দিলে। তখন দেওতা বার-বার রানীকে স্বপ্ন দিলেন—সেবা যদি কবতে না-পারিস, যেতে দে, তোর এখানে থাকবো না। তারপর শুরু হ'লো দেওতার খেল। প্রথমে গেল দাঁতাল দুই হাতি, তারপর ঘোড়া, তারপর পটপটাং—'

—'পটপটাং কী ?'

হীরামনের মন পলকে-পলকে বদলাচ্ছে। মনের মধ্যে আস্তে-আস্তে সাতরঙের ছাতা খুলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে···তার গাড়িতে দেবকুলের কন্যা আজ সওয়ার। দেওতা তো দেওতাই।

—'পটপটাং! ধনদৌলত লোক-লস্কর, সব যায়। দেবতাও ফের ইন্দ্রাসনে ফিরে গেলেন।'

হীরবাঈ ছায়াঘনায়মান মন্দিরপ্রাকারের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফ্যালে।

—'কিন্তু দেওতা যেতে-যেতে বললেন—এই রাজ্যে কখনও এক বৈ দুই ছেলে

হবে না। ধন নিয়ে গেলাম, গুণ রেখে গেলাম।—দেওতার সাথে-সাথে অন্য-সব দেবদেবীও চ'লে গেলেন, র'য়ে গেলেন কেবল মা সরস্বতী। ওনারই মন্দির।'

দিশি ঘোড়ার পিঠে পাটের বোঝা চাপিয়ে বেনেরা আসছে দেখে হীরামন ছইয়ের পর্দা ফেলে দিল। বলদদের তাড়া দিয়ে উঠে বিদেশীয়া নাচের বন্দনাগীত শুরু করে—'জয় মা সরস্বতী, আরজি করিনু আমি, মোর 'পরে হও গো সদয়া, মা, মোর 'পরে হও গো সদয়া।'

ঘোড়সওয়ার বেনেকে হীরামন হেসে শুধোয়—'পাট কী দরে কিনলেন, মহাজন!'

ল্যাংড়া ঘোড়ার বেনে যেতে-যেতে জবাব দেয়—'কমের দিকে সাতাশ-আটাশ, বেশি হ'লে তিরিশ! যেমন মাল তেমন দাম।'

ছোকরা বেনে জিগেস করে—'মেলার কী খবর, ভাই? কোন নৌটঙ্কী কম্পানির আসর বসেছে? রৌতা, না মথুরামোহন?'

—'মেলার খবর মেলার লোক জানে!'—হীরামন ফের ছত্তাপুর পচীরার নাম করে।

সূর্য ওপর-আকাশে চ'লে আসে। হীরামন ফের নিজের বলদের সঙ্গে গপপো জোড়ে। 'আর এক কোশ পথ। একটু কষ্ট ক'রে চল। তেষ্টা পেয়েছে তো? মনে আছে, আগের বার সার্কাস কম্পানির জোকার আর বাঁদরের খেলা দেখাত যে-সাহেব দুটোয় ঝগড়া বাধিয়েছিল তেগাছিয়ার কাছে? জোকার ঠিক বাঁদরের মতো দাঁত কিড়মিড় ক'রে, কিচির-মিচির ক'রে, ভেঙাচ্ছিল?…কত-সব জায়গা থেকে লোক আসে।'

হীরামন ফের পর্দার ফাঁক দিয়ে ছাখে হীরাবাঈ এক কাগজের টুকরোয় চোখ ডুবিয়ে ব'সে। হীরামনের মন আজ হালকা সুরে বাঁধা। কত-যে গান আজ তার মনে প'ড়ে যাচ্ছে। বিশ-পঁচিশ বছর আগে বিদেশীয়া, বলবাহী, ছোকরা-নাচের দলের নাচিয়েরা ভালো-ভালো গজল-খেমটা গাইত। এখন ভোঁপ-ভোঁপ ক'রে ভেঁপু বাজিয়ে কী গানটা যেন গায়? আরে জমানা! ছোকরা-নাচিয়ের গানের কথা মনে প'ড়ে যায় হীরামনের—

সজনী আমার বৈরী হ'লো, সজনী,…
আরে, চিঠি হয় তো সবাই বোঝে,
হায়, আমার সজনী থাকে অজানি,
হায়…

গাড়ির বল্লীর উপর আঙুল দিয়ে ঠেকা দিতে-দিতে গানে ছেদ টানে হীরামন।

ছোকরা-নাচিয়ের ঢলোঢলো মুখ যেন হীরাবাঈয়ের মতোই ছিল।…কোথায় চ'লে গেল সেইসব জমানা। হরমাস গাঁয়ে নাচিয়েরা আসত। ছোকরা-নাচ দেখতে গিয়ে না-জানি কত কথা শুনেছে ভাবীর কাছে হীরামন। দাদা বলেছিল বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে।

আজ মনে হচ্ছে মা সরস্বতী হীরামনের উপর সদয়। হীরাবাঈ বলে—'বাঃ, কী ভালো গাও তুমি।'

হীরামনের মুখ লাল হ'য়ে যায়। মাথা নিচু ক'রে হাসে সে।

আজ তেগাছিয়ার মহাবীর স্বামীও প্রসন্ন তার ওপর। তেগাছিয়ার নিচে একটাও গাড়ি নেই। এখানে সবসময় গাড়ি আর গাড়োয়ানদের ভিড় লেগে থাকে। সেরেফ এক সাইকেলওলা আলসেয় ব'সে। মহাবীর স্বামীকে স্মরণ ক'রে গাড়ি থামায় হীরামন। হীরাবাঈ পর্দা সরাতে যাচ্ছিল, হীরামন তার আগেই চোখের ইশারা করে—সাইকেলওলা একদৃষ্টে এদিকেই তাকিয়ে।

বলদগুলো খোলার আগে হীরামন বাঁশের ঠেক্‌নো দিল গাড়িতে। তারপর সাইকেলওলাকে জিগেস করল—'যাওয়া হবে কোথায়? মেলায়? আসা হচ্ছে কোত্থেকে? বিসন্‌পুর থেকে? ব্যাস? এর মধ্যেই ধ'কে গেলে? …বাহ্‌রে জওয়ানি।'

সাইকেলওলা দুবলা-পাৎলা নওজোয়ান। মিন্‌মিন্ ক'রে কিছু-একটা ব'লে বিড়ি ধরিয়ে খাড়া হ'য়ে উঠল।

হীরামন সারা দুনিয়ার নজর থেকে বাঁচিয়ে রাখতে চায় হীরাবাঈকে। চার-দিকে নজর চালিয়ে দেখে নেয় সে—কোথাও কোনো গাড়ি-ঘোড়া নেই।

কাজরী নদীর জীর্ণ-শীর্ণ ধারাটি তেগাছিয়ার কাছে এসে পুব দিকে মোড় নিয়েছে। হীরাবাঈ জলের মধ্যে ব'সে-থাকা মোষ আর পিঠের ওপর ব'সে-থাকা বকের দিকে তাকিয়েছিল।

হীরামন বলে—'যান, ঘাটে হাতমুখ ধুয়ে আসুন।' হীরাবাঈ গাড়ি থেকে নামে। হীরামনের কলিজা চমকায়। না, পা সোজাই, ট্যারা নয়। কিন্তু পায়ের তালু এত লাল কেন? হীরাবাঈ ঘাটে চ'লে যায়। গাঁয়ের মেয়ে-বউদের মতোই, মাথা নিচু রেখে, ধীরে-ধীরে। কে বলবে কম্পানির মেয়েছেলে।… মেয়েছেলে নয়, মেয়ে। কুমারীই হবে হয়তো-বা।

হীরামন ঠেক্‌নো-দেয়া গাড়িতে চ'ড়ে বসে। একবার ছইয়ের মধ্যে উঁকি মেরে দ্যাখে। তারপর এধার-ওধার দেখে একবার হীরাবাঈয়ের তাকিয়ায় হাতও

রেখে দেয়। তারপর তাকিয়ায় কনুই রেখে ঝোঁকে, ঝুঁকেই পড়ে! খুশবু পৌঁছোয় তার দেহের ভিতর অব্দি। তাকিয়ার ওয়াড়ের উপর সুতোর কাজকরা ফুলের ওপর হাত ছুঁইয়ে শোঁকে। হায় রে হায়! এত সুবাস! হীরামনের মনে হয় সে যেন একসঙ্গে পাঁচ ছিলিম গাঁজা টেনে উঠেছে! হীরাবাঈয়ের আয়নায় সে নিজের মুখটা দেখে নেয়। চোখ এত লাল কেন?

হীরাবাঈ ফিরলে সে হেসে বলে—'এবার আপনি গাড়ি পাহারা দিন, আমি আসছি।'

হীরামন নিজের মুসাফিরি ঝোলা থেকে কাচা গেঞ্জি বার করে, গামছা ঝেড়ে কাঁধে ফ্যালে, তারপর হাতে বালতি লটকে রওনা দেয়। ওর বলদগুলো হুঁক-হুঁক ক'রে কিছু বলে। হীরামন যেতে-যেতে ফিরে বলে—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, পিয়াসা সবারই লেগেছে। ফিরে এসে ঘাস দেবো, বদমায়েশি করিস না।'

বলদেরা কান হেলায়।

নাওয়া-ধোওয়া শেষ ক'রে কখন ফিরেছে হীরামন, হীরাবাঈ জানতেই পারেনি। কাজরী ধারার দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে রাত্তিরের চ'টে-যাওয়া ঘুম চোখ জুড়ে বসেছিল। হীরামন কাছের গাঁ থেকে জলখাবারের জন্য দই-চিঁড়ে-চিনি নিয়ে এসেছে।

—'উঠুন, ঘুম ভেঙে। দু-মুঠো জলপান ক'রে নিন।'

হীরাবাঈ চোখ খুলে হতবাক। এক হাতে মাটির নতুন পাত্রে দই, কলাপাতা। অন্যহাতে বালতিভরা জল। চোখে আত্মীয়তার অনুরোধ।

—'কোত্থেকে আনলে এত কিছু।'

—'এই গাঁয়ের দইয়ের নাম খুব। চাইলে এমন-কী ফারবিসগঞ্জ অব্দি মিলবে।'

হীরামনের গুড়গুড়ানি থেমেছে। হীরাবাঈ বলে—'তুমিও পাতা বিছিয়ে নাও।'

—'কেন?'

—'তুমি যদি না-খাও তো সব গুটিয়ে তোমার ঝোলায় তুলে রাখো। আমিও খাবো না।'

—'ইশ্‌শ্‌!' —হীরামন লাজুক ভাবে বলে—'বেশ তো! আপনি প্রথমে খেয়ে নিন।'

—'প্রথমে, পরে আবার কী? তুমিও বোসো।'

হীরামনের জীবন জুড়োলো। হীরাবাঈ নিজের হাতে পাতা বিছিয়ে, জল ছিটিয়ে, চিঁড়ে বার ক'রে দেয়। —আহা, ধন্য, ধন্য!

হীরামন ভাখে মা ভগবতী প্রসাদ সাজাচ্ছেন। লাল ওষ্ঠে দধির পরশ। পাহাড়ি তোতাকে দুধ-ভাত খেতে দেখেছো?

দিন শেষ হয়।

ছইয়ের মধ্যে হীরাবাঈ আর নিচে মাদুর বিছিয়ে শোয়া হীরামনের ঘুম এক-সঙ্গে ভেঙে যায়। মেলামুখো গাড়ি সব তেগাছিয়ায় দাঁড়িয়ে। বাচ্চারা কলকল করছে।

হীরামন হুড়বড়িয়ে উঠে বসে। ছইয়ের মধ্যে উঁকি মেরে ইশারায় বলে—'দিন ঢ'লে পড়েছে।' গাড়িতে বলদ জোতার সময় সে গাড়োয়ানদের প্রশ্নের কোনো জবাব দেয় না। গাড়ি হাঁকিয়ে দিয়ে তারপর বলে—'সিরপুর বাজারের হাসপাতালের ডাক্তারনি। রুগী দেখতে যাচ্ছে। কাছেই কুড়শ গাঁয়ে।'

হীরাবাঈ ছত্তাপুর পচীরার নাম ভুলে গেছে। গাড়ি কিছুটা এগিয়ে গেলে হেসে জিগেস করে, 'পত্তাপুর ছপীরা?'

হাসতে-হাসতে পেটে খিল ধ'রে যায় হীরামনের—পত্তাপুর ছপীরা! 'হাঃ-হাঃ-হাঃ। ওরা তো ছত্তাপুর পচীরারই গাড়োয়ান। ওদের কী ক'রে বলবো? হি, হি!'

হীরাবাঈ হেসে গাঁয়ের দিকে চোখ ফেরায়। সড়ক গেছে তেগাছিয়া গাঁয়ের মাঝখান দিয়ে। গাঁয়ের বাচ্চারা পর্দাওলা গাড়ি দেখে তালি বাজিয়ে-বাজিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলতে থাকে—

লাল-লাল ডুলিতে
লাল টুকটুক কনে
পান খায়…।

হীরামন হাসে। কনে · লাল-লাল ডুলি! বৌ পান খায়। বর পাগড়িতে মুখ মোছে। ও বৌ, তেগাছিয়ার বাচ্চাদের মনে রেখো। ফেরার সময় খেজুর গুড়ের লাড্‌ডু নিয়ে এসো। লক্ষ বছর বেঁচে থাকুক তোমার বর।

কত দিনের সাধ পূর্ণ হ'লো হীরামনের। এ-রকম কতবার স্বপ্ন দেখেছে সে। নিজের কনেকে নিয়ে ঘরে ফিরছে। সমস্ত গাঁয়ের বাচ্চারা তালি বাজিয়ে গাইছে। সমস্ত আঙিনা থেকে মেয়েরা উঁকি মেরে দেখছে। পুরুষেরা শুধোচ্ছে কোথাকার গাড়ি, কোথায় যাচ্ছে। আর কনে পর্দা একটু ফাঁক ক'রে দেখছে! আরো কত স্বপ্ন…।

গাঁ থেকে বেরিয়ে সে আড়চোখে ছইয়ের মধ্যে দ্যাখে হীরাবাঈ কিছু-একটা ভাবছে। হীরামনও কোন-এক চিন্তায় ডুবে যায়। কিছুক্ষণ বাদে গুনগুন শুরু করে—

সজনী, একবারও মিছে কথা বলিসনে,
তোকে যে খোদার কাছে যেতে হবে—
হাতি নয়, ঘোড়া নয়, গাড়ি নয়,
পায়ে হেঁটে যেতে হবে গো, সজনী…

হীরাবাঈ বলে—'কেন মিতে, তোমার নিজের ভাষার কোনো গান নেই?'

হীরামন এখন নির্ভয়ে হীরাবাঈয়ের চোখে চোখ রেখে কথা বলছে, কম্পানির মেয়েও এমন হয়! সার্কাসের মালকিন ছিল মেম। কিন্তু হীরাবাঈ? গ্রাম্য-বুলিতে গান শুনতে চাইছে! প্রাণ-খুলে হাসে সে—

'আপনি গাঁয়ের বুলি বুঝবেন?'

'হুঁ-উঁ-উঁ।'—হীরাবাঈ ঘাড় হেলায়। কানের ঝুমকো হেলে যায়। হীরামন কিছুদূর অব্দি চুপচাপ গাড়ি হাঁকায়। তারপর বলে—'গান শুনবেনই? কিছুতেই মানবেন না? ইশ্‌শ্‌, এত শখ গাঁয়ের গান শোনবার আপনার?…তবে রাস্তা ছেড়ে যেতে হবে কিন্তু। চালু রাস্তায় কেউ গাইতে পারে?'—হীরামন বলদের রশি টেনে ডানদিকের বলদটাকে রাস্তা থেকে ঘুরিয়ে বরে করতে-করতে বলে—'তাহ'লে হরিপুর হ'য়ে যাবো না।'

চলাচলের রাস্তা থেকে কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে হীরামনের পিছনের গাড়োয়ান চিৎকার ক'রে জিগেস ক'রে—'কী গাড়োয়ান, রাস্তা ছেড়ে বেরাস্তায় কেন?'

হীরামন হাওয়ায় ছপ্‌টি ঘুরিয়ে জবাব দেয়—'বেরাস্তা কোথায়? ও-সড়ক তো আর নলপুর যাবে না।'—তারপর নিজের মনেই বিড়বিড় করে—'এদিককার লোকের এই এক খারাপ অব্যেস। রাস্তা চলতে একশো প্রশ্ন করবে। আরে ভাই, তোমার যেতে হয় যাও!…যত সব দেহাতি বুদ্ধু!'

ননন‍পুর সড়কে এসে হীরামন বলদের রশি ঢিলা ক'রে দেয়। বলদেরা কদম-চাল ছেড়ে দুলকি চাল ধরে।

হীরাবাঈ দ্যাখে সত্যি-সত্যি ননন‍পুরের সড়ক অনেক নির্জন। হীরামন তার চোখের ভাষা বোঝে—'ঘাবড়াবার কিছু নেই। এই সড়কেও ফারবিসগঞ্জ যাওয়া যায়। রাস্তা-ঘাটের লোক খুব ভালো। এক প্রহর রাত নাগাদ পৌঁছে যাবো।'

ফারবিসগঞ্জে পৌঁছনোর জন্য হীরাবাঈয়ের তাড়া নেই মোটেও। হীরামনের উপর এত ভরসা হয়েছে তার যে ভয়ডরের কোনো কথাই মনে ঠাঁই পাচ্ছে না।

হীরামন প্রথমে প্রাণভরে হেসে নেয়। কোন গান সে গাইবে? হীরাবাঈয়ের গানের কথা আর সুর দুটোরই শখ!—'মহুয়া ঘাটোয়ারি!' সে বলে—'আচ্ছা আপনার যখন এত শখ শুনুন মহুয়া ঘাটোয়ারির গীত। এতে কথাও ভালো, সুরও ভালো।'

কতদিন বাদে হীরামনের এই অভিলাষও পূর্ণ করেছেন মা ভগবতী। জয় ভগবতী! আজ হীরামন তার মনের ভার লাঘব ক'রে নেবে। সে হীরাবাঈয়ের মুখের মুচকি হাসির দিকে তাকিয়ে থাকে। আজও পরমান নদীতে মহুয়া ঘাটোয়ারির নামে পুরোনো ঘাট আছে। সেই মুলুকেরই মেয়ে মহুয়া। ঘাটোয়ারি হ'লে কী হবে, সদ্‌গুণে অদ্বিতীয়। বাপ দিনরাত মদতাড়ি খেয়ে বেহুঁশ হ'য়ে প'ড়ে থাকে। সৎমা সাক্ষাৎ রাক্ষুসী। যারা রাত্তিরে গাঁজা-মদ-আফিম বিক্রি ক'রে তাদের সঙ্গে শুরু ক'রে হরেক সব লোকের সঙ্গে তার ভাব। সকলের সঙ্গেই তার এক গেলাশের মেলামেশা। মহুয়া ছিল অনূঢ়া। কাজ করাতে-করাতে রাক্ষুসী তাকে হাড্ডিসার ক'রে ফেলেছিল। জওয়ানি এসে গেলেও তার বিয়ে-শাদির কথা তুলত না। এক রাতের কথা শুনুন। হীরামন গুনগুনিয়ে গলা সাফ ক'রে নেয়।

ও মা! শাওন-ভাদবের ভরা নদী। ভয়াবহ রাত, বিজুরী চমকাচ্ছে, আমি বাচ্চা মেয়ে একা কী ক'রে ঘাটে যাবো? তাও এক পবদেশী যাত্রীর পায়ে তেল মাখাতে? সৎ-মা বন্ধ করেছে বজ্র-কপাট। আকাশে হু-হু করছে মেঘ। আর ঝম্‌-ঝম্‌ ক'রে হচ্ছে বৃষ্টি। মহুয়া তার মরা মাকে মনে ক'রে কাঁদে। মা বেঁচে থাকলে এই দুর্দিনে কলিজার সঙ্গে জড়িয়ে রাখতেন তার মহুয়া মেয়েকে? মা, এই দিনের জন্যে তুমি আমাকে গর্ভে ধরেছিলে? মহুয়া মার উপরে অভিমান করে—কেন সে একা-একা ম'রে গেল? প্রাণ ভ'রে মাকে দোষে সে।

হীরামন লক্ষ করে হীরাবাঈ তাকিয়ার ওপর কনুই রেখে, গানে নিমগ্ন হ'য়ে, তার মুখের একদৃষ্টে তাকিয়ে।... আপন-ভোলা সৌন্দর্য কেমন সরল, নিষ্পাপ!

হীরামন গলায় কম্পন আনে—

> 'ওরে ডাইনি মা রে আমার, নুন চাটিয়ে মারলিনে কেন,
> আঁতুড় ঘরেই রে, এমন দিনের তরেই কি তুই রে
> এত আদরে লালপোষ করলি মোরে...'

হীরামন দম নিয়ে প্রশ্ন করে, 'ভাষা কিছু বুঝছেন, না গানই খালি শুনছেন?' হীরাবাঈ বলে—'বুঝছি। উটগন মানে সর তো, যা গায়ে মাখে?'

হীরামন অবাক হ'য়ে বলে—'ইশ্! ···তা কেঁদে আর কী হবে? সদাগর মহুয়ার জন্য পুরো দাম চুকিয়ে দিয়েছে। চুল পাকড়ে ঘষটাতে-ঘষটাতে টেনে নিয়ে নৌকোয় তোলে আর মাঝিদের হুকুম দেয়—নাও খোলো, পাল তোলো। পাল-তোলা নাও ডানাওলা পাখির মতো উড়ে চলে। রাতভর মহুয়া ছটফট ক'রে কাঁদে। সদাগরের চাকরেরা তাকে অনেক ভয় দেখাল, ধমকাল··· চুপ ক'রে থাকো, নয়তো উঠিয়ে জলে ফেলে দেবো। ব্যাস, মহুয়াকে পথ দেখিয়ে দেয়া হ'লো। ভোরের তারা মেঘের আড়াল থেকে একটু বেরিয়েই ফের লুকিয়ে পড়ল। এদিকে মহুয়া ঝপাং ক'রে জলে ঝাঁপ দিল। ··· সদাগরের এক চাকর মহুয়াকে দেখে মোহিত হ'য়ে গেছিল। মহুয়ার পিঠোপিঠি সেও লাফ দিল। স্রোতের উলটো দিকে সাঁৎরানো সোজা কথা নয়, তাও ভাদরের ভরা নদীতে। তবে মহুয়া জাত ঘাটোয়ারির মেয়ে। মাছ ভালো থাকে নদীতেই। পুঁটি মাছেব মতো জল চিরে তরতর ক'রে পালায় মহুয়া। আর পিছনে সদাগরের চাকর চিৎকার করে বলতে থাকে, 'মহুয়া, একটু থামো, আমি তোমাকে ধরতে আসছি না, আমি তোমারই বন্ধু। সারা জীবন আমরা এক সঙ্গে কাটাবো। কিন্তু···'

হীরামনের বড়ো প্রিয় গান এটা। মহুয়া ঘাটোয়ারির গান গাইবার সময় তার চোখের সামনে শাওন-ভাদরের নদী উছলাতে থাকে। অমাবস্যার রাত। আর ঘন বাদলের মধ্যে থেকে বিজুরী চমকাচ্ছে। সেই আলোতে সে ঢেউয়ের সঙ্গে যুযুধান জলকন্যা মহুয়াকে উঠতে দ্যাখে। পুঁটি মাছের চলনের গতি আরো বেড়ে যায়। তার মনে হয় সে নিশ্চয়ই সদাগরের সেই চাকর। মহুয়া কোনো কথা শুনছে না। বিশ্বাস করছে না। ফিরে তাকাচ্ছে না পর্যন্ত। আর সে সাঁৎরাতে-সাঁৎরাতে বেদম হ'য়ে যাচ্ছে··· ।

এবার মনে হচ্ছে মহুয়া ধরা দিয়েছে। নিজেই সেধে এসেছে বাঁধনের মধ্যে। সে মহুয়াকে স্পর্শ ক'রে নিয়েছে। পেয়ে গেছে? দূর হ'য়ে গেছে তার সকল ক্লান্তি। পনেরো-বিশ বছর ধ'রে স্রোতের উলটো দিকে সাঁৎরাচ্ছে যে-মন সে আজ কূল পেয়েছে। আনন্দের অশ্রু বাধা মানে না ··· ।

সে হীরাবাঈয়ের কাছ থেকে তার জলে-ভেজা চোখ লুকোবার চেষ্টা করে। কিন্তু হীরাবাঈ যেন তার মনের মধ্যে ব'সে থেকে কবে থেকে সবকিছুই দেখছে। কাঁপা গলাকে শাসনে এনে হীরামন বলদদের ধমক লাগায়—'কী যেন আছে এই গানে। শুনলেই এই দুটো থমকে যাবে। যেন ঘাড়ে জোর বোঝা চাপানো হয়েছে মণ কয়েক।'

হীরাবাঈ-এর দীর্ঘশ্বাস পড়ে। হীরামনের অঙ্গে-অঙ্গে পুলক জাগে।

—'তুমি তো ওস্তাদ, মিতে।'

—'ইশ্‌শ্‌।'

আশ্বিন-কার্তিকের রোদ বেলা থাকতেই মিইয়ে আসে। সূর্য ডোবার আগেই পৌঁছতে হবে নননপুর? হীরামন বলদদেব বোঝায়—'পা চালিয়ে আর বুক বেঁধে চল্‌। এ-ছি-ছি। জোরে, ভাইজান। লে-লে-লে—এ-হে-ইয়্‌!'

ননপুর অব্দি বলদদের টুইয়ে চলে হীরামন। মনে করিয়ে দেয় আগেকার সব ঘটনা। 'মনে নেই, চৌধুরীদের বেটার বিয়েতে কত গাড়ি ছিল? সবাইকে মাৎ করেছিলাম। সেই কদম বার কর। লে-লে-লে। ননপুর থেকে ফারবিসগঞ্জ তিন কোশ। আর দু-ঘণ্টা।'

আজকাল ননপুর হাটে চা-ও বিক্রি হয়। হীরামন আপনার লোটায় চা ভ'রে আনে।··· কম্পানির মেয়েদের সে চেনে। সরাদিন ঘড়ি-ঘড়ি চা খায় তারা! চা-ই প্রাণ।

হীরা হাসতে-হাসতে কুটিপাটি—'আর তোমাকে কে বলেছে যে বিয়ে-শাদি না-হ'লে ছেলেদের চা খাওয়া বারণ?'

হীরামন লজ্জা পায়। কী আর বলবে।··· লজ্জার কথা। একবার কিন্তু আস্বাদ নিয়ে দেখেছে। সার্কাস কম্পানিব মেয়ের হাতে একবার চা খেয়েছে। বেজায় গরম ক'রে দেয়।

—'খাও গুরুজি?' —হীরা হাসে।

—'ইশ্‌শ্‌।'

—ননপুব হাটে সাঁঝবাতি জ্ব'লে গিয়েছিল। হীরামন তার দূর-ভ্রমণের লণ্ঠনটা জেলে পিছনে লটুকে দেয়।··· আজকাল শহরের পাঁচ কোশ দূরের গাঁয়ের লোকও নিজেদের শহুরে মনে করে। বিনা আলোর গাড়ি ধ'রে চালান ক'রে দেয়? সতেরো ঝামেলা!

—'আপনি আমায় গুরুজি বলবেন না।'

—'তুমি তো আমার ওস্তাদ। আমাদের শাস্তরে লিখেছে এক অক্ষরও যে শেখায় সে গুরু আর এক রাগ যে শেখায় সে-ও ওস্তাদ।'

—'ইশ্‌শ্‌। শাস্ত্র-পুরাণও জানেন?—আমি কী শেখালাম আবার? আমি কী—'

—হীরাবাঈ হেসে গান ধরে—'হে-অ-অ-অ শাওনা-ভাদরওয়া···'

হীরামন বিস্ময়ের ধাক্কায় বোবা মেরে যায়।

…ইশ্‌শ্‌! এত ভালো স্মৃতিশক্তি। …হু-ব-হু মহুয়া ঘটোয়ারি। গাড়ি সীতা-ধারার এক শুকনো খাতের উৎরাই বেয়ে গড-গড় ক'রে নিচের দিকে নেমে আসে। হীরাবাঈ এক হাতে হীরামনের কাঁধ ধ'রে ফ্যালে। অনেকক্ষণ অব্দি হীরামনের কাঁধে তার আঙুল প'ড়ে থাকে। হীরামন কয়েকবার নজর ফিরিয়ে কাঁধের ওপর একাট্টা করার চেষ্টা করে। গাড়ি চড়াইয়ে পৌঁছলে হীরাবাঈ-এর শিথিল অঙ্গুলি আবার আঁকড়ে ধরে তাকে।

সামনে ফারবিসগঞ্জের আলো ঝিলমিল করছে। শহর থেকে কিছু দূরে স'রে মেলার আলো… ছইয়ে লটকানো লণ্ঠন-এব আলোয় ছায়া নাচছে আশেপাশে। …চোখে যদি জল ভ'রে আসে তখন সব আলোকেই লাগে সূর্যমুখি ফুলের মতো।

ফারবিসগঞ্জ তো হীরামনের ঘরবাড়ি। কতবাব সে ফারবিসগঞ্জ এসেছে কে জানে। মেলার মোট বোঝাই করেছে। কোনো মেয়েকে নিয়ে? হ্যাঁ, তাও একবার। যেবার ওর বৌদি গাওনায় এসেছিল। এই রকমই তো তেরপল দিয়ে ঘিরে বাসা বানিয়েছিল।

গাড়োয়ান পট্টিতে তেরপল দিয়ে গাড়ি ঘিরছে হীরামন। ভোর হ'লেই রোজ নৌটঙ্কী কম্পানির ম্যানেজারের সাথে কথা ব'লে হীরাবাঈ ভরতি হ'য়ে যাবে। পরশু মেলা শুরু হচ্ছে। মেলা এবার খুব জ'মে উঠেছে। ব্যাস, আর একরাত। আজ রাতভর হীরামনের গাড়িতেই থাকবে সে। হীরামনের গাড়িতে নয়, ঘরে।

কোথাকার গাড়ি?… কে, হীরামন? কোন মেলা থেকে? কী মাল চাপিয়েছো? এক গাঁয়ের গাড়োয়ানরা একে অপরকে খুঁজে নিয়ে এক জায়গায় ডেরা গাড়ে। নিজের গাঁয়ের লালমোহর, ধুন্নিরাম আর পলটদাস গাড়োয়ানকে দেখে হীরামন একটু সচকিত হয়। ওদিকে পলটদাস ছইয়ের মধ্যে উঁকি মারে। যেন বাঘের ওপর নজর পড়ে। হীরামান ইশারায় সবাইকে চুপ করায়। তারপর গাড়ির দিকে চোখ মেরে ফিশফিশ ক'রে বলে—'চুপ। কম্পানির মেয়ে, নৌটঙ্কী কম্পানির।'

—'কম্পানি-ই-র?'

এখন এক নয়। চার হীরামন। চারজন অগাধ বিস্ময়ে মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। কম্পানির নামে কী জাদু! হীরামন লক্ষ করে তিনজনই এক সাথে সটকে পড়ে। লালমোহর একটু দূরে স'রে গিয়ে ইশারায় কথা বলার ইচ্ছা করে। হীরামন ছইয়ের দিকে মুখ ক'রে বলে—'হোটেল তো কোনো খোলা থাকবে না, হালুইকরের কাছ থেকে ভালো-মন্দ কিছু-একটা আনি?'

—'হীরামন, একটু এদিকে শোনো।··· আমি এখন কিছু খাবো না। নাও, তুমি খেয়ে এসো।'

—'কী এটা, পয়সা? ···ইশ্‌শ্‌।'···হীরামন ফারবিসগঞ্জে পয়সা দিয়ে কখনো খায়নি। তার গাঁয়ের এত গাড়োয়ান তবে আছে কীসের জন্যে? পয়সা সে ছুঁতেও পারবে না। হীরাবাঈকে সে বলে—'মেলা-বাজারে বেকার হুজ্জুত করবেন না। পয়সা রেখে দিন।'—মওকা পেয়ে লালমোহরও ছইয়ের কাছে এসে পড়ে। সেলাম ক'রে বলে—'চারজনের জন্যে রাঁধা ভাতে আরো দুজনেরও ভালোভাবে হ'য়ে যেতে পারে। বাসায় ভাত চড়িয়ে দেয়া হয়েছে। হেঁ-হেঁ-হেঁ। আমরা একই গাঁয়ের। গাঁয়ের লোক থাকতে হোটেলে বা হালুইকরের কাছে যাবে হীরামন?'

হীরামন লালমোহরের হাত টিপে দেয়—'বেশি ভ্যাজর-ভ্যাজর কোরো না।'

গাড়ি থেকে চার রশি দূরে যেতে না-যেতে ধুন্নিরাম তার চুলবুল বুক খোলশা ক'রে ফ্যালে—'ইশ্‌শ্‌। তুমিও খুব হীরামন। সেবার কম্পানির বাঘ, এবার কম্পানির জেনানা।'

হীরামন ভারি গলায় বলে—'ভাই হে, এ আমাদের দেশগাঁয়ের মেয়ে নয় যে ভিজে-ভিজে কথা শুনে চুপ ক'রে থাকবে। একে তো পশ্চিমের মেয়ে, তায় কম্পানির।'

ধুন্নিরাম শঙ্কা প্রকাশ করে—'কিন্তু কম্পানিতে শুনি কেবল নষ্টচরিত্তির মেয়েরাই যায়?'

'ধ্যাৎ!'—সবাই তাকে দূর দূর ক'রে ওঠে।

'কেমনধাবা লোক তুমি! কম্পানিতে নষ্ট চরিত্রের মেয়ে কাজ করে? দ্যাখো বুদ্ধি!··· শুনেছো, দ্যাখোনি তো কখনো?' ধুন্নিরাম নিজের ভুল স্বীকার করে। পলটদাসের মনে একটা কথা উদয় হয়।—'হীরামন ভাই, মেয়েছেলে গাড়িতে একা থাকবে? যাই হোক, মেয়েছেলে, মেয়েছেলেই। কী দরকার প'ড়ে যাবে।'

এ-কথাটা সবারই মনে লাগে। হীরামন বলে—'ঠিক কথা। পলট, তুমি গাড়িতে ফিরে যাও। গাড়ির কাছেই থাকবে। আর দেখো, গপপো-সপপো একটু হুঁশিয়ার হ'য়ে করবে, হ্যাঁ।'

হীরামনের শরীর থেকে আতর-গুলাবের গন্ধ বেরোয়। হীরামন কর্মবীর। সেবার মাসখানেক তাব গা থেকে বেঘো গন্ধ ছাড়েনি। লালমোহর তো হীরামনের গামছাখানা শুঁকে নেয়। আহ্‌! হীরামন চলতে-চলতে থেমে যায়। 'কী করি, লালমোহর ভাই, একটু বলো তো। বড়ো জেদ ধরেছে, বলছে নৌটঙ্কী দেখতেই হবে।'

—'বিনি পয়সায় ?··· গাঁয়ে কথাটা পৌঁছবে না তো ?'

হীরামন বলে—'না ভাই, একরাত নৌটঙ্কী দেখে সারাজীবন খোঁটা খাবে কে ? দিশি মুর্গির বিলাইতি চাল।'

ধুন্নিরাম শুধোয়—'ফোকটে দেখলেও তোমার ভৌজি কথা শোনাবে ?'

লালমোহনেব ডেরার পাশেই কাঠের দোকানের মাল বোঝাই ক'রে যে-সব গাড়োয়ান এসেছে তাদের ডেরা। সে-ডেরার বুড়ো গাড়োয়ান মীর মিঞাজান মুসাফিরি হুকোঁয় টান দিতে-দিতে জিগেস করে, 'হ্যাঁ ভাই, মীনাবাজারের মাল বোঝাই ক'রে কে এসেছে।'

মীনাবাজার! মীনাবাজার তো পতিতাপল্লিকে বলে।··· বলে কি বুড়ো মিঞা ? লালমোহর হীরামনের কানে-কানে ফিশফিশ করে ব'লে—'তোমার গা থেকেই বাস ছড়াচ্ছে, সত্যি বলছি।'

লহমানওয়া লালমোহরের চাকর গাড়োয়ান। বয়সে সবচেয়ে ছোটো। প্রথম-বার মেলায় এসেছে তো কী ? সে বাচ্চা থেকেই বাবুদের বাড়ি কাজ ক'রে এসেছে। সে থেকে-থেকেই নাক কুঁচকে হাওয়ায় কিছু শুঁকছে। হীরামন দেখল লহমানওয়ার মুখ লাল হ'য়ে উঠছে।··· দুপদাপ ক'রে আসছে কে ? কী হয়েছে ?

পলটদাস এসে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে যায়। তার মুখও লাল হ'য়ে উঠছে। হীরামন শুধোয়, 'কী হয়েছে ? কথা বলছো না কেন ?'

কী জবাব দেবে পলটদাস ! হীরামন তো তাকে সাবধান ক'রেই দিয়েছিল।—গপপো-সপপো হুঁশিয়ার হ'য়ে ! সে চুপচাপ হীরামনের সামনে গিয়ে ব'সে পড়েছিল। হীরবাঈ জিগেস করে—'তুমিও হীরামনের বন্ধু ?' পলটদাস ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি দেয়। হীরাবাঈ শুয়ে পড়ে। চেহারা দেখে আর কথাবার্তা শুনে লাল-মোহরের বুকে কাঁপন লাগে। কেন কে জানে। হাঁ, রামলীলায় সুকুমারী জানকী একবার এইভাবেই ক্লান্ত হ'য়ে শুয়ে পড়েছিলেন। জয় সীতাপতি রামচন্দ্রের।··· পলটদাসের মনে-মনে জয়ধ্বনি ওঠে। সে জাতে দাস বৈষ্ণব। কীর্তনিয়া। হাতের ইশরায় সে সীতা মহারাণীর পদসেবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। হারমোনিয়ামের চাবির উপর যেমন আঙুল নাচে। হীরাবাঈ লাল হ'য়ে উঠে বসে—'আরে, পাগল নাকি ? যাও, ভাগো !···'

পলটদাসের মনে হয় রাগে কম্পানির মেয়েছেলের চোখ থেকে আগুন ঠিক্‌রোয়, ছিটকে-ছিটকে সে কেটে পড়ে।···

পলটদাস কী জবাব দেবে ? সে তো মেলা থেকেই কেটে পড়ার উপায় চিন্তা

করছে। সে বলে—'কিছু না। আমার এক ব্যাপারী জুটে গেছে। এখুনি টিশনে গিয়ে মাল তুলতে হবে। ভাত হ'তে তো এখনও দেরি আছে। আমি তার মধ্যে ঘুরে আসছি।'

যাওয়ার সময় ধুন্নিরাম আর লহমানওয়া পলটদাসেব ঝুডিভর্তি নিন্দে করে। —'ছোটো লোক। কামিনা। পাই-পয়সার হিশেব করে এখন!' খাওয়াদাওয়াব পর লালমোহরের দল নিজেদের ডেরা তুলে দেয়। ধুন্নিরাম আর লহমানওয়া গাড়ি জুতে হীরামনের ডেবার দিকে চলে, গাডিব চিহ্ন ধ'রে ধীরে-ধীরে। হীরামন যেতে-যেতে হঠাৎ থেমে লালমোহরকে বলে—'আমার এই কাঁধটা একটু শুঁকে দ্যাখো। দ্যাখো না শুঁকে।'

লালমোহরেব চোখ শোঁকার পরে মুদে আসে। মুখ থেকে অস্ফুটে বেরোয়—'আহ্।'

হীরামন বলে—'একটু হাত বাখতেই এমন খুশবু।··· বুঝলে?' লালমোহর হীরামনের হাত ধরে ফ্যালে—'কাঁধে হাতে রেখেছিল? সত্যি? ··শোনো হীবামন, নৌটঙ্কী দেখার এমন স্থযোগ আর হাতের মুঠোয় আসবে না, হ্যাঁ!'

—'তুমিও দেখবে?'

লালমোহরের বত্রিশ পাটি চৌরাস্তাব আলোয় ঝলমল ক'রে ওঠে।

ডেবায় পৌঁছে হীবামন দ্যাখে হীরাবাঈয়ের সঙ্গে ছইয়েব পাশে দাঁডিয়ে কেউ কথা বলছে। ধুন্নি আর লহমানওয়া একসঙ্গে ব'লে ওঠে, 'পেছনে প'ড়ে রইলে কেন? অনেকক্ষণ ধ'রে খুঁজছে কম্পানি ·!'

হীবামন ছইয়ের পাশে গিয়ে দ্যাখে আরে এ তো সেই বাক্স-টানা চাকর যে চম্পানগরে হীরাবাঈকে গাডিতে বসিয়ে গায়েব হ'য়ে গিয়েছিল।

—'এসে গেছে হীরামন। ভালো কথা এদিকে এসো।··· এই নাও তোমার ভাড়া আর এই দক্ষিণা। পঁচিশ পঁচিশ পঞ্চাশ।'

হীরামনের মনে হয় কে যেন তাকে ধাক্কা মেরে আকাশ থেকে মাটিতে ফেলে দিল। কে যেনই বা কেন, এই বাক্স-টানা লোকটাই। কোথা থেকে এসে জুটল! তার ঠোঁটে যে কথা এসেছিল ঠোঁটেই থেকে গেল। ··'ইশ্‌শ্‌! দক্ষিণা!'··· চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে সে।

হীরাবাঈ বলে, 'নাও, ধরো। আর কাল সকালে রোজ কম্পানিতে এসে দেখা করবে আমার সঙ্গে। পাশ বানিয়ে দেবো।··· কথা বলছো না কেন?'

লালমোহর বলে, 'খুশ-বখশিশ দিচ্ছেন মালকিন, নিয়ে নাও, হীরামন।' হীরামন

কটমট ক'রে লালমোহরের দিকে তাকায়। এই লালমোহরটা একটু কথা বলতেও শেখেনি।

ধুন্নিরামের স্বগতোক্তি সবই শুনতে পায় হীরবাঈ—'মেলায় এসে গাড়ি-বলদ ছেড়ে কোনো গাড়োয়ান নৌটঙ্কী দেখতে যায়ই বা কী ক'রে?'

হীরামন টাকা নিয়ে বলে—'কী বলবো!'…হাসতে চেষ্টা করে…কম্পানির মেয়েছেলে কম্পানিতে ফিরে যাচ্ছে। হীরামনের কী!

বাক্স-টানা [চাকর] রাস্তা দেখাতে-দেখাতে আগে যায়—'এই দিক দিয়ে।' …হীরাবাঈ যেতে-যেতে থামে। হীরামনের বলদদুটোকে সম্বোধন ক'রে বলে—'চলি, ভাইজান।'

ভাইজান শব্দে বলদেরা কান হেলায়।

'ভাই—স-ব আজ রাতে। দি রোজ সংগীত নৌটঙ্কী কম্পানির মঞ্চে গুলবদন।' গুলবদন! জেনে খুশি হবেন যে মথুরামোহন কম্পানির স্বনামধন্য অভিনেত্রী মিস হীরাদেবী—যাঁর এক-একটি ভঙ্গিমায় হাজারো প্রাণ যায়—এইবার রোজ কম্পানিতে যোগ দিয়েছেন। মনে রাখবেন। আজ রাতে। মিস হীরাদেবী গুলবদন…।

নৌটঙ্কীওলাদের এই ঘোষণায় সারা মেলা বেশ সরগরম হ'য়ে ওঠে।

—'হীরাবাঈ! মিস হীরাদেবী! লায়লা, গুলবদন!…ফিলিম একট্রেসদেরও হার মানায়।…তেরি বাঁকি অদা পর ম্যায় খুদ হি ফিদা, তেরি চাহত কি দিলবার ক্যা করূঁ…'

কড় কড় কড়! কররর…ধন ধন ধড়াম! সবারই প্রাণে ডঙ্কা বেজে ওঠে।

লালমোহর দৌড়োতে-দৌড়োতে হাঁফাতে-হাঁফাতে ডেরায় এসে পৌঁছোয়। 'এই, এই হীরামন! এখানে কী ব'সে আছো। চলো, দ্যাখো কেমন জয়-জয়কার প'ড়ে গেছে। বাজনাটাজনা এমনকী ছাপা কাগজেও হীরাবাঈয়ের জয়-জয়কার।'

হীরামন ধড়মড় ক'রে ওঠে। লহমানওয়া বলে—'ধুন্নিকাকা, তুমি একটু বাসায় থাকো, আমি একটু দেখে আসি।'

ধুন্নির কথা আর শোনে কে! তিনজনে নৌটঙ্কী কম্পানির বিজ্ঞাপন পার্টির পেছন-পেছন চলতে থাকে। আনাচে-কানাচে সব জায়গায় থেমে-থেমে বাজনা বন্ধ ক'রে ঘোষণা হ'তে থাকে। ঘোষণার প্রত্যেক শব্দে হীরামন পুলকিত হয়। হীরাবাঈ-এর নামের সঙ্গে লাস্য, মুগ্ধ ইত্যাদি শব্দ শুনে লালমোহরের পিঠে থাপ্পড় মেরে ব'লে ফ্যালে 'শাবাস, ঠিক কি না?' লালমোহর বলে—'এবার বলো।

এখনও নৌটঙ্কী দেখবে না?'—সকাল থেকে লালমোহর আর ধুন্নিরাম বুঝিয়ে-বুঝিয়ে হার মেনেছে—যাও, দেখা ক'রে এসো কম্পানিতে গিয়ে। যেতে-যেতেও ব'লে গেছে। কিন্তু ব্যাস, হীরামনের এক কথা : ধ্যাৎ, কে দেখা করতে যাবে? কম্পানির মেয়েছেলে কম্পানিতে ফিরে গেছে। এখন আর তার সঙ্গে আর লেন দেন কী! চিনবেও না। মনে-মনে সে চ'টে গিয়েছিল। ঘোষণা শুনে লালমোহরকে বলল—'দেখতেই হবে, কী বলো?'

দুজনে পরামর্শ ক'রে রোজ কম্পানির দিকে চলে। তাঁবুর কাছে পৌঁছে হীরামন লালমোহরকে ইশারা করে। জিজ্ঞাসাবাদের ভার লালমোহরের কাঁধে। লালমোহর শহুরে জবান জানে। লালমোহর কালো কোটপরা এক লোককে বলে—'বাবু সাহেব, থোড়া শুনুন।'

কালো কোট ভুরু কুঁচকে বলে—'কী ব্যাপার? এদিকে কেন?'

লালমোহরের শহুরে বুলি গোলমাল হ'য়ে যায়। রাগত দৃষ্টি দেখে বলে—'গুল গুল—না না···বুলবুল—না।'

হীরামন ঝট ক'রে সামলে নেয়।—'হীরাদেবী কোন দিকে থাকে বলতে পারেন?'

লোকটার চোখ হঠাৎ লাল হ'য়ে যায়। সামনে দাঁড়ানো নেপালি দারোয়ানকে চীৎকার ক'রে বলে—'কেন এদের আসতে দিয়েছো এদিকে?'

—'হীরামন!' সেই কণ্ঠস্বর। কোনদিক থেকে আসছে? তাঁবুর পর্দা সরিয়ে হীরাবাঈ ডাকে, 'এদিকে চ'লে এসো, ভেতরে।···ছাখো, বাহাদুর। চিনে রাখো একে। এ হ'লো আমার হীরামন। বুঝলে?'

নেপালি দারোয়ান হীরামনের দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হেসে চ'লে যায়। কালো কোটওলাকে বলে, 'হীরাবাঈ-এর লোক। না-আটকাতে বলেছে।'

লালমোহর নেপালি দারোয়ানের জন্য পান নিয়ে এসে বলে—'খাওয়া যাক।'

ইশ্‌শ্‌! একটা নয়, পাঁচ-পাঁচটা পাশ। চারটেই আট আনার। বলেছে মেলায় যে-কদিন থাকবে রোজ রাতে এসে দেখে যাবে। সবার খেয়ালও রাখে। বলেছে তোমার আর-সব সাথীদের জন্যেও পাস নিয়ে যাও। কম্পানির মেয়ে-ছেলেদের কথাই অন্য, ঠিক কী না?

লালমোহর লালকাগজের টুকরোটাকে ছুঁয়ে ছাখে। 'পা—শ! বাঃ রে হীরামন ভাই।···কিন্তু পাঁচটা পাশ দিয়ে কী হবে। পলটদাস তো পালটে এখনও ফেরেইনি।'

হীরামন বলে—'যেতে দাও ওকে। কপালে নেই।···হ্যাঁ, প্রথমে গুরুর নামে কসম খেতে হবে সবাই যে দেশে-গাঁয়ে যেন কেউ না-জানে।'

লালমোহর উত্তেজিত হ'য়ে বলে—'গাঁয়ে গিয়ে বলবে কোন, শালা? পলটা যদি বদমাইশি করে তো দ্বিতীয়বার আর সঙ্গে আনবোই না।'

হীরামন আজ নিজের থলি হীরাবাঈয়ের জিম্মা ক'রে দিয়েছে। মেলায় কি কিছুর ঠিক আছে?

কিসিম কিসিমের পকেটমার প্রতিবার মেলায় আসে। নিজের সঙ্গীসাথীদের উপরই বা কী ভরসা! হীরাবাঈ মেনে নেয়। হীরামনের কালো কাপড়ের থলিটা নিজের চামড়ার বাক্সে বন্ধ ক'রে রাখে। বাক্সের ওপরেও কাপড়ের ঢাকনা। আর ভেতরে ঝলমলে রেশমি আস্তরণ। মনের মান-অভিমান দূর হ'য়ে যায়।

লালমোহর আর ধুন্নিরাম মিলে হীরামনের বুদ্ধির তারিফ করে। ভাগ্য তার বার-বার সহায়। চাপা গলায় তার ভাই আর ভাবীর নিন্দে করে। হীরামনের মতো হীরের টুকরো ভাই পেয়েছিল, তাই। অন্য-কোনো ভাই হ'তো তো—

লহমানওয়ার মুখ লম্বা হ'য়ে গেছে? ঘোষণা শুনতে-শুনতে না-জানি কোথায় চ'লে গেছিল। ঘড়িভর সন্ধ্যার সময় ফিরেছে।

লালমোহর তাকে এক মালিকসুলভ ধাম্‌কি লাগাল গালির সঙ্গে—'সোহদা কাঁহিকা!'

ধুন্নিরাম চুল্লিতে খিচুড়ি চাপিয়ে বলে—'প্রথমে ঠিক ক'রে নাও গাড়ির এখানে কে থাকবে।'

—'থাকবে কে, এই লহমানওয়াটা যাবে কোথায়?'

লহমানওয়া কেঁদে ফ্যালে। 'হে-এ-এ মালিক, হাত জুড়ছি। এক ঝলক, সেরেফ এক ঝলক।'

হীরামন উদারতার সঙ্গে বলে—'আচ্ছা-আচ্ছা, এক ঝলক কেন একটা আস্ত গাওনা দেখবি। আমি ব'লে আসবো।'

নৌটঙ্কী শুরু হবার দু-ঘণ্টা আগে থেকে নাকাড়া বাজতে শুরু করে। টিকিট ঘরের সামনে ভিড় দেখে হীরামনের বেজায় হাসি পায়।

—'লালমোহর, এদিকে ছাখ, কী রকম ধাক্কাধাক্কি করছে এরা।'

—'হীরামন ভাই!'

—'কে? পলটদাস? কোথাকার মাল তুলতে এলে?'—লালমোহন ভিন-গাঁয়ের লোকের মতো জিগেস করে।

পলটদাস হাত কচলাতে-কচলাতে মাফ চায়—'কসুর হ'য়ে গেছে। তোমরা যা সাজা দাও সব মঞ্জুর। কিন্তু সত্যি বলো তো সীতা সুকুমারী…'

নাকাড়ার তালে-তালে হীরামনেরও মন খুলে গিয়েছে। বলে—'ত্যাখ পলটা, মনে করিস না যে গাঁয়ের মেয়ে। ত্যাখো, তোমার জন্যেও পাশ দিয়েছে। নিজের পাশ নিয়ে যাও, যাও তামাশা দেখে এসো।'

লালমোহর বলে—'কিন্তু এক শর্তে পাশ পাবে। মধ্যে-মধ্যে লহমান-ওয়াকেও—'

পলটদাসকে কিচ্ছু বলার দরকার নেই। লহমানওয়ার সঙ্গে সে এক্ষুনি কথা ব'লে এসেছে। লালমোহর দ্বিতীয় শর্ত সামনে রাখে—'গাঁয়ে যদি কোনোরকমে জানতে পারে এ-কথা—' 'রামো, রামো!'—দাঁতে জিভ কাটে পলটদাস।

পলটদাস বাৎলে দেয়,—'আট আনার দরজা এই দিকে।' দরজায় দাঁড়ানো দারোয়ান পাশ নিয়ে বার-বার এদের চেহারার দিকে তাকায়। বলে—'এ তো পাশ দেখছি। কোথায় পেলে?' এখন কেউ শুনুক দেখি লালমোহরের শহুরে বোল। তার রাগ দেখে দারোয়ান ঘাবড়ে যায়—কোথায় পেয়েছে সে নিজের কম্পানিতে গিয়ে জিগেস করুক না। চারটেই সব নয়। দেখুন, আর-একটাও আছে। পকেট থেকে পাচ নম্বর পাশ বার ক'রে দেখায় লালমোহর।

এক টাকার দরজায় নেপালি দারোয়ান খাড়া ছিল। হীরামন চেঁচিয়ে বলে—'এ সিপাহী ভায়া, সকালে চিনিয়ে দিল আর এর মধ্যেই ভুলে গেলে?'

নেপালি দারোয়ান বলে—'হীরাবাঈ-এর লোক সব। যেতে দাও। পাশ আছে তো পথ আটকাচ্ছ কেন?'

আট আনার দরজা!

তিনজন তাঁবুর মধ্যে ঢুকছে এই প্রথম। সামনে চেয়ার বেঞ্চের দরজা। পর্দায় রামের বনগমনের ছবি। পলটদাস চিনতে পারে। পর্দার উপর আঁকা রাম, সুকুমারী সীতা আর লক্ষ্মণ লালকে সে হাত জোড় ক'রে নমস্কার করে। জয় হোক, জয় হোক। পলটদাসের চোখ জলে ভ'রে আসে।

হীরামন বলে—'লালমোহর ছাপা ছবি, না চলছে?' লালমোহর কাছে-বসা দর্শকদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় সেরে ফেলেছে। সে বলে—'খেলা এখনও পর্দার ভেতরে। এখনও লোক জমাচ্ছে…'

পলটদাস ঢোলক বাজাতে পারে। তাই নাকাড়ার তালে-তালে ঘাড় দোলাচ্ছে

আর দেশলাইয়ের বাক্সে তাল কাটছে। বিড়ি দেয়া-নেয়া ক'রে হীরামনও এক-আধটা পরিচয় সেরে নেয়। লালমোহরের চেনা লোকটি চাদর দিয়ে গা ঢাকা দিতে-দিতে বলে—'নাচ শুরু হ'তে এখনও দেরি আছে। ততক্ষণ এক ঘুম দিয়ে নিই।...সব দরজার সেরা হ'লো আট আনার দরজা। সবার পেছনে, সবচেয়ে উঁচুতে। মাটিতে বিছানো গরম খড়। হে-হে, এই সর্দির মরশুমে যারা চেয়ার-বেঞ্চিতে বসেছে তারা ঘন-ঘন উঠবে চা খেতে।'

লোকটা সঙ্গীকে বলে, 'শুরু হ'লে জাগিয়ে দিও।' 'না না, শুরু হ'লে নয়। হিরিয়া স্টেজে এলে আমাকে জাগিয়ে দিও।'

হীরামনের কলিজায় একটু আঁচ লাগে।—'হিরিয়া!' বড্ড ন্যাকা মনে হচ্ছে লোকটা! চোখের ইশারায় লালমোহরকে বলে এই লোকের সঙ্গে বেশি কথা-বার্তার দরকার নেই।

ধন-ধন-ধন-ধড়াম। পর্দা উঠে যায়। হো! হো! হীরাবাঈ শুরুতেই নেমে পড়েছে স্টেজে। কাপড়ের তাঁবু কানায়-কানায় ভরা। বিস্ময়ে হীরামনের মুখ হাঁ হ'য়ে যায়। লালমোহরের কেন না-জানি এত হাসি পাচ্ছে? হীরাবাঈ-এর গানের প্রত্যেক পদে সে অকারণে হাসে।

গুলবদন দরবার সাজিয়ে বসেছে। ঘোষণা করছে যে হাজার তখ্‌ৎ বানিয়ে দেবে, তাকে যা চাইবে ইনাম দেবে। এসো, যদি থাকে এমন কর্মকার, এখনই তবে হও তৈয়ার, বানিয়ে আনো তখ্‌ৎ হাজার।

সত্যিই নাচে! কী গলা! জানো, এই লোকটা বলছিল হীরাবাঈ পান বিড়ি সিগারেট জর্দা কিছুই খায় না।

.. ঠিক বলেছে! খুব নামকরা রাণ্ডি।

...রাণ্ডি কে বলে? দাঁতে মিশি কোথায়?...বোধহয় পাউডার দিয়ে দাঁত মেজেছে। হ'তেই পারে না।...বাজে কথা বলছে কে রে? কম্পানির মেয়েছেলেকে বলছে বেশ্যা? তোমার গায়ে কথা লাগছে কেন? কে তুমি, বেশ্যার দালাল? মারো শালাকে! মারো! তোর...

হৈ-হল্লার মাঝখানে হীরামনের গলা তাঁবু ফাটাচ্ছে—'এসো, এক-এক ক'রে গর্দান খুলে নেবো।'

লালমোহর পাঁচন বাড়ি দিয়ে সামনের লোককে পটাপট পিটছে। পলটদাস একজনের বুকে সওয়ার—'শালা, সুকুমারী সীতাকে গালাগাল, তাও মুসলমান হ'য়ে।'

ধুন্নিরাম শুরু থেকেই চুপশে ছিল। মারপিট শুরু হ'তেই সে তাঁবু থেকে বার হ'য়ে স'রে পড়ল।

কালো কোট-পরা ম্যানেজার নেপালি সিপাহীর সঙ্গে দৌড়ে আসে। দারোগা সাহেব হাণ্টার দিয়ে পিট্টি শুরু করেন। লালমোহর হাণ্টারের ঘা খেয়ে হতভম্ব হ'য়ে যায়। শহুরে ভাষায় ভাষণ শুরু করে—'দারোগা সাহেব, মারছেন মারুন। কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু এই দেখুন পাশ। পকেটেও একটা আছে। দেখতে পারেন হুজুর। টিকিট নয়, পাশ।...তো আমাদের সামনে কেউ কম্পানির মেয়ে-ছেলেকে খারাপ কথা বললে ছেড়ে দিই কী ক'রে?'

কম্পানির ম্যানেজার সমস্তটাই বুঝে ফ্যালে। সে দারোগাকে বোঝায়—'হুজুর, আমি বুঝেছি। এ-সমস্ত বদমায়েশি মথুরামোহন কম্পানির। তামাশার মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে কম্পানির বদনাম। না হুজুর, এদের ছেড়ে দিন। হীরাবাই-এর লোক। বেচারার জানের ভয় আছে, হুজুরকে বলেছিলাম কিনা।'

হীরাবাঈ-এর নাম শুনে দারোগা তিনজনকে ছেড়ে দেয়। কিন্তু তিনজনেরই পাঁচনবাড়ি কেড়ে নেয়। ম্যানেজার তিনজনকে একটাকার চেয়ারে বসিয়ে দেয়—'আপনারা এখানেই বসুন, পান পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

তাঁবু শান্ত হয় আর হীরাবাঈ আবার স্টেজে ফিরে আসে। নাকাড়া ফের ঝন-ঝনিয়ে ওঠে। কিছুক্ষণ বাদে তিনজনের একই সঙ্গে ধুন্নিরামের কথা খেয়াল হয়।

—'আরে, ধুন্নিরাম গেল কোথায়?'

—'মালিক, ও মালিক!'—লহমানওয়া তাঁবুর বাইরে থেকে চিল্লাতে থাকে—'ও লালমোহর মা-লি-ক!'

লালমোহর তারস্বরে জবাব দেয়—'এদিক দিয়ে, এদিক দিয়ে। একটাকার দরজায়।'...সমস্ত দর্শক লালমোহরের দিকে ঘুরে দ্যাখে। নেপালি দারোয়ান লহমানওয়াকে লালমোহরের কাছে নিয়ে আসে। লালমোহর পকেট থেকে পাশ বার ক'রে দেখিয়ে দেয়। লহমানওয়া এসেই জিগেস করে—'মালিক, কে কী বলছিল? চেহারাটা তার একটু দেখিয়ে দিন এক ঝলক।'

লোকে লহমানওয়ার চওড়া, মসৃণ ছাতির দিকে তাকায়। শীতের দিনেও খালি গা?...চেলা-চামুণ্ডা নিয়ে এসেছে এরা। লালমোহর লহমানওয়াকে শান্ত করে।

ওদের তিন-চার জনকে শুধোবেন না নৌটঙ্কী কী দেখল। গল্প আর কার মনে আছে। হীরামনের মনে হচ্ছিল, হীরাবাঈ যেন একদৃষ্টে তার দিকেই তাকিয়ে

ছিল। নাচছিল। গাইছিল। লালমোহরের মনে হচ্ছিল হীরাবাঈ তার দিকেই তাকিয়ে। সে বুঝে গেছে হীরামনের থেকে বেশি ক্ষমতাওলা লোক হ'লো লাল-মোহর। পলটদাস গল্প বোঝে।···গল্প আর কী হবে ? রামায়ণেরই গল্প। সেই রাম, সেই সীতা, সেই লক্ষ্মণলাল আর সেই রাবণ। রামের কাছ থেকে সীতাকে ছিনাতে রাবণ রকমারি বেশ ধারণ ক'রে আসে। রাম আর সীতাও রূপ বদলান। এখানেও হাজার তখ্‌ৎ বানাচ্ছে যে মালির ছেলে সে হ'লো রাম। গুলবদন সুকুমারী সীতা। মালির ছেলের বন্ধু হ'লো লক্ষ্মণ আর সুলতান রাবণ।···ধুন্নিরামের জর এসেছে জোর। লহমানওয়ার সব চেয়ে ভালো লাগে জোকারের পাট।

—'চিড়ি তোকে না-নিয়ে যাবো রে নরহটের বাজারে।' সে এই জোকারের সঙ্গে দোস্তি করতে যায়। বন্ধু হবে না জোকার সাহেব ?

হীরামনের একটা অর্ধেক গানের কলি মনে লেগে গেছে—'ম'রে গেল গুলফাম !' কে ছিল এই গুলফাম ? হীরাবাঈ, গাইছিল—আজি, হ্যাঁ, ম'রে গেল গুলফাম। টি-ড়ি-ড়ি-ড়ি···বেচাবা গুলফাম !

তিনজনের পাঁচন বাড়ি ফিরিয়ে দিতে-দিতে পুলিশের সিপাহী বলে—'লাঠি-সোঁটা নিয়ে কখনো নাচ দেখতে আসে ?'

পরের দিন সারা মেলায় কথাটা চাউর হ'য়ে যায়—মথুরামোহন কম্পানি থেকে এবার পালিয়ে এসেছে হীরাবাঈ। তাই মথুরামোহন কম্পানি এবার আসেনি। ···এসেছে তাদের গুণ্ডারা। ···হীরাবাঈও কম যায় না। বড়ো খেলুড়ে মেয়েছেলে। তেরো-তেরোটা দেহাতি লেঠেল পুষছে। ·· কেউ-কেউ তো 'বাহ্‌ মেরী জানও' ব'লে ফেলল, ক্ষমতা আছে।

—দশদিন। দশরাত।

দিনভর ভাড়া খাটে হীরামন। সন্ধে হ'লেই নৌটঙ্কীর নাকাড়া বাজতে থাকে। নাকাড়ার আওয়াজ শুনলেই কানে ভাসে হীরাবাঈয়ের ডাক—ভাইয়া—মিতা—হীরামন—ওস্তাদ—গুরুজি ! সবসময় তার মনের কোণায় কোনো-না-কোনো বাজনা বাজতে থাকে। কখনো হারমোনিয়াম, কখনো নাকাড়া, কখনো ঢোলক, কখনো হীরাবাঈয়ের পায়জোড়। হীরামন সেই তালের সঙ্গে-সঙ্গে ওঠে-বসে, ঘোরে-ফেরে। নৌটঙ্কী কম্পানির ম্যানেজার থেকে শুরু ক'রে পর্দা টানে যে লোক সে পর্যন্ত চিনে গেছে তাকে—হীরাবাঈ-এর লোক।

পলটদাস প্রতি রাতে নৌটঙ্কী শোনার আগে শ্রদ্ধার সঙ্গে হাত জোড় ক'রে স্টেজকে নমস্কার করে। লালমোহর একদিন হীরাবাঈকে নিজের শহরে বুলি

শোনাতে গিয়েছিল। হীরাবাঈ চিনতেই পারেনি। তখন থেকে ওর মন ছোটো হ'য়ে গেছে। তার চাকর লহমানওয়াও হাত থেকে বেরিয়ে গেছে। নৌটঙ্কী কম্পানিতে ভর্তি হয়েছে সে। জোকারের সঙ্গে তার দোস্তি হয়েছে। দিন ভর সে জল টানে, কাপড় ধোয়। বলে, গাঁয়ে কী আছে যে যাবো? লালমোহর উদাস থাকে। ধুন্নিরাম অসুখ বাঁধিয়ে বাড়ি চ'লে গেছে।

হীরামন আজ সকাল থেকে তিনবার মাল নিয়ে স্টেশনে এসেছে। আজ কেন জানি না তার ভৌজির কথা মনে পড়ছে। ...ধুন্নিরাম জরের ঝোঁকে কিছু ব'লে দেয়নি তো! এখানেই কত পটর-পটর বকছিল—গুলবদন, হাজার-তখ্‌ৎ। ...লহ-মানওয়া মৌজে আছে। দিন-রাতই হয়তো হীরাবাঈকে ছাখে। কাল বলছিল—'হীরামন মালিক, তোমার কৃপায় বেশ মৌজ ক'রে আছি।' হীরাবাঈ-এর শাড়ি ধোবার পরে জল আতরগুলাব হ'য়ে যায়। 'ওর মধ্যে নিজের গামছাটা ডুবিয়ে দিই। শুঁকে দেখবেন?'

...প্রত্যেক রাতেই কারু-না-কারু মুখে শোনে হীরাবাঈ রাণ্ডি। কতজনের সঙ্গে লড়বে সে। না-দেখেশুনেই লোকে কত কথা বলে। রাজাকেও লোকে আড়ালে গালি দেয়।...আজ সে হীরাবাঈ-এর সঙ্গে দেখা ক'রে বলবে—নৌটঙ্কী কম্পানিতে থাকলে বড়ো বদনাম করে লোকে। সার্কাস কম্পানিতে সে কোনো কাজ করতে পারে না?...সবার সামনে নাচে? হীরামনের কলিজা সে-সময় দপ্‌দপ্‌ ক'রে জলে। সার্কাস কম্পানিতে বরং বাঘকে নাচাবে।...বাঘের কাছে যাবার মতন হিম্মত হবে কার? নিরাপদ থাকবে হীরাবাঈ।...কোথাকার গাড়ি যাচ্ছে?

—'হীরামন, এ হীরামন ভাই!'—লালমোহরের ডাক শুনে হীরামন ঘাড় ঘুরিয়ে ছাখে—'কী নিয়ে যাচ্ছে লালমোহর?'

—'ইস্‌টিশানে হীরাবাঈ তোমায় খুঁজছে। চ'লে যাচ্ছে সে।'—একই নিশ্বাসে শুনতে পায়—লালমোহরের গাড়ি চ'ড়েই এসেছে মেলা থেকে।

—'চ'লে যাচ্ছে? কোথায়? লালমোহর, রেলগাড়িতে ক'রে যাচ্ছে?' হীরামন গাড়ি খোলে। মালগুদামের চৌকিদারকে বলে, 'ভাই, একটু গাড়ি আর বলদ-গুলোকে দেখবেন। আমি এখুনি আসছি?'

—'ওস্তাদ!'—মেয়েদের বিশ্রামঘরের সামনে ওড়নায় মুখ হাত ঢেকে দাঁড়িয়ে ছিল হীরাবাঈ। থলি বাড়িয়ে দিয়ে বলে—'নাও। হে ভগবান, দেখা হ'য়ে গেল। জানো, আমি তো আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। এখন আর তোমার সঙ্গে দেখা হ'তে পারবে না। আমি যাচ্ছি, গুরুজি!'...বাক্স-টানা লোকটা আজ কোট-

পাঁৎলুন প'রে একেবারে বাবুসাহেব ব'নে গেছে। মালিকের মতো কুলিদের হুকুম দিচ্ছে।…'মেয়েদের কামরায় তুলবে। বুঝলে ?'

হীরামন হাতে থলি নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। জামার ভেতর থেকে থলি বার ক'রে দিয়েছে হীরাবাঈ। পাখির শরীরের মতো গরম রয়েছে থলিটা।

—'গাড়ি আসছে।'—বাক্স-টানাওলা মুখ বেঁকিয়ে হীরাবাঈ-এর দিকে তাকায়। তার চেহারায় মনের ভাবটি স্পষ্ট—এত বাড়াবাড়ির কী আছে ?

হীরাবাঈ চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। বলে—'হীরামন, এদিকে এসো, ভেতরে। আমি আবার মথুরামোহন কম্পানিতে ফিরে যাচ্ছি। দেশের কম্পানি তো ! বনৈপীর মেলায় আসবে তো, আসবে না ?' হীরাবাঈ হীরামনের কাঁধে হাত রাখে।…এবার ডান কাঁধে। আবার নিজের থলি থেকে টাকা বার ক'রে বলে—'একটা গরম চাদর কিনে নেবে।'…

হীরামনের এতক্ষণ বাদে কথা ফোটে।…'ইশ্‌শ্‌। সবসময় টাকা-পয়সা। রাখুন টাকা…। চাদর দিয়ে কী করবো ?'

হীরাবাঈ-এর হাত থেমে যায়। হীরামনের মুখের দিকে গভীরভাবে তাকায়। তারপর বলে—'তোমার মন কি ছোটো হ'য়ে গেল নাকি, মিতে ?…মহুয়া ঘাট-ওয়ারিনকে সদাগর যে কিনে নিয়েছে।' গলা ধ'রে আসে হীরাবাঈ-এর। বাক্স-টানাওলা বাইরে থেকে বলে গাড়ি এসে গেছে। হীরাবাঈ কামরা থেকে বাইরে আসে। বাক্সটানাওলা নৌটঙ্কীর জোকারের মতো মুখ বিকৃত ক'রে বলে, 'প্ল্যাটফর্মের বাইরে ভাগো। বিনা টিকিটে ধরলে তিনমাসের জন্য জেলের হাওয়া…'

হীরামন চুপচাপ প্ল্যাটফর্মের বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়।…স্টেশনের ব্যাপার, রেল-ওয়ের রাজত্ব। না-হ'লে এই বাক্সটানাওলার মুখ সোজা ক'রে দিতো হীরামন।…

হীরাবাঈ ঠিক সামনের কামরায় চড়ে। ইশ্‌শ্‌ ! এত টান ! গাড়িতে ব'সেও ফিরে-ফিরে হীরামনের দিকে চায়।… লালমোহরকে দেখে জ্ব'লে ওঠে হীরামন—'সবসময়ে পিছু-পিছু, সবসময়ে ভাগ নেয়ার ফন্দি।'

গাড়ি সিটি দেয়। হীরামনের মনে হয় তার অন্তর থেকে কোনো-একটা আওয়াজ বেরিয়ে সিটির সঙ্গে আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে। কু-উ-উ ! ইশ্‌শ্‌ !

ঝি-ই-ই-ক। গাড়ি দুলে ওঠে।—হীরামন ডান পায়ের আঙুল বাঁ পায়ের গোড়ালি দিয়ে পিষে দেয়। কলিজার ধড়ফড় ঠিক হ'য়ে যায়। হীরামন হাতের বেগুনি রুমাল দিয়ে মুখ মোছে। রুমাল হেলিয়ে ইশারা করে—এখন যাও।…

শেষ কামরা চ'লে যায়। প্ল্যাটফর্ম খালি।··· সব ফাঁকা··· মালগাড়ির কামরা। দুনিয়াই যেন খালি হ'য়ে যায়। হীরামন নিজের গাড়ির কাছে ফিরে আসে।

হীরামন লালমোহরকে জিগেস করে, 'কবে গাঁয়ে ফিরছ?'

লালমোহর বলে, 'এখন গাঁয়ে ফিরে কী হবে? এই তো কামানোর মওকা হীরাবাঈ চ'লে গেছে—মেলা এবার ভেঙে যাবে।'

—'ভালো কথা। কোনো খবর দিতে হবে বাড়িতে?'

লালমোহর হীরামনকে বোঝানোর চেষ্টা করে। কিন্তু হীরামন গাড়ি গাঁয়ের দিকে ঘুরিয়ে দেয়।···'এখন আর মেলায় আছে কী? ফোঁপরা মেলা!'

রেললাইনের ধার দিয়ে গোরুর গাড়ির কাঁচা সড়ক গেছে অনেক দূর অব্দি। হীরামন কখনো রেলে চড়েনি। তার মনে পুরোনো ইচ্ছেটা উঁকি দেয়—রেল-গাড়িতে সওয়ার হ'য়ে জগন্নাথ ধাম যাওয়ার ইচ্ছে··।

ফিরে গিয়ে খালি ছই-এর দিকে তাকানোর ক্ষমতা নেই হীরামনের। আজও তার পিঠ শুলাচ্ছে। আজও থেকে-থেকে চাঁপার ফুল বাস ছড়াচ্ছে তার গাড়ি থেকে। এক টুকরো ভাঙা গানের কলিতে নাকাড়ায় তাল কেটে যাচ্ছে বারবার।

সে ফিরে দ্যাখে—বস্তা নেই, বাঁশও নেই, বাঘও নেই,···পরী···মিতা··· হীরাদেবী···মহুয়া ঘাটওয়ারিন—কেউ নেই। মৃত মহুয়ার বোবা কণ্ঠ আজ মুখর হ'তে চায়। হীরামনের ঠোঁট কুঞ্চিত হ'তে শুরু করেছে। বোধহয় সে তিন সত্যি করতে শুরু করেছে···তিন নম্বর কসম···কম্পানির মেয়েছেলে আর তুলবে···!

হীরামন হঠাৎ বলদদুটোকে ধমকে ওঠে। পাঁচন দিয়ে বাড়ি দিয়ে বলে—'রেললাইনের দিকে ফিরে-ফিরে দেখছিস কী?' দুই বলদে কদম খুলে জোরে চলা ধরে। হীরামন গুনগুনাতে শুরু করে—'আজি, হ্যাঁ, মরে গেল গুলফাম।'

অনুবাদ : সুনন্দন চক্রবর্তী

পিঁপড়ে

গোপীনাথ মোহান্তি

আস্তে-আস্তে পা দুটো উঠে চলল, দুটো ক্লান্ত পা, একটার পর একটা। পায়ের পেশীগুলো যেন ছিঁড়ে যাচ্ছিল, বুকের মধ্যে যেন দমাস-দমাস ক'রে হাতুড়ি ঠুকছে। কার্নিশ থেকে বৃষ্টির ফোঁটা যেমন ঝ'রে পড়ে, তেমনি টুপির কিনার বেয়ে ঘামের ফোঁটা টপটপ ঝরছে। পরনের হাফ-প্যাণ্ট, জামা সব ঘামে জবজবে হ'য়ে যাচ্ছে, তবুও শরীর চলছে, কোনোমতে যেন বাতাসে ভর দিয়ে! একটু পরেই পাহাড়ের মাথায় পৌঁছনো গেল। রমেশ থামল।

অনেক অনেক নিচে, বড়ো-বড়ো গাছের জঙ্গলে ঘন অন্ধকার। উপত্যকার সিঁড়ি ভেঙে-ভেঙে যেন জঙ্গলটা নিচে নেমে গেছে কোনো নরকপুরীর দিকে। কিন্তু ঐ ওপরে, পাহাড়ের ন্যাড়া মেঝে রোদের আলোয় চকচক করছে, ধারে-ধারে ঘাসের রেখা, চারপাশে নীল আকাশ।

রমেশ মনে-মনে বললে, পাহাড়ে চড়া চাট্টিখানি কথা নয়। কিন্তু সঙ্গে যে-সব বয়স্ক মানুষ আছেন তাঁদের কাছে সে-কথা বলে কী করে! কাজেই, যেন ইচ্ছের জোরে সে ব্যথার কথা ভুলতে চাইল, আর নিচের ঠোঁট দাঁতে চেপে ঠাট্টার স্বরে অন্যদের বললে, 'কী হ'লো! এইটুকুতেই সব ক্লান্ত!' তারপর ওর নির্মেদ মজবুত শরীরে এবড়ো-খেবড়ো খোঁচা-খোঁচা পাথর পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলল।

ওর চাপরাশি বিনু উঠে এলো, ইঞ্জিনের মতো নিশ্বাস ফেলতে-ফেলতে; তার বিরাট পাগড়িটা মেটে রঙের ব্যাঙের ছাতার মতো আস্তে-আস্তে ওপরে উঠল। কালো, শক্তসমর্থ গড়ন, নাকে ও কানে সোনার রিং, ঘাড়ের থেকে ঝুলছে ফ্লাস্ক ও বন্দুক: এই হ'লো বিনু। সে উঠে এসে সাইন-বোর্ডের মতো রমেশের পেছনে দাঁড়ালে।

সমবেত গানের একটা ধুয়ো ঢেউয়ের মতো নিচে থেকে ওপরে উঠে এলো: বইলে, বইলে। একজন, দ্বিতীয় জন, তারপর আবার একজন। লম্বা ঘাসের পেছন থেকে আস্তে-আস্তে আটটা মূর্তি বেরিয়ে এলো। কটিবস্ত্র পরা কোঁধের দল, কাঁধের বাঁকে দু-পাশে চোবড়া-চুবড়ি ঝোলানো। গানটা থামল। বিনু চীৎকার করলে, 'কুঁড়ের বাদশা সব, যতই-না কেন দাবড়ানি দাও পেছন থেকে, ঠিক পেছিয়ে পড়বে ব্যাটারা।' 'বয়েস হয়েছেনি, বাবু,' কেউ-একজন জবাব দিলে; আর তারপর

হাসির দমকে ভেঙে পড়ল, একটু ফাঁক-ফাঁক হ'য়ে ছড়িয়ে ব'সে ঘরে-বানানো চুরুট ধরাতে লাগল।

বিন্নু ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে দিলে। সেই আমলা গাছের নিচে ব'সে চায়ে চুমুক দিতে-দিতে রমেশ জিগেস করলে, 'বিন্নু, তুমি আগে এসেছো এদিকে?'

'হ্যাঁ, স্যার, বছর-দুয়েক আগে শেষ এসেছি, তার আগে অনেক বার।'

'আর-কোনো অফিসার কি এর আগে এদিকে মাড়িয়েছে মনে হয়?'

'হ্যাঁ, স্যার, অনেকেই। জায়গাটা আসলে বাজাব যাবার পথে পড়ে কিনা, স্যার।'

রমেশ যেন একটু চুপশে গেল। ছেলেবেলা থেকেই সবার চেয়ে সব ব্যাপারে বড়ো হওয়ায়, এগিয়ে থাকায় তার বেজায় তৃপ্তি। বস্তুত তাব সারা জীবনটাই এক দীর্ঘ বৈচিত্র্যপূর্ণ সফলতার কাহিনী যেন! উত্তর বালেশ্বরের কোন-এক গ্রামের সেই সামান্য গেঁয়ো বালক ধীবে-ধীরে আজ তার এই বর্তমান অবস্থায়; স্কুল থেকে কলেজ, জীবনের রূঢ় প্রতিযোগিতায় একে-একে বন্ধুদের হারিয়ে যাওয়া, কেউ পেছিয়ে পড়ছে, আর দেখতে পাওয়া যায় না, জলপানি, পদক, পুরস্কার, সফলতার স্মৃতি। তারপর চাকরি, পরিচিত হবার জন্যে অপরিচিত লোকের যাওয়া-আসা, চাপরাশির সেলাম, জাবনবীমার দালালের পেড়াপিড়ি আর অনিবার্য বিয়ের সম্বন্ধ। সমস্ত দুনিয়া যেন তার কথা ভাবে, তাকে সেলাম জানায়। জীবনযুদ্ধের গোড়ার দিককার সেইসব সফলতা, নিজের গুরুত্ববোধ থেকে আস্তে-আস্তে পাকা আত্ম-বিশ্বাসে রূপান্তর, এ-সবেব জন্যে তার নিজেকে মনে হ'তো একটা কেষ্টবিষ্টু গোছের কেউ। তার চারপাশ ঘিবে ঐ যে অসংখ্য ওরা, তার দীপ্তিমান ব্যক্তিত্বের চালচিত্র হিশেবে ছাড়া ওদের আর-কোনো তাৎপর্য নেই।

কিন্তু পদে-পদে সেই নাছোড় অস্বস্তিকর বোধ! তার আগেও লোকেরা এখানে এসেছে, তার সামনে ঐ পথে তাদের পদচিহ্ন, আর তুলনায় সে তাহ'লে কত ছোটো। যখন চড়াই-এ উঠছিল তখন অন্তত এইটুকু তৃপ্তি তার ছিল: সভ্যতার থেকে উঠে-আসা সেই কি প্রথম মানুষ নয় যে এই পথে হাঁটছে? কিন্তু এখন সেই কল্পিত সুখটুকুও তার ঘুচে যাচ্ছে। আর বিন্নু খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে এই পাহাড়ের ওপরে বড়ো সাহেবের পাঁচ দিনের ক্যাম্পের ব্যাখ্যানা ক'রে যাচ্ছে। তাঁর শিকার, ফুর্তি-ফার্তা, নাচগানে অঞ্চলটাকে একেবারে শহর বানিয়ে তুলেছিল।

সে ছিল শুধু অন্য-এক সময়। মানুষ এসেছে, আবার চ'লেও গেছে; কেবল এই অরণ্য চিরদিন যেমন তেমনি অন্ধকারই র'য়ে গেল। বিন্নুর স্মৃতিচারণ চলতেই থাকল: 'সেই সেকালের ঘন জঙ্গল আর নেই, চারদিকে বন্য জন্তু সব ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কোঁধেরা সব-কিছু সাফ ক'রে ফেলেছে। এই এখানেই ছিল কোঁধেদের গ্রাম; বন কাটা পড়লে বাঘেরা গ্রামে অত্যাচার শুরু করল আর গ্রামবাসীদের সব ছেড়ে-ছুড়ে পালাতে হ'লো।'

'এখন আর কোনো জঙ্গল নেই? তাহ'লে এ-সব কী?'

'হ্যাঁ, কন্ধকাটা গাছেরাও আবার জন্মায় আর আবার জঙ্গল হয়। তবে সেই সব জঙ্গল!'

রমেশ ভাবতে থাকল: অনন্ত জনস্রোত অরণ্যের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে; ভেতরে সেঁধিয়ে যাচ্ছে, আবার পেছিয়ে ফিরে আসছে, পাহাড়ি নদীর মতো তাদের সুখদুঃখের ধারা কখনো মরেনি, এখনও যেন শোনা যায় নুড়ির ওপর দিয়ে ব'য়ে-যাওয়া তার মর্মর।

হঠাৎ এক বেদনার বোধ হ'লো তার, স্বতন্ত্র সত্তার তীব্র চেতনা যেন মিইয়ে এলো তাতে, আর তা ক্রমে মিশে গেল সেই শাশ্বত ধারায়।

বিস্কুটের গুঁড়োর চারপাশ দিয়ে পিঁপড়ের এক সরু সারি ইতিমধ্যেই তৈরি হ'য়ে গেছে। রমেশ চমকে উঠল এবং নিজে-নিজেই হাসল · 'এখানেও পিঁপড়েরা!' ওদের দেখে তার এই পাহাড়ি অভিযানের পেছনে লুকোনো মাটির তলাকার শিকড়ের কথা মনে এলো।

সে বিনুকে জিগেস করলে, 'চাল-পাচারকারীদের আমরা ধরতে পারব ব'লে মনে হয়?' 'নিশ্চয়ই, স্যার। যে-দিক দিয়েই যাক-না কেন, পাচার-করা চাল তো কাসপাওয়ালসার বাজারে আসতেই হবে। এখন মাত্র বেলা দশটা, ঐ খদ বেয়ে নামলে আমরা দুটোর আগেই বাজারে পৌঁছে যাবো। আর তার পর, বাছাধনরা পালাবে কোথায়? সব-কটাকে ধ'রে ফেলবো।' 'চমৎকার, তাহ'লে আর দেরি না-ক'রে বেরিয়ে পড়া যাক, চলো।'

বিশ্রাম মাটি হয় দেখে বিনু বিরক্ত, এখানে এই পাহাড়ের ওপরেও একটু বিশ্রামের উপায় নেই। ও তখন কোঁধেদের দিকে চীৎকার ক'রে তাদের এগোবার জন্যে নির্দেশ দিলে। অসন্তোষে কোঁধেরাও গজগজ করতে থাকল। একটু বিশ্রাম নেবার উপায় নেই, শুধু ছোটো, জোরে ছুটে চলো। ওদের অদ্ভুত আদিম ভাষায় তারা বিনু আর তার বাপ-ঠাকুর্দার ওপর গালমন্দ ক'রে বললে। এই লোকগুলো, ওরা ভাবতে থাকল, জানে শুধু ফরমাশ করতে: জল আনো, জ্বালানি কাঠ আনো, মাল বও। শুধুমাত্র কয়েকটা আদেশের দুটো-একটা শব্দই যেন কেবলমাত্র শিখেছে ওরা। ওদের ক'ষে গাল পাড়ায় কোনো ক্ষতি নেই! কোঁধেরা নিজেদের

মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, এই লোকগুলো নিশ্চয়ই আহাম্মুক আছে, নইলে সীমানার ওপারে চাল বিক্রি করার জন্যে লোক ধরতে বেবিয়েছে। খিদে তো সবারই আছে, আর যে যেখান থেকে পারবে কিনবে, চাল কেনবার অধিকার তো সবাবই রয়েছে। এর মধ্যে অপরাধটা কোথায় ? তবে কি এই লোকগুলোর ন্যায়-বিচারের কানুন আলাদা ; যে-কানুনে মদ চোলাই অপরাধ, বনের গাছ কাটা অপবাধ, চাল কেনা অপরাধ, সারাদিন ভারি মাল ব'য়ে-ব'য়ে ক্লান্ত হ'য়ে ব'সে-পড়া অপবাধ ? তবে, আর তো কথা বলার সময় নেই। চাপরাশি এবার গাল দিতে আরম্ভ কবেছে, সাহেবও জোর কদমে রওনা দিয়েছে। কোঁধেরা উঠে দাঁড়ালে। ওদের সব অভিযোগ মিলে-মিশে একটা গানের ধুয়োর রূপ নিয়ে নিল।

সামনে ঘন বন। খদ বেয়ে রাস্তাটা নেমে গেছে যেন একটা সুড়ঙ্গের মতো। ওদেব সম্মিলিত গান রমেশের বেশ লাগল। যেন সান্ত্বনার মতো লাগছে। মানে কী এই গানের ? হয়তো সম্প্রদায়েরই কোনো প্রচলিত কাহিনী। 'বিনু,' রমেশ গর্জন ক'রে উঠল।

বিনু তেতো-তেতো হ'য়ে ভেতরে-ভেতরে ওকে গাল পাডতে-পাডতে দৌড়ে গেল। পঞ্চান্ন বছর বয়সে ছটা দাঁত নেই, মাথার ওপরে টেকো জায়গাটা ক্রমশ বড়ো হ'য়েই চলেছে, শরীর একটু মৃদুমন্দ তালে চলতে চাচ্ছে, একটু ধীরে-সুস্থে, একটু র'য়ে ব'সে। তা এই ছোকরা সাহেব সব্বাইকে তাডিয়ে বেড়াবে, নিজেও পাগলের মতো ছুটবে আর অন্য সকলকেও পাগল বানিয়ে ছাডবে। বিনুর অবশ্য খেয়ে-প'রে থাকবার মতো যথেষ্ট আছে, চাকরি সে ছেড়েই দিতে পারে। কিন্তু এই চাকরিতে যে-ক্ষমতাব জোর আছে সেটা ছাডা তো তার জাদু সব গেল, তখন তো সে ঐ অসংখ্য হেঁজিপেঁজি আর পাঁচজনের মতো, ঐ যাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে তার সারাটা জীবন চলেছে। তার এই রহস্যময় জাদুর ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবার ভয়, ঐ জাদুর ভয়ংকর আকর্ষণই তাকে পাহাড়ে চডিয়ে ছাড়ল।

'বিনু, কী সুন্দর গান গাইছে এই লোকগুলো,' রমেশ বললে।

'হ্যাঁ, স্যার, সত্যিই খুব সুন্দর।'

'কিন্তু এ-গানের মানে কী ?'

তার পাগড়িটাকে এপাশ-ওপাশ ক'রে, মুখের ভেতরকায় পানটাকে আর-একটা মোচড় দিয়ে বিনু জ্ঞানী লোকের মতো ব্যাখ্যা করতে শুরু করলে, 'এটা তো হ'লো গিয়ে ঐ চোং উৎসবের গান।'

'কিন্তু এর মানে কী ?'

'ঐ তো স্যার, সেই একই পুরোনো গল্প—ধাঙড় আর ধাঙড়ির অবিবাহিত আদিবাসী ছেলেমেয়ে। প্রেমের কাহিনী।'

'ওরা কি সবসময়েই এই গান গায়?'

'হ্যাঁ, স্যার, সবসময়।'

'বইলে মানে কি জুঁই?'

'ঠিক ধরেছেন, স্যার। এইভাবে এগোলে আপনি শীগগির ওদের ভাষায় একেবারে পারদর্শী হ'য়ে উঠবেন।'

এই উত্তরে রমেশ খুশি হ'লো এবং জিগেস করলে, 'ওরা কি থুরথুরে বুড়ো বয়সেও গান করে?' 'আমাদের এই দেশে তো কেউই বুড়োয় না, স্যার।' রমেশ মনে-মনে কথাটা খেয়াল করলে। বইলে মানে তবে জুঁই আর কোঁধেরা শুধু প্রেমের গান গায়।

রমেশকে বোকা বানাতে পেরে বিন্নুও খুশি। আর কোঁধে মজুররা তাদের হাঁটা চালিয়েই গেল, ওদের অনন্ত দুঃখের আর দুর্ভাগ্যের গান গাইতে-গাইতে আর সর্বক্ষণ ঐ সাহেব আর তার হতভাগা চাপরাশিকে গাল পাড়তে-পাড়তে।

দলে-দলে কোঁধেদের সঙ্গে রাস্তায় তাদের দেখা হ'লো, তারা পরস্পরকে দেখে হাসল, মশকরা বিনিময় করল, একসঙ্গে সুরও ধরল আর যন্ত্রণার একই নিষ্ঠুর, নিয়তি ব'য়ে চলল। গানগুলোর মধ্যে যে ঠাট্টার একটা মেজাজ আছে তা কত সহজে তারা নিজেদের মধ্যে উপভোগ করল। ওদের গান যখনই ঝিমিয়ে আসছিল তখনই বিন্নু ওদের দিকে চীৎকার ক'রে গান চালিয়ে যেতে বলছিল। 'আমাদের দেশে কেউই বুড়োয় না।' বিন্নুর কথাগুলো যেন একটা নতুন রূপ নিল আর তার নিজের কাছে এক অন্যমনে ধরা দিল। সে তার ছোটো গিন্নির কথা ভাবলে, তার তিন নম্বর বৌ, অনেকের আশায় ছাই দিয়ে সে ওকে ছিনিয়ে এনেছে, তার বাপ-মাকে অনেক বেশি 'কনে যৌতুক' দিয়ে। এই অরণ্য-অঞ্চলে শ্রেষ্ঠত্ব মানে হ'লো গায়ের জোরে ছিনিয়ে নেয়া, আর এ-ব্যাপারে মানুষ কখনো-কখনো জন্তু-জানোয়ারেরও বাড়া। কিন্তু বিন্নুর চালাকির তলায় লুকোনো রয়েছে সারাজীবনের এক ব্যর্থতা-বোধ। তার বাগিচা, জমি, বাড়ি, গোরু সব ছিল—শুধু তার নিজের একটা সন্তান ছাড়া। বয়েস বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে এই শূন্যতা সে যেন মর্মে-মর্মে টের পায়। তার ছোটোবৌয়ের কথা মনে এল তার আর ভাবনা হ'লো বড়ো দু-বৌ তাকে না-জানি কী করছে। এ-দেশে কোনো স্ত্রী যদি তার স্বামীর সঙ্গে সুখী না-হয় তাহ'লে সে সোজা ছেড়ে চ'লে যায়। বিন্নুর এখন দুর্ভাবনা হ'তে থাকল তার ছোটো বৌ

তার সঙ্গে সত্যি সুখী কিনা তা ভেবে। আর তখন তার মনে পড়ল সেই ছোকরা চাপরাশি বিশির কথা, এক দূর সম্পর্কের নাতি, প্রায়ই ওর বাড়ি আসে ঠাকুমার সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা করতে।

'বিনু।'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'আচ্ছা, এই যে পাচার-করা চাল এখনো চোখে পড়ল না, এটা কেমন ব্যাপার বলো তো? মাদ্রাজে পাচার করার জন্য ওরা চাল নিশ্চয়ই কোথাও মজুত ক'রে রাখে আর ব্যবসায়ীরা নিশ্চয়ই সেখান থেকে মাল নিয়ে যায়। কিন্তু আমরা যদিও প্রায় চারদিন ধ'রে হেঁটে চলেছি সেই কোরাপুট থেকে, তবুও এ-রকম কিছু তো এখনও চোখে পড়ল না।'

'চোখে পড়ত, স্যার, যদি বস্তা-বস্তা ক'রে চাল সরানো হ'তো।' এ-কথা ব'লে বিরক্তিতে বিনুর মনে পড়ল সে নিজে কী ভাবে শ খানেক মণ চাল চড়া দামে পাচার করতে পেরেছিল। ওর বিশ্বাস যে-সমাজে প্রত্যেককে যার-যার মতো ক'রে খাবার ব্যবস্থা করতে হবে, সে-সমাজে অন্যের পিছে লাগা, অন্যকে ঠকাবার চেষ্টা করা, তাদের জক দিয়ে রমরমা হ'য়ে-ওঠা খুবই স্বাভাবিক এবং ন্যায্য। ও ভাবলে, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আইন ভঙ্গ করা এবং ধরা পড়বার ভয়ে-ভয়ে থাকা এই ধরনের স্বার্থ-পর ব্যবস্থার খুব স্বাভাবিক পরিণতি। ও কথাবার্তার মোড় ঘোরাবার চেষ্টা করলে।

'আলাদা-আলাদা এক-একজনে যে খুব বেশি চাল পাচার করবার চেষ্টা করছে, তা তো নয়। আপনি, স্যার, বাজারে দেখতে পাবেন, নিচের সমতলের ছোটো-ছোটো খুচরো খদ্দেররা দশ কেজি কুড়ি কেজি ক'রে মাত্র কিনছে। মাত্র কয়েক মাইল দূরেই তো মাদ্রাজ সীমান্ত, সেখানে দেখবেন ফড়েরা অপেক্ষা করছে, গোরুর গাড়ি নিয়ে, চটের বস্তা নিয়ে আর বাক্সভর্তি টাকা নিয়ে। তারপর গোরুর গাড়ি বোঝাই হ'য়ে চাল চ'লে যাবে বিশাখাপত্তনম্, পার্বতীপুর এবং আরো অন্যান্য জায়গায়। 'ব্যাবসাদাররাই তো ব্যাবসা-বাণিজ্যের মূল কথাটা বোঝে, স্যার।'

রমেশ গম্ভীর হ'য়ে বলে, 'চালের মজুতটা ফড়েদের হাতে গিয়ে পড়ার আগেই কিন্তু আমাদের ধরতে হবে।'

শিকারীর চোখের মতো এক অদ্ভুত আলোয় তার চোখ দুটো যেন জলজল করতে লাগল। একটাই কথা এখন তার মাথায় চেপে বসেছে। অন্যেরা আমাদের চাল চুরি ক'রে নেবে কেন? ওর মনে হ'লো এটা যেন তার কোনো ব্যক্তিগত অধিকারে হাত দেয়া হচ্ছে আর তা রুখতেই হবে।

'আমাদের চাল' বলার সময়ে তার চেতনায় একটা ছবিই কেবল ছিল : সে একজন ওড়িয়া, তার পেছনে রয়েছে উড়িষ্যার ইতিহাস, যুদ্ধের গল্প, অন্যদের ওপর অত্যাচার ক'রেও সাম্রাজ্যের বিস্তার। অতীতের ধুলোর স্তূপ ও ভাঙা ইটের মধ্যে থেকে তার মন আবার বর্তমানের অবনতিতে ফিরে এল আর এর দায় সবটুকুই সে প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর ওপর চাপাতে চাইলে।

সবাই মিলে তো দেশটাকে খেয়ে ফেলেছে ও একেবারে ফোঁপরা ক'রে দিয়েছে। আর কী চাই আবার? সে নিজের মনে জিগেস করলে। জঙ্গলের রাস্তায় নিচের দিককার শিকারের কথা তার আবার মনে হ'লো। চাল-পাচারকারীদের পেড়ে ফেলবার আশায় তার মনটা একেবারে মশগুল হ'য়ে রইল। দাঁতে দাঁত চেপে বললে, 'একবার যদি ধরতে পারি ওদের!'

কিন্তু ধরতে পারলে যে কী করবে তা তার জানা ছিল না। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে সে তাড়াতাড়ি নেমে চলল।

শীতের শেষ, হাঁটতে-হাঁটতে গা গরম হওয়ায় এখন অনেকটা বসন্তের মতো লাগছে। ফুলে ও পাতায় গাছ ছেয়ে আছে। আমবাগান, মাঠ, ফসল মাড়াইয়ের জমি, সারি-সারি বাড়ি। রাস্তার ধারে একটা বাচ্চা ছেলে দাঁড়িয়ে, এত অপরিচিত লোকজন দেখে সে মা-মা ক'রে কাঁদতে-কাঁদতে পালিয়ে গেল। এই তো সবে শুরু। বাছুরগুলো রাস্তার পাশে-পাশে দড়িবাঁধা অবস্থায় হাম্বা রবে ডেকে উঠল। মেয়েরা সব ভেতর দিকে স'রে-স'রে গিয়ে বড়ো-বড়ো শূন্য চোখে তাকিয়ে রইল। একে-একে গ্রামবাসীরা কাছে এলো। ছবিটা রমেশের খুব চেনা মনে হ'লো। তার পা যেন আর চলছে না। এক ঝাঁকড়া গাছের ছায়ার নিচে দাঁড়িয়ে সে পেছন ফিরে তাকালে। পেছন দিকে পাহাড়টা দাঁড়িয়ে আছে কল্পনায় এক বিদ্ঘুটে ভুতুড়ে চেহারা নিয়ে। বিনু নেমে আসছিল ধীরে-ধীরে হাঁপাতে-হাঁপাতে, পেছন-পেছন কোঁধেরা প্রায় দৌড়ে।

'এখানে একটু খাবার জল পাওয়া যাবে, বিনু,' সে জিগেস করলে।

'তা আর যাবে না, স্যার!' বিনু একেবারে বশম্বদ। মোটঘাটের বাঁধাছাঁদা খুলে-গেলাশ আর লোটা হাতে গ্রামের দিকে দৌড়ে গেল। কোঁধেরা একটু বিশ্রামের জন্য ব'সে পড়ল। রমেশও অপেক্ষা ক'রে রইল। মুহূর্তের মধ্যে কোথা থেকে একটা খাটিয়া বেরিয়ে এলো আর একজন এক লোটা গরম দুধ নিয়ে দাঁড়িয়ে। আর-একজনের হাতে পাকা এক ছড়া কলা, ওড়িয়া ও তেলুগু মেশানো এক রকমের জগাখিচুড়িতে সে কাতর অনুরোধ জানিয়ে বললে, 'অনেক বেলা হ'য়ে গেছে, স্যার,

সূর্য মাঝ-আকাশ প্রায় ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আপনি এখানে একটু বিশ্রাম নিয়ে কিছু না-খেয়ে গেলে এ-গ্রামের লোকেরা খুব দুঃখ পাবে, স্যার।'

বিশ্রাম! রমেশ নিজে-নিজে হাসল। সমস্ত পথ ধ'রে সবার কাছেই ঐ একই নিমন্ত্রণ। যেন বন ও পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে সবাই একে অন্যের ওপরে ভর করতে চায়। এখানে একটু থেমে যান, আমাদের গ্রামে এই রাতটা কাটিয়ে যান। চেনা গাছের ছায়া, আধো-চেনা কুঁড়ে ঘরের চালের ওপর দিয়ে ধীরে গড়িয়ে যাওয়া ধোঁয়ার কুণ্ডলি, মেয়ে-পুরুষের দৈনন্দিন দিনযাপনের ব্যস্ততা। বনের মধ্যে, পাহাড়ের ওপরে সর্বত্র মানুষজনের চেনা পরিচিত জগৎ।

তবুও, তাকে এগিয়ে যেতে হবে। পেছনে ফেলে-আসা গ্রামবাসীদের সস্নেহ স্বাগতম এক সুগন্ধের মতো তাকে জড়িয়ে থাকবে, তারপর আস্তে মিলিয়ে যাবে উদাসীন বাতাসে।

জল নিয়ে বিনু ফিরে এল। রমেশ সবটুকু খেয়ে ফেলে বলল, 'এবার চলা যাক।' হঠাৎ এক বৃদ্ধা মহিলা কোথা থেকে এসে পথের ওপরে দাঁড়ালেন। বয়সের রেখা-পড়া মুখে এক হাসির ঝলক, তিনি বললেন, 'বাবা, এই এত বেলায়, কিছু মুখে না-দিয়ে কী ক'রে যাবে তুমি? তোমার মা হ'লে কি এভাবে তোমাকে ছাড়তেন? এ-গ্রামে কি তোমার মা-বোন কেউ নেই?'

সবার মুখেই হাসির রেখা। বৃদ্ধা জাতিতে কোঁধডোরা, কোঁধ আর তেলুগুর মিশোল।

তার রোদেপোড়া চোখের ওপর ঘন শীতল ছায়ার আস্তরণের মতো মনে হ'লো রমেশের। কিন্তু সে জোর গলায় বললে, যেন নিজেকেই সে বোঝাতে চাচ্ছে, 'না, না, তা হয় না, আমাদের যেতেই হবে। অনেক কাজ প'ড়ে রয়েছে।' সে নিজেকে টেনে নিয়ে চ'লে গেল। মায়ের মতো ঐ বৃদ্ধার মুখের ছায়া তার স্মৃতিতে গাঁথা হ'য়ে রইল। সব মায়ের চোখের মতোই, তাঁর চোখেও সেই গভীর দৃষ্টি আর তাঁর মুখে সেই শাশ্বত 'অলস'। ওঁর তো কোনো জাত নেই, কোনো ভাষা নেই। উনি শুধুই মা। মুহূর্তের মধ্যে হাতের কাজের কথা যেন সে ভুলে গেল। কিন্তু মাথায় চাল বোঝাই ক'রে নিয়ে লোকেদের বাজারের দিকে যেতে দেখে আবার সেই কাজের কথাই মনে প'ড়ে গেল।

'বিনু, বাজার আর কতদূর?'

'আর একটুখানি, স্যার। প্রায় এসে গেছি।'

'সাবধান, কোনো চ্যাচামেচি না, কোনো গোলমাল না।' বিনু কোঁধেদের

সাবধান ক'রে দিলে আর যেন গান না-গায়, চুপচাপ যেন হেঁটে চলে। বনের মধ্যে শিকারীদের মতো এবার নীরবে সন্তর্পণে এগিয়ে যাওয়া। বাইরে গভীর নীরবতা, কিন্তু ভেতরে যেন তোলপাড় চলছে। যে-কাজ করতে হবে তার সমস্তটার ওপর দিয়ে রমেশ দ্রুত একবার তার মন বুলিয়ে নিলে। সে শুধু একদিনের জন্য পাচার বন্ধ করবে না; সরকারের কাছে দেয়া তার রিপোর্টে সে এর একটা স্থায়ী প্রতিকার করবে। তাতে তার প্রশংসা হবে, সে স্বীকৃতি পাবে এবং উন্নতির মই বেয়ে ওঠা আরো ত্বরান্বিত হবে। এ যেন পরীক্ষায় জলপানি পাওয়া কিংবা বিশেষ কৃতিত্ব পাবার মতো। ওর মনে হ'লো সে এর জন্যে খুবই যোগ্য। কারণ ওর ব্যাপারটা কি কালো আফ্রিকায় লিভিংস্টোনের মতো নয়? সীমান্তের ওপারে বে-আইনি চাল পাচারের মূল উৎস খুঁজে বার করা? গোটা ব্যাপারটা এ-রকম সুচতুর ও দক্ষভাবে পরিচালনা করতে পারার জন্য সে নিজের ওপরেই মুগ্ধ হ'য়ে রইল।

একটু এগিয়ে, রাস্তার ধারে, একটা পরিবার গাছের ছায়ায় তাদের সারাদিনের খাবার খাচ্ছিল। একটা ছোটো বাচ্চা বেজায় হাত-পা ছুঁড়তে-ছুঁড়তে মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছিল, আকাশের দিকে মুখ তুলে চিৎ হ'য়ে শুয়ে। নীল আকাশ ভ'রে যাচ্ছে তার চিল-চ্যাচানিতে। ছেঁড়া তেনা পরা এক তরুণীর কুঁকড়ে-যাওয়া মূর্তি, চুল এলোমেলো, তাড়াতাড়ি তার খাবারের পাতার থালা ফেলে, হাত পর্যন্ত না-ধুয়ে, বুকের ছেঁড়া কাপড়টুকু কোনোমতে সরিয়ে স্তনদুটো ঠেশে ধরলে বাচ্চাটার মুখের মধ্যে। শুকনো স্তনও ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো ঝুল-ঝুল করতে লাগল। কোলের মধ্যে বাচ্চাটাকে আঁকড়ে ধ'রে ঐ তরুণী মা ড্যাব-ড্যাব ক'রে তাকিয়ে রইল অপরিচিতদের দিকে। ও যেন কোনো মানুষই নয়, শুধু কিছু অবিন্যস্ত চুলের জটা আর দূরের দুই উদাসীন চোখ! ঐ চোখে কোনো সংবাদের আকাঙ্ক্ষা নেই, কারো কীর্তির জন্য কোনো গ্রাহ্য নেই। বাইরের জগতের কোনো অস্তিত্বই তার কাছে নেই। দেখে মনে হয় যেন বাইরের বিশ্বের দিকে তাকানো, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ চোখ গভীরভাবে তাকিয়ে রয়েছে জীবনশক্তির তলানির দিকে, সেখানকার রক্ত-মাংসের গাদের দিকে। যেখানে খিদে শেষ পর্যন্ত যন্ত্রণা দেয়, স্নেহ প্রেম শেষ পর্যন্ত ডানার আড়াল দিয়ে পাখির বাচ্চাদের মতো ঘিরে রাখে। আরো তিনজনও ভাত খাচ্ছিল: এক বুড়ো পুরুষ মানুষ, এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ও ঐ তরুণীর স্বামী। শুধুই হাড় ও চামড়া, চোখের কোলে গর্ত, ঘন ঝাঁকড়ামাকড়া চুল কপালের ওপরে। চোখগুলো কখনো-কখনো চকচক ক'রে উঠছে। পাতার থালায় ভাতের দলা জল-জল করছে। একে খাওয়া বলে না, ক্ষুধার্ত কুকুরের মতো এক নিশ্বাসে গবগব ক'রে

গেলা। গাছের নিচে, কানা ভাঙা তোবড়ানো রান্নার বাসনপত্র আর-ঠেকো দিয়ে বানানো উনুন আকাশের দিকে যেন হাঁ ক'রে রইল। তার নগ্ন বাস্তবতায় এই সমস্ত ছবিটা যেন রমেশকে আক্রমণ করলে।

'এরা কারা, বিনু?'

'খদ থেকে উঠে-আসা তেলুগুরা, স্যার। খিদের তাড়ায় ওদের মতো কতই তো জঙ্গলে ঘুরছে।'

'তোমাদের ঘর কোথায়?' রমেশ তাদের দিকে ফিরল। আরো বার-দুয়েক প্রশ্নটাকে জিজ্ঞাসা করার পরে, বুড়ো মানুষটি উত্তর দিলে, পাতার থালা থেকে মাথা না-তুলে, বেশ বিরক্ত হ'য়ে, 'সীমাচলম্।'

বিনু রমেশকে বুঝিয়ে দিলে জায়গাটা এখান থেকে ষাট মাইল দূরে। রমেশের মনে পড়ল: এককালে জায়গাটা উড়িষ্যার অংশ ছিল। ইতিহাস তার সামনে এক বিরাট উঁচু অন্ধকার পাহাড়ের মতো হ'য়ে দাঁড়াল, তারপর ছোটো হ'তে থাকল, আরো-ছোটো, প্রায় একটা যেন মাটির ঢিবি আর তারপর হঠাৎ তা যেন ডুবে গেল ঐ তরুণী মায়ের ঠাণ্ডা চোখের গর্তের মধ্যে বাচ্চাকে আদর করতে-করতে দুধ-খাওয়ানো ঐ মা। মুহূর্তের মধ্যে রমেশ বুঝল জায়গাটা এখন আর হয়তো উড়িষ্যায় নেই, কিন্তু এই বিশাল পৃথিবীর একটা অংশ তো বটেই, আর তার মানুষজনেরাও সেই সুপ্রাচীন খিদের জ্বালায় মুহ্যমান।

'এদের মতো অনেকেই তো এ-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, স্যাব। খিদেব ভয়ে এরা বনজঙ্গল জন্তুজানোয়ারের ছোটোখাটো ভয় কাটাতে পেরেছে,' বিনু বললে।

'হক কথা, হক কথা,' কোঁধেরা সমস্বরে ব'লে উঠল। ওরা এখন অনেক কাছে এগিয়ে এসেছে, একজন বৃদ্ধ কোঁধ বললে, 'খিদের অথবা যন্ত্রণাব আক্রমণে সব মানুষই সমান। দ্যাখেন, কেমন ক্ষুধা আমাদের। চাপরাশিবাবু, খাবারের ব্যবস্থা কী আমাদের?'

রমেশ নীরবে হেঁটে এগিয়ে গেল। হঠাৎ তার লক্ষ্য সম্বন্ধে কেমন যেন অন্ধকার, সব গোলমাল হ'য়ে যেতে থাকল। সে তো ন্যায়বিচারই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল, কিন্তু এখন আর ঐ শব্দটার মানে সে বুঝতে পারছে না। এ পর্যন্ত সে চিরকাল চলতি ধাঁচধোঁচ ও চিরাচরিত পদ্ধতির সহজ পথের ওপর নির্ভর ক'রে এসেছে, চালু ও লেখাজোখা আইনের কাছে সে সর্বদা মাথা নুইয়েছে, এবং ও-সবের পেছনে কী আছে তা খুঁটিয়ে সন্ধান করতে যাওয়াটা সে ভুল ব'লেই জেনে এসেছে। কখনো-কখনো তার ন্যায়-বিচারবোধের সঙ্গে আইনের বিরোধ বেধেছে, কিন্তু সে নিজেকে

বোঝাবার চেষ্টা করেছে যে কলের ঘানির মতো কর্তব্য তো কঠিন ও নিষ্ঠুর। খিদের তাড়ায় কেউ কিছু চুরি করেছে, তার গর্ভবতী স্ত্রী হয়তো এক বছরের বাচ্চা কোলে নিয়ে কাছারিবারান্দায় আছাড়িপিছাড়ি খেয়ে চীৎকার করেছে যে, তাদের দেখবার আর-কেউ নেই। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি ; চুরি করলে চোরকে তো জেলে যেতেই হবে। আইন তাই বলে। কারো হয়তো আগে পাঁচবার খাটতে হয়েছে ব'লে একটা কুমড়ো চুরি করার অপরাধে পুরো এক বছর জেল হয়েছে। কর্তব্যের দাবি বড়ো কঠিন ও নিষ্ঠুর, এই ওর মনে হ'তো ; কোনো মায়াদয়ার স্থান নেই সেখানে। সে আবার নতুন ক'রে সিদ্ধান্ত নিলে ; চাল-পাচারকারীদের ধরতেই হবে তাকে। বাজারের গোলমাল এখন আরো অনেক কাছে মনে হচ্ছে। পচা আঁশটে কাঁচা চামড়ার গন্ধে চারিদিক ভ'রে আছে। দলে-দলে লোক বনের গাছ-গাছালির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে। কারো মাথায় বোঝা, কারো-বা কাঁধের ওপরে বসানো বাঁকের দু-ধারে ঝোলানো চুবড়ি। দু-একটা চুবড়ির ভেতর থেকে ছোটো বাচ্চা উঁকি দিচ্ছে। থোকা-থোকা মুরগি, পা বাঁধা, মাথা নিচের দিকে ওলটানো, এ-রকম আরো অনেক জিনিশপত্র, চাল সব ঝুলছে। শিকার শেষমেষ হাতের একেবারে কাছে মনে হচ্ছে। রমেশের বুকের কাছে হঠাৎ যেন দলা পাকিয়ে উঠল। পাথরের ধাপে-ধাপে প্রায় দৌড়োতে-দৌড়োতে রমেশ চেঁচিয়ে উঠল, 'বিনু, এবার ওদের পেয়েছি।'

ওদের সামনে এখন বাজার। দলা-পাকানো মানুষ, চারপাশে পিঁপড়ের মতো ঝাঁকবাঁধা। রঙের বিচিত্র বর্ণসজ্জা, অনেক রকমের, গন্ধ, একঘেয়ে আওয়াজের ঐকতান। কাঁচা চামড়ার দুর্গন্ধে দম-আটকানো বাতাস ; সারি-সারি দোকানে শুঁটকি মাছ বিক্রি হচ্ছে। চারদিকে মাছি ভনভন করছে ; মানুষও। পাশের বন থেকে হাওয়ায় ভেসে আসছে চোলাই মদের কড়া গন্ধ। কুষ্ঠ রোগী, 'ইয়স' ঘা ভর্তি লোক, কুকুরের গায়ের দগদগে ঘায়ের মতো, বড়ো-বড়ো 'ইয়স' ঘায়ের দাগ, ছোটো-ছোটো কালো এক রকমের পোকা ঘিরে রয়েছে ঘায়ের ওপরে। সুস্থ নারীপুরুষেরা এই গাদা-গাদি লোকের মধ্যে দিয়েও পথ ক'রে চলেছে ঠেলাঠেলি ক'রে। এই তো বাজার।

হঠাৎ রমেশের নজরে পড়ল এক তরুণী মেয়ে, গায়ের রং চাঁপা ফুলের মতো, সুঠাম শরীরের গড়ন। তার এক গালে 'ইয়স'-এর ঘা, অন্য গালটা লাল হ'য়ে আছে, সেখানেও 'ইয়স' শুরু হয়েছে। তবুও সে নিজেকে ফুল দিয়ে সাজিয়েছে, ধীর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে, মুখে কিছু-একটা চিবোতে-চিবোতে, সৌন্দর্যের মূর্তি।

চোখের কোণায় তাকলে মেয়েটি, একটু যেন হাসির রেখা, অন্যদের জন্য যেন মেলার আমন্ত্রণ। রমেশ চোখ বন্ধ ক'রে বাজারের মাঝখানে একটা গাছের গায়ে হেলে দাঁড়লে। তার কানে এসে গোলমালের ঢেউ ভেঙে-ভেঙে পড়ছে। মনের চোখ দিয়ে সে ঐ তরুণী মেয়েটিকে দেখল, গালে 'ইয়স'-এর ঘা, চোখে হাসির রেখা। পাহাড়ের মাথায় কোঁধ যুবকদের নাচ।

আর তখন সে জানল। ঘন বনের মধ্যে পাহাড়ের মাথায় মানুষেরা থাকে। তার আগুনের কুণ্ডে আগুন ঠাণ্ডা বাতাস ও নির্মম প্রকৃতিকে উপেক্ষা ক'রেও জ্বলতে লাগল।

মানুষ তো দলুয়া ধানের মতোই ; যত জল, তত গাছের বাড। গালে 'ইয়স'-এর ঘা আর কুষ্ঠ—মুখে হাসির বেখা। সমস্ত জীবনীশক্তিকে নিংড়ে নিয়ে একটা গোলাপ ফুটেছে, যদিও পাপড়িগুলো মোচড়ানো, পোকায় খাওয়া। হয়তো শুকিয়ে ঝ'রে যাবে। তবুও তো হাসছে।

বিনু ফ্লাস্ক খুলে চা ঢালল। ডাকলে, 'স্যার।' রমেশ চোখ খুলল। তার চারপাশে লোকের ভিড় বেড়েই চলেছে। বিনু ওর কানে-কানে ফিশফিশ ক'রে বললে, 'গাদা-গাদা চাল বিক্রি হচ্ছে, স্যাব, সবই ধরা যায়, কিন্তু এখানে নয়। বাজারটার পেছনে একটা মোক্ষম জায়গা আছে, একটা সরু নিচুমতো গলি, একটা কুঁড়ে ঘরে গিয়ে মিশেছে। সেখানে আমরা ওৎ পেতে থাকতে পারি। সেখান থেকে ব্যাপারটা হবে প্রায় মাচানে ব'সে বাঘ শিকারের মতো।' বিনু হাসল।

তারা সবাই সেই জায়গাটায় গেল। রমেশ একটা চেয়ারে বসল। বিনু বেরিয়ে গেল, যাবার সময় ব'লে গেল, 'আমি এখন যাচ্ছি। ব্যাপারটার শেষ কাজকর্ম গুছিয়ে রাখি গে।'

রমেশ ব'সেই রইল। অল্পদূরে পাহাড়ের ঢালের একটু ওপরের দিকে একটা কোঁধ বস্তি। ফাঁকাতে খাটিয়া পাতা রয়েছে। মানুষের গা ঘেঁষে কুকুর ল্যাজ নাড়াচ্ছে। কয়েকটা ছোটো ছেলে প্রাণভরে একটা বিশাল ঢাক পেটাচ্ছে। দরজার চৌকাঠে ব'সে এক বুড়ো বমি করছে। এক বুড়ি উদ্বেগে তার পিঠে হাত বুলোচ্ছে। নিশ্চয়ই ম্যালেরিয়ার জ্বর। দেয়ালের ভাঙাচোরা স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে একটা ছাগল গাছের ডগা চিবোচ্ছে, রমেশের চোখ ঐ দৃশ্যের ওপর স্থির, সময় ব'য়ে গেল। গা থেকে সে ঘাম মুছে নিলে, নাকের ভেতর থেকে বাজারের ধুলো ঝেড়ে বার করবার চেষ্টা করলে। বেলা পড়ে আসছিল, শীতের শেষ এখন, রোদ্দুরে ছায়া লম্বা হ'লো, এক সাধারণ বস্তির সরল দিনযাপনের ছবি সেই ধূসর বেলায় ছড়িয়ে রইল।

হঠাৎ কেউ যেন কাঁদতে আরম্ভ করল। সব বাড়ি থেকে লোকেরা বেরিয়ে ছুটল, যে-বাড়ি থেকে কান্নার আওয়াজ আসছিল সে-দিকে। বাড়ির সামনে, দোরগোড়ায় দেখতে-দেখতে ভিড় জ'মে গেল। চোখ মুছতে-মুছতে, বুক চাপড়াতে-চাপড়াতে তারা সবাই তারস্বরে কাঁদল। ক্রমে-ক্রমে এই কান্না রূপান্তরিত হ'লো তালে-বাঁধা এক করুণ মৃত্যুসংগীতের আর্ত ঐকতানে।

'হায়! হায়! চ'লে গেল, ও চ'লে গেল!' বিনু ফিরে এলো, যেন ভুঁইফোঁড়। 'স্যার, সবকিছু ঠিক ক'রে ফেলেছি। পাইকরা বাজারে ছিল। সব পাচারীগুলোকে এদিকে তাড়িয়ে আনতে বলেছি।'

'ওখানে কী হয়েছে, বিনু?'

'ও কিছু না, স্যার, কেউ মরেছে। পাহাড়ি জরেই হবে। ও তো নতুন-কিছু নয়।' বিনু রমেশের পিছনে দাঁড়িয়েই রইল। রমেশ ঐ কান্না শুনতেই থাকল। চিরনতুন, আবার চিরপুরোনো চাকা ঘুরে যায়, জন্ম, মৃত্যু, প্রজনন। সব ছবিই মিলিয়ে যায়, বদলে যায়। মনের চোখে ভেসে উঠল উত্তর বালেশ্বরে তার নিজের গ্রাম কান্তিপুরের ছবি। তার বাড়ি মা বাবা, প্রতিবেশী, চেনা গুরুজনেরা, চেনা বাচ্চারা ও মেয়েরা; শ্মশান থেকে গ্রামের ঠিক মধ্যিখানের চণ্ডিতলা পর্যন্ত সমস্ত পথটা। মৃত্যু, জন্ম, পুনর্জীবন। সেখানেও তো এমন মানুষ যাঁরা শান্তি ও নির্জনতা ভালো-বাসেন, জীবনের সঙ্গে যাঁদের কোনো ঝগড়া নেই, যাঁরা কারু কোনো ক্ষতি না-ক'রেও অনেক যন্ত্রণা সহ্য করেছেন।

মৃত্যুসংগীতের ঐকতানের ধুয়ো ব'য়ে চলল।

আগে তো আরো কতজনেই গেছে, কতজনে। অন্ধকার রাত্রে গ্রামবাসীরা মশাল জেলে তাদের নাম উচ্চারণ করে, 'অন্ধকারে এসো, আবার আলোতে ফিরে যেয়ো।'

মৃত্যুর এক বিশাল সমতলভূমি তার সামনে ছড়ানো। সেখানে ভাষা ও দেশের কোনো ভাগাভাগি নেই। সবই সমান ও চিরন্তন।

পেছনে দাঁড়িয়ে বিনুও তার বাড়ির কথা ভাবছিল, তার ছোটো বৌয়ের কথা। বিশি কি আসবে? হঠাৎ সে নিজের গালে চড় মারতে থাকল। রমেশ ওর দিকে ফিরে তাকালে। বিনু এখন নিজের হাতের তালুতে গাল ঘসছে। 'এই জায়গাটা বেজায় বড়ো-বড়ো মশায় ভর্তি। ওদের কামড়ে বড্ড যন্ত্রণা,' এইটুকুই বললে সে।

রমেশ চমকে উঠল। সে নিজেকে দেখতে পেল বিছানায় শোয়া, কাঁপছে। চোখ রক্তবর্ণ, গায়ের রং ভালুকের মতো কালো। একশো তিন ডিগ্রি থেকে জর

আরো বাড়বে আর মনে হবে কামড়াই, গালাগালি দিই, লোকে যেন পাগল হ'য়ে যায়।

বমি, গায়েব জ্বর, জ্বর বাড়ছে, তারপর ?

জন্ম, মৃত্যু, প্রজনন, জন্ম, মৃত্যু।

এখন আর আইনের কথা মনে আসে না। জন্ম, মৃত্যু. মানুষ। যেন হঠাৎ সে সবকিছু নতুন চোখে দেখছে। মানুষেরা হাঁটছে, অনেক মানুষ, অন্ধকাবে হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু জনস্রোতের বিবতি নেই। ব'য়ে চলেছে তো চলেইছে। বাজারটা এখন শেষ হ'য়ে আসছে। লোকজনেরা ফিবে যাচ্ছে। তাব মনে হ'লো সে সবাইকে চেনে, এই সমস্ত লোককে জনে-জনে চেনে। ঘবে চাহিদার চাপ, বাইরে জীবনের দাপট। তবুও তারা তো চলেছে। জাতপাত ও ভাষায় কিছু এসে যায় না। ওরা সব মানুষ। তাব গ্রামবাসী, চেনা মানুষ সব। এই অনন্ত ধাবায় এক পিঁপড়ে আর-এক পিঁপড়ের দিকে চেয়ে ছ্যাখে, তাদের চোখ থেকে এক মায়াময় হাসি যেন ঝ'রে পড়ে, যেন বলতে চায়, 'আমরা সবাই ভাই-ভাই, পায়ে হাঁটি, হাতে খাটি · এই একই মাটি তো আমাদের সবারই, আকাশেব নিচে এই প্রাচীন পৃথিবী। আমাদের সবার শত্রুও তো এক যারা আমাদেব মুখ থেকে সামান্য খাবারটুকুও কেড়ে নেয়, আমাদের পিষে মেবে ফ্যালে আর তাবপর গরম ছাই ও ঝামা চাপা দেয় আমাদের ওপর।'

পিঁপড়েব সারি ব'য়ে চলল। রমেশের মনেব গভীরে সেই হাসির জলন্ত প্রদীপ ও আগুন জ্ব'লেই যেতে থাকল।

হঠাৎ বাইরে একটা তোলপাড়। পাইকেরা আসছে, তাদের পেছনে-পেছনে চুবড়ি ও বস্তা ব'য়ে লোকজনেরা। এক মুহূর্তে রমেশ তার সরকারি ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত হ'য়ে গেল, দাঁড়িয়ে পড়ল, পাইকের সেলাম নিলে। বিনু দৌড়ে এগিয়ে গিয়ে বললে, 'ওদেব দলে-দলে টেনে আনা হচ্ছে এখানে।'

পাইকেরা বলল, 'দয়া ক'বে দেখুন, স্যাব, কীভাবে এই লোকগুলো বাজার থেকে ছুঁই নিচে চাল পাচাব কবছে। ঐ বস্তা চুবড়িগুলোব ওপরে শুধু সাজানো আছে লঙ্কা, হলুদ, তামাক, আর নিচে সব চাল ভর্তি। চড়া দামে এই চাল সব ব্যাটারা বিক্রি করবে। একমুঠো ভাতের জন্য এরা মানুষের রক্তমাংস সব খাবে।'

রমেশ আবার তাকালে। কঙ্কালের এক বাহিনী তার সামনে দাঁড়িয়ে। পাঁজরগুলো দেখাচ্ছে নিড়ানির লোহার মতো, ঐ পাঁজরে চামড়া ঝুল-ঝুল করছে ঠিক যেন বাদুড়ের শরীর, শরীরগুলো সব বাঁকাত্যাড়া, শুধু মাথাভর্তি শুকনো চুলের

জট আর ছোটো-ছোটো পিটপিট-করা চোখ। ওরা কি মানুষ না মানুষের ভূত ?
ওদের অদ্ভুত ভাষায় কাৎরে চলেছে ; কখনো কাঁদছে, কখনো গুহার খোঁদলের মতো নিজেদের পেটের দিকে মুখের দিকে দেখাচ্ছে, কখনো তাদের সরু-সরু দুবলা হাতগুলো দোলাচ্ছে। অন্যদিকের বস্তিতে মৃতদেহটাকে এখন বার করা হয়েছে। মানুষেরা আপাতত ঠেলাঠেলি করছে, মাথা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে সমস্বরে কাঁদছে, 'হায় ! হায় ! কে তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল ? তোমাকে খেয়ে গেল ?'

আর ঐখানে, নিচে, বস্তির সরু গলিতে, জ্যান্ত ভূতেরা কাতর প্রার্থনা ক'রে চলেছে, বুক ও মাথা চাপড়ে-চাপড়ে : 'হে বাপ, হে ভগবান !' পাইকরা গর্জন ক'রে উঠল, বিনুও চীৎকার করলে, 'না, না, ও-সব চলবে না। খোল, বস্তা খোল, চাল বার কর।'

রমেশ চোখ বন্ধ ক'রে ফেললে ; কিছু যেন তার মধ্যে টলমল করছে, ভেঙে গুঁড়ো-গুঁড়ো হ'য়ে যাচ্ছে। সেই লম্বা পথ-চলার অবসাদ ও খিদে তাকে যেন চেপে ধ'রে ডুবিয়ে দিচ্ছে। চোখ বন্ধ, তবু সে শুধু দেখতে পাচ্ছে এক তালগোল-পাকানো, কেমনতর লোকেদের, এক জনসমুদ্র, তাদের গালে 'ইয়স্'-এর ঘা, মুখে হাসি, চামড়া কুঁচকোনো, চোখেব কোণায় জলের চিকচিক রেখা। সবকিছু মিশে যাচ্ছে, আলাদা করাই যাচ্ছে না ; মৃতের জন্য করুণ মড়াকান্না, দারিদ্রের ও অনাহারের বুকফাটা চীৎকার, চোখের গর্তের নিচেকার জলন্ত আগুন ও ঝড়ের দমক। চোখ খুলে সে তাকালে ; এখনো সেই কাতর প্রার্থনা, 'দয়া করুন, বাবু, আপনি মা-বাপ, আমাদের দশা দেখে একটু দয়া করুন।' তার সামনে দাঁড়ানো মানুষের এক লম্বা কঙ্কাল, যেন প্রায় শুকনো তালপাতায় তৈরি। দুটো লম্বা হাত উপরে উঠল, জোড়কর হ'লো, আবার আস্তে-আস্তে ঝুলে পড়ল। যে-কোনো সময়ে ভেঙে চুরমার হ'য়ে যেতে পারে ! এক খশখশে বিরস গলায় কাতর প্রার্থনা, 'দয়া করুন, বাবা, আমাদের।' ভাষাটা কী ? রমেশ জানে না। কিন্তু মানেটা ঠিক ধরা যায়। মাটিতে শুয়ে, ঠিক তার পা পর্যন্ত সটান, সেই ছায়ামূর্তি মাথা তুলল আর চোখদুটো সোজাসুজি রমেশের মুখের দিকে তাকাল। সেই দৃষ্টি কোনো চেনা লোকের দৃষ্টির রূপ নিল, চেনা, রমেশের চেনা, সবারই চেনা। খিদের তাড়া খেলে এ-দৃষ্টি সবার ভেতর থেকেই বেরোয়, আয়নার ভেতর থেকে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকে যেন। রমেশের মনে হ'লো এইসব লোককে সে তার গ্রামের লোকদের মতোই ঘনিষ্ঠভাবে চেনে। এখন আর তাদের আকৃতি বা চেহারা তার চোখে পড়ছে না ; তাদের ভেতরের সত্তার এই অন্তরঙ্গ পরিচয় তাকে একেবারে গ্রাস ক'রে ফেলেছে।

তার সামনে এখন ঐ যে মূর্তি, তা ঠিক অনেকদিন আগে ম'রে-যাওয়া তার 'সপন' খুড়োর মতো, ঠিক ঐ একই রকম এলোমেলো চুল, পাগলের মতো খোঁচাখোঁচা দাড়িওলা মুখ, কণ্ঠার হাড়ের কিনারে ঠিক তেমনি হাঁ-করা গর্ত। তফাত শুধু এই যে, তাঁকে দেখাত আরো ক্লান্ত, আরো ক্ষুধার্ত, ভয়ংকর মৃত্যুর ভয়ে আরো ভীত। আর ঐ অন্ধ বৃদ্ধ মানুষটি, গোঁফওলা, সারা শরীর বাঁকা, দোমড়ানো, আর কেউ নন, কান্তিপুর গ্রামের সেই হতভাগ্য কামার ছাড়া আর কেউ নন তিনি!

আর শুধু হাড় ও চামড়া সর্বস্ব ঐ ছন্নছাড়া ছেলেগুলো। ওরা কি তারই গ্রামের সেই ছেলেগুলো নয়, যারা তার বাগানে ঢুকে ডাঁশা পেয়ারা সব খেয়ে ফেলেছিল? আর ফুটো নৌকোর মতো ঐ মহিলারা, ছেঁড়াখোঁড়া, ভাঙাচোরা, ক্ষীণজীবী? তারা কি তারই গ্রামের মেয়েদের মতো নয়, যারা ভোর না-হ'তেই ছোটে জ্বালানির জন্য শুকনো পাতার খোঁজে? মাথাটাকে ঝুলিয়ে দিয়ে রমেশ তার চোখদুটোকে যেন লুকোতে চাইল। শুধুমাত্র তার সংক্ষিপ্ত বিড়বিড়-করা কথাগুলো শুনতে পাওয়া গেল, 'যাও, যাও, চ'লে যাও।'

সাহেব কী বলছেন বিনু যেন প্রায় বিশ্বাসই করতে পারছিল না। উনি কি সত্যিই তাই বলছেন? উদ্বেগে সে অনুনয়ের স্বরে বললে, 'স্যার, কিন্তু স্যার!' কিন্তু রমেশ শুধু আর-একবার একই কথা বললে, 'ছেড়ে দাও ওদের। দেরি হ'য়ে যাচ্ছে। যাও, চ'লে যাও।'

কর্তৃত্বের চেহারাটা কী-রকম বিনু তার স্মৃতি খুঁজে সেটা হাৎড়াবার চেষ্টা করলে। এ-রকম নয় নিশ্চয়ই: এই ছোকরা, নরম-সরম দয়ালু, দুনিয়ার বিশেষ-কিছু যে জানে না। সবে গোঁফ উঠছে, দোহারা গড়ন, গলার স্বর চিকন। এতে অফিসার হওয়া চলে না, ওর সিদ্ধান্ত। প্রকৃত কর্তৃত্ব হ'লো গিয়ে বাঘের মতো। অনেক বছর ধ'রে সে-রকম ও ঢের দেখেছে। তার দোমড়ানো ঠোঁটে এক অদ্ভুত ভাব। খানিকটা হাসি, খানিকটা ব্যঙ্গ।

রমেশ দাঁড়িয়েই রইল। তার চেতনার সামনে এখন আর কোনো ইতিহাস নেই। সময় যেন থেমে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কপিলেন্দ্রদেব নেই, পুরুষোত্তম নেই, কনারক নেই। যে-সব লোক একটা দেশের বা জাতির মেরুদণ্ড হ'য়ে ওঠে সে-রকম লোকের আলাদা-কোনো বিশেষ ভাবমূর্তি আর নেই। ইতিহাসের কোনো মাথামুণ্ডু নেই, তাৎপর্য নেই। পিঁপড়ে, পিঁপড়ে ছাড়া আর-কিছু নেই কোথাও; সর্বত্র ক্ষুধার্ত পিঁপড়েরা মুখভর্তি ক'রে খাবার নিয়ে চলেছে বাঁচবার জন্য, টিঁকে থাকবার জন্য, এবং ঐ পিঁপড়ের সারি বল্মীকের স্তূপের ওপর গিয়ে সবাই মিলছে,

সংকটময় জীবনের মেয়াদ আরো-কিছুদিন বাড়াবার জন্ত। পিঁপড়েরা বাঁচতে চায়। একটা ঠাণ্ডা কাঁপুনির বোধ হ'লো রমেশের। শীত-শেষের সামান্ত রোদের আলো নিভে গেছে। চারিদিকে নীলাভ আস্তরণের একটা হালকা চাদর যেন বিছিয়ে আছে। এখন সন্ধে। ভেতরে তার মাঘের শীতের বোধ।

অনুবাদ : সৌরীন ভট্টাচার্য

ঘটশ্রাদ্ধ

ইউ. আর. অনন্তমূর্তি

তখনও ভোর হয়নি, কিন্তু উডুপা, হরিণ-চামড়ার পুঁটলিটাকে আঁকড়ে ধ'রে, উঠোনে দাঁড়িয়ে। 'যাবার পথে,' উনি বললেন, 'তোমার বাবা-মা'-র সঙ্গে দেখা ক'রে যাবো।' আমি চোখ কচলে নিলাম। এ-সময়ে আমি মা-র শাড়ির ওমে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকতাম। মা আমাকে তুলে দেবে, হাত-মুখ ধুইয়ে কফি এনে দেবে। উডুপা ক-পা এগিয়ে গেলেন, তার পরে থেমে মেয়েকে ডাকলেন। মুখটা যাতে আড়াল থাকে সেদিকে খেয়াল রেখে, যমুনা দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারল। যমুনা তার লাল শাড়ির আঁচলটাকে তার কামানো মাথার ওপর টেনে দিল। 'আমি যাচ্ছি,' উডুপা বললেন। 'জানিস তো, তিন মাস থাকবো না। আরো দেরিও হ'তে পারে। গোকর্ণর যজ্ঞ শেষ হ'লে, আমাদের কুলদেবতার মন্দিরে যাবো। ছেলে-গুলোর ওপর নজর রাখিস। দেখিস, ওরা যেন সাঁতার না-কাটে।'

উডুপাকে আমি ভয় পেতাম: উনি কদাচিৎ হাসতেন বা আমাদের সঙ্গে গল্প করতেন। বাবা বলেছিলেন, যেহেতু উনি পবিত্র বেদ শিক্ষা দেন, মানুষটা উনি তাই সাধু প্রকৃতির। ওঁকে যেই দূরে মিলিয়ে যেতে দেখলাম, বাড়ি যেতে চাই ব'লে কান্না জুড়ে দিলাম। শাস্ত্রী আর গণেশ ঠিক তখনই বাইরে বেরিয়ে এসেছে। ওরা খিক্-খিক্ ক'রে হাসল আর আমাকে মুখ ভেংচাতে লাগল। যমুনা আমার গালটা টিপে হাত-মুখ ধুয়ে নিতে বলল। আমি কান্না বন্ধ ক'রে ছেলেদের পিছু-পিছু কুয়োর দিকে গেলাম। বালতিটা ওরা জলে ফেলে দিল। 'শাস্ত্রী, দীক্ষা সম্পর্কে ওরা কী বলে জানিস তো! যে একটা রাক্ষস তার আগের রাত্তিরে আসে আর উরুতে একটা ব্যাং আটকিয়ে দেয়। এই পুঁচকে ছোঁড়াটা না কথাটা বিশ্বাস করেছিল! সারা রাত্তির ধ'রে কেঁদেছে!' বালতিটা লাফিয়ে উঠতেই ও হেসে উঠল। আমি রান্নাঘরে দৌড়ে চ'লে এলাম।

যমুনা তখন দই ঘেঁটে-ঘেঁটে ঘোল বানাচ্ছিল। 'কাঁদিস নে,' ও বলল, 'আমি নিজে তোর হাত-মুখ ধুইয়ে দেবো।' যমুনা তার শাদাশিধে লাল শাড়িটা পরে-ছিল, কপালে ছিল বিভূতি। বিয়ের পরেই ওর স্বামী মারা যায়। গণেশ বলেছিল, একটা কেউটে ওকে ছুবলেছিলে। মা মারা যাবার পরে যমুনা বাবার কাছে থাকতে ফিরে আসে। যমুনা আমার মুখ ধোয়ানো শেষ করলে, আমি

জয়োস-র বাগানে গেলাম সকালবেলার পুজোর নৈবেদ্যর জন্যে চাঁপা ফুল পাড়তে। আমি যখন একটা লম্বা কঞ্চি হাতে নিয়ে ফুল পাড়বার জন্যে লাফাচ্ছি, তখন গোদাবরম্মা, জয়োস-র বোন, আমাকে দেখতে পেয়ে বললেন যে কাজটা উনি আমার হ'য়ে ক'রে দেবেন। উনিও বিধবা, কেবল যমুনার চেয়ে বয়সে বড়ো।

'যমুনা ক-দিন হ'লো মন্দিরে আসেনি,' আমার দিকে তাকিয়ে উনি বললেন। 'শুনলাম ওর শরীর খারাপ। ও কি শুয়ে আছে?'

'এই সেদিন ও শুয়ে পড়েছিল। বলল, ওর মাথা ঘুরছে, ওষুধ নিল,' আমি বললাম।

'তাই নাকি?' গোদাবরম্মা হেসে উঠলেন। ভেতরে যেতে-যেতে ভাইকে ডেকে বললেন, 'যমুনার আজকাল মাঝে-মাঝে মাথা ঘোরে। বেচারা! অথচ ম্যালেরিয়া নয়। আর এদিকে ওর পেটটাকে ফুলে উঠতে দেখে আমি ভেবেছিলাম বুঝি ম্যালেরিয়া হয়েছে।' ওঁরা দুজনে হেসে উঠলেন।

রাস্তার শেষে ছিল পিপুল গাছটা। ফণা-মেলে-দেয়া কেউটে খোদাই-করা পাথরের ছোটো-ছোটো ফলক ওর গায়ে হেলান দিয়ে রাখা। আমি গাছটাকে তিনবার মাত্র পাক দিলাম, সাধারণত যেমন দশবার করি তেমন নয়। পূজনীয় নাগদেবতাকে নত হ'য়ে প্রণাম করার পর গাছ থেকে খ'শে-পড়া কিছু শুকনো ডাল-পালা কুড়িয়ে নিলাম। সকালের নিত্যকর্মের সময়ে ঘি মাখিয়ে এই ডালপালা-গুলো আগুনে আহুতি দেবো।

উপাধ্যায়, আমাদের নতুন শিক্ষক, রেগে গিয়েছিলেন – 'তুমি এখনও মন্ত্রগুলো সঠিক ছন্দে বলতে শিখলে না,' ঘোঁতঘোঁত ক'রে এই ব'লে আমার কান মুচড়ে দিলেন। দেরি ক'রে আসার জন্যে পাঠটা গোড়া থেকে আমাকে পড়তে বাধ্য করলেন। শাস্ত্রী গণেশের দিকে তাকিয়ে চাপা হাসি হাসল। উড়ুপার কাছে ব্যাপারটা এমন কষ্টকর ছিল না, উনি ককখনো শাস্তি দিতেন না।

আগুনের সামনে নিত্যকর্ম শেষ হ'লে, অবশেষে, আমাদের জন্যে কলাপাতাগুলো রাখা হ'লো আর আমরা বসতে ছুটে গেলাম।

যমুনা কানৃজি পরিবেশন করল, ওপরে এক চামচ নারকেল তেল দেয়া আর আমের চাটনি। আমরা হাপুশ হুপুশ ক'রে সব গিলে ফেললাম।

'এত দেরি ক'রে এলি কেন, ননী?' আমি একা হ'লে যমুনা আমায় জিগেস করল। 'তুই তো জানতিস, উপাধ্যায় তোকে বকবে।'

গোদাবরম্মার বাড়িতে কী হয়েছিল আমি ওকে বললাম। 'এবার থেকে কেউ

যদি জিগেস করে,' ও বলল, 'বলবি আমার ম্যালেরিয়া হয়েছে।' তার পরে ও ওর শাড়িতে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল।

সে-রাত্তিরে শাস্ত্রী, গণেশ আর আমি বারান্দায় শুয়েছিলাম, যমুনা ঘরে। অন্ধকার, উড়ুপা নেই, আমার ভয় করছিল। আমি বললাম যে আমি ভেতরে যমুনার কাছে গিয়ে শোবো, কিন্তু শাস্ত্রী বলল যে তা একেবারে মেয়েলি হ'য়ে যাবে। আমি ঘুমোতে পারলাম না, আর খালি মা-র কথা ভাবলাম। শাস্ত্রী, আমার পাশে শুয়েছিল, খানিক পরে কাছে ঘেঁষে এল আর আমার ধুতির মধ্যে ওর হাত চুপি-সাড়ে ঢুকিয়ে দিল, তার পরে আমার নেঙটির মধ্যে, উরু-দুটোর মাঝখানে। ওখানে ও মৃদু চাপ দিতে শুরু করল, আমার মুখের কাছে জোরে-জোরে নিশ্বাস ফেলে। আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, ওকে ঠেলে সরিয়ে দিলাম। যেই উঠে দাঁড়িয়েছি ও আমাকে জাপটে ধ'রে শান্ত করার চেষ্টা করল, কিন্তু আমি যমুনার কাছে ছুটে গেলাম। কী হয়েছে ওকে খুলে বলার সাহস কিন্তু হ'লো না। শুধু বললাম, আমার ভয় করছে, আর ও আমাকে কাছে টেনে ওর শাড়ি দিয়ে আমাকে ঢেকে দিল, ঠিক মায়ের মতো।

কিছুক্ষণ পরে আমার মনে হ'লো, যেন শুনতে পাচ্ছি, কে একজন বাড়ির চার-পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি যমুনাকে আঁকড়ে জড়িয়ে কাঁপতে লাগলাম ; কেবল-মাত্র এক রাক্ষসই এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে, পেছন দিকে পা ফেলে, চুপিসাড়ে, বাড়ির চারপাশে এ-রকম ভাবে ঘুরে বেড়াতে পারে। তার পরে খিড়কির দরজার দু-বার খটখট শব্দ হ'লো। এ কি সেই, যার পা পেছন দিকে মুখ করা ? একটা শেয়াল আখের খেতে ডুকরে উঠল। আমপাতাগুলো খশখশ শব্দ করল। আলগোছে আমার মুঠোটা আলগা ক'রে যমুনা উঠে পড়ল। আমিও উঠলাম। 'তুই ঘুমো,' ও ফিশফিশ ক'রে বলল। 'ওটা যদি রাক্ষস হয় আমি জানলা দিয়ে একটা ঝাঁটা ছুঁড়ে দেবো। ওরা এতে সবসময়ে ভয় পায়।' আমি শক্ত ক'রে চোখ বন্ধ ক'রে দু-হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললাম, আর যমুনা যে অত সাহসের সঙ্গে রাক্ষসটাকে চ'লে যেতে ব'লে হুকুম দিচ্ছে তাই শুনে ঠাকুরদেবতার নাম জপ করতে লাগলাম।

পরের দিন সকালে একা চাঁপা ফুল পাড়তে যেতে আমার ভয় করছিল, তাই ইচ্ছে না-থাকলেও শাস্ত্রীর কথামতো ওকে সঙ্গে নিতে রাজি হলাম। পথে ও কিন্তু অন্য সময়ের মতো আমকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করেনি, বরং রাক্ষসটা যমুনাকে কী বলেছিল তাই জানতে চাচ্ছিল। ও বলল যে ব্যাপারটা খুব জরুরি, আর ও যা আন্দাজ করেছে তা যদি সত্যি হয়, তাহ'লে আমরা সবাই বাড়ি ফিরে যাবো।

'তুই চাস না ?' ওর ব্রণগুলো গেলে দিতে-দিতে ট্যারা চোখে তাকিয়ে ও জিগেস করল। গণেশ ওকে মহর্ষি শুক্রাচার্য ব'লে ডাকত, কেননা ওঁরও চোখ ছিল ট্যারা আর তা ছাড়া উনি তো রাক্ষসদের গুরু ছিলেন। কিন্তু যমুনা কী বলেছে তা আমি ওকে বলিনি ; যমুনা আমাকে কাউকে ও-কথা বলতে বারণ করেছিল! ও হেসে বলল, 'বেড়াল চোখ বুজে দুধ খায়—কেন জানিস ? আচ্ছা, যেতে দে, একদিন তুই জানতে পারবি। খেয়াল রাখিস, তুই আর কচি খোকাটি নোস। তোর মতো বয়সে, আমি তোর চেয়ে ঢের বেশি জানতাম।' আমি চুপ ক'রে রইলাম। আমরা যখন পিপুল গাছটার কাছে এসেছি, ও বলল : 'আয় দেখি। তুই কী-রকম ব্যাটাছেলে দেখিয়ে দে। নাগদেবতাকে ছোঁ তো, এক্ষুনি, যেমন আছিস। আমি তো ভয় পাচ্ছি না। তুই পাচ্ছিস নাকি ?'

মা বলেছিল, যদি চান না-ক'রে, পুজোর জামা-কাপড় না-প'রে নাগদেবতাকে ছোঁও, তাহ'লে পাঁচফণাওলা কেউটে তোমায় নিশ্চয়ই তাড়া ক'রে ফিরবে। আমি ভাবলাম শাস্ত্রী নিশ্চয়ই তামাশা করছে, কিন্তু ইয়ার্কি ক'রেও কেউ ও-কথা বলবে না। আমি পালাতে গেলাম, কিন্তু শাস্ত্রী আমায় ধ'রে ফেলল।

'তুই দেখছি মেয়েদেরও অধম। ভাখ, আমি ওটাকে ছোঁবো।'

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে দেখলাম ও সোজা পিপুল গাছটার তলায় গিয়ে গোল পাথরটার ওপর দুটো হাত রাখল। ভয়ের চোটে আমি পা-দুটোকে নড়াতে পারলাম না। যদিও যমুনাকে তক্ষুনি ছুটে গিয়ে সব বলতে আমার ইচ্ছে করছিল। ও ফিরে এসে আমাকে খ্যাপাতে লাগল। 'তোর লজ্জা করছে না! তুই আর কোনোদিন বড়ো হবি না!' আমাকে টেনে ও গাছটার তলায় নিয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে ও আমাকে দেবমূর্তির কাছে নিয়ে এসেছে। আমি ওর হাত ছাড়াবার চেষ্টা করলাম, ওর হাত কামড়ে দিলাম, কিন্তু ওর গায়ের জোর আমার চেয়ে অনেক বেশি, আর আমার টের পাবারও আগে, আমার হাত ও নাগদেবতার ঠাণ্ডা ফলকটার গায়ে ঠেকিয়ে দিল। আমাকে ছেড়ে গাছের তলা থেকে এক লাফে স'রে এল ও, আর ফুর্তির সুরে চ্যাঁচাতে লাগল। আমি কেঁদে ফেললাম। 'ভাখ!' হাতের চেটো দেখিয়ে ও বলল, 'বুড়ো আঙুলের তলায় এই রেখাটা দেখছিস ? এটা হচ্ছে বাজপাখির সুলক্ষণের রেখা। এটার জন্যে কোনো সাপ, এমন-কী সর্প-রাজ পাঁচফণাওলাও, কক্ষনো আমাকে ছুঁতে সাহস করবে না। কিন্তু তোর কী হবে ? হাঁদা! আকাট কোথাকার!' আমি মায়ের জন্যে কাঁদতে লাগলাম। শাস্ত্রী নাচছিল—হাততালি দিয়ে-দিয়ে, কালকেউটেকে আমার ওপর শোধ তুলতে ব'লে।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আমার কাছে এসে, খুব নরম স্বরে ও বলল, 'ছাখ ননী, তুই যদি আমাকে মেনে চলিস, তোকে আমি আমাব বাজপাখির রেখা দিয়ে রক্ষা করতে পারি। কিন্তু তার আগে তোর মায়ের নামে দিব্যি কর যে আমাদের মধ্যে কী হয় তা যমুনাকে তুই কক্ষনো বলবি না। এখন থেকে তুই আমার বশে। যা বলবো তাই করবি।' আমি তবু কান্না থামাতে পারলাম না।

একদিন বিকেলে গণেশের বাবা এসে উঠোনের বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। উনি ভেতবে আসবেন না, যমুনা ওঁর জন্যে যে লেবুর রস তৈরি করেছিল তা-ও ছোঁবেন না। সেদিন কড়া রোদ্দুর ছিল আর ছিল গুমোট। উনি গণেশকে ওব জামা-কাপড় গুছিয়ে নিয়ে ওঁর সঙ্গে তক্ষুনি বেরিয়ে পড়তে বললেন। যমুনাকে একটা কথাও বললেন না। ওবা যখন চ'লে গেল যমুনা একটা কোণে ব'সে কাঁদতে লাগল। সেদিন রাত্তিরে খাবার পবে আমি যখন পেছনের উঠোনে হাত ধুতে গেছি, শুকনো আমপাতার ওপব দিয়ে তখন যেন কাব হেঁটে যাবার শব্দ পেলাম। চলাটা এত চুপ-চাপ, এত সাপেব মতো যে আমি ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম। যমুনা ছুটে এল, পেছনে শাস্ত্রী। আমরা একটা লোককে ছুটে পালিয়ে যেতে দেখলাম। 'ও নিশ্চয়ই কাত্তিরা, অচ্ছুৎটা, কিছু খাবার ভিক্ষে করতে এসেছে,' যমুনা বলল। 'কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ওটা বোধ হয় সেই রাক্ষসটা, সেই রাত্তির থেকে বাড়িটাতে যে হানা দিচ্ছে,' শাস্ত্রী উত্তর দিল। 'তুই থাম,' যমুনা ওর দিকে তাকিয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠল। বাবা এসে আমায় যদি নিয়ে যেত, তবেই ভালো হ'তো। গণেশের কপালটা ভালো।

পরের দিন আরো অদ্ভুত-কিছু ঘটল। যমুনার শরীর কেমন আছে গোদাবরম্মা জানতে এলে যমুনা কিছুতেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইল না। উপাধ্যায়ও যমুনার তৈরি-করা লেবুর রস খেতে অস্বীকার করলেন, আর তার ওপরে আমাদের পড়াতে আসাও বন্ধ ক'রে দিলেন · আমার তাতে খুব আনন্দ হয়েছিল। আর শাস্ত্রীও চ'লে গেল, কিন্তু গাঁয়ের জমিদারের বাড়ি, কারণ ওর তো নিজের বাবা-মা নেই। আমি তাতে খুব স্বস্তি বোধ করলাম, যদিও বাজপাখির রেখা আছে এমন-কোনো লোক পাশে না-থাকায় যে কী বিপদ হ'তে পারে এই ভেবে আমার মাঝে-মাঝে ভয় করছিল।

রাত্তিরে যমুনা আমাকে তার কাছে টেনে নিয়ে, শাড়ির বাঁধন খুলে দিয়ে আমার কান ওর নরম পেটের কাছে ঠেকিয়ে দিল। 'ননী, কিছু শুনতে পাচ্ছিস?' তার পরে ফুপিয়ে কাঁদতে শুরু ক'রে দিল আর আমিও সঙ্গে কাঁদতে লাগলাম। ও

আমাকে কাছে টেনে নিয়ে আমার মুখ ওর খোলা বুকে গুঁজে দিল, আর আমার পিঠে হাত বোলাতে-বোলাতে বলল, 'চ'লে যাস না, সোনা আমার, আমাকে ছেড়ে চ'লে যাস না।' আমি কোনো উত্তর দিইনি, কিন্তু খুব খুশি হয়েছিলাম। সেদিন রাত্তিরে অঘোরে ঘুমোলাম।

কেউ আমাদের বাড়ির ছায়া মাড়াল না। ওরা ঐ অচ্ছুৎ কাতিয়ার সঙ্গেও এর চেয়ে ভালো ব্যবহার করত; অন্তত ওর সঙ্গে কথা বলত। আমাদের দরজা কোনো সময়ে খোলা হ'লো না, এমন-কী সন্ধেবেলাতেও না, যখন কিনা কেবল মৃত লোকেদের বাড়ির দরজাই বন্ধ থাকে। এ-রকম ভাবে এক হপ্তা কেটে গেল। যমুনা, ওর আদর, অনুরোধ-উপরোধ আর ওর ক্লান্তিকর কান্নার ওপর আমার তিতবিরক্ত ধ'রে যেতে লাগল। বাবা এসে যাতে আমাকে নিয়ে যায় তার জন্যে প্রার্থনা করতে লাগলাম।

একদিন বিকেলে জানলার ধারে ব'সে দেখছিলাম, আমার বয়সী ছেলেরা বাইরে লাটিম নিয়ে খেলছে, আমার খুব হিংসে হচ্ছিল। ঠিক তখন, শাস্ত্রী, জমিদারের ছেলের সঙ্গে এসে আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। আমি ওর সঙ্গে বেরোতে যেতে না-চাইলে, ও ওব হাতের চেটোব বাজপাখির রেখাটা দেখাল। যমুনার অনুমতি নেবার জন্যে রান্নাঘরে গেলাম কিন্তু ওকে ওখানে দেখতে না-পেয়ে ভারি অবাক হলাম। বাড়িতে ব'সে-ব'সে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলাম, বাইরে যেতে ইচ্ছে করছিল, না-হয় তা শাস্ত্রীর সঙ্গেই হ'লো।

জমিদারের ছেলে আব শাস্ত্রীর সঙ্গে বামুনপাড়ার আরো তিনজন ছেলে ছিল, সকলেই আমার চেয়ে বয়সে বড়ো। আমরা গাঁয়ের শেষ সীমানা পদ্মপুকুরে এলাম, যেখানে গাঁয়ের মেয়েরা জামাকাপড় কাচে, আর গোরু-মোষ দুপুরে জল খেতে আসে। আমি বললাম, আমি আর এগোবো না। শাস্ত্রী ওর হাতের চেটো দিয়ে কেউটের ফণা দেখিয়ে বলল, ফিরতি-পথে কেউটের সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা ছাড়াও কিছু মজা কি হাত থেকে ফশকে যেতে দেয়া আমার উচিত হবে? 'বেছে নে,' ও বলল, 'অ্যাদ্দিনে তোর বড়ো হ'য়ে যাওয়া উচিত।' আমি ওদের সঙ্গে যাওয়াই ঠিক করলাম, আর ভাবলাম, আমাকে সারা দিন-রাত্তির ধ'রে বাড়িতে বন্ধ ক'রে রাখার জন্যে যমুনার পক্ষে এটা বেশ ভালো সাজা হবে। আমরা বন জঙ্গল আর কিছু টিলা পেরিয়ে শেষে একটা গ্রামের পোড়ো জমির কাছে এসে হাজির হলাম। এখানে একবার যমুনার সঙ্গে এসেছিলাম, জালানি-কাঠ জোগাড় করতে। শোনা যায়, রাত্তিরে এখানে ভূতের আড্ডা বসে। একটা ভাঙা মন্দির ছিল,

পেছনে নদী, আর চারপাশে মস্ত-মস্ত সব বটগাছ। দু-সারি ভাঙা দেয়াল ফণি-মনসাগাছে ভর্তি ভিৎ আর কিছু হামানদিস্তে, পুরোনো কলসি আর চাটু। যমুনা আমায় বলেছিল যে মন্দিরের ভেতরে বিরাট-বিরাট সব বাদুড় উলটো হ'য়ে ঝুলছে আর একটা বড়ো কেউটে মন্দিরের পুঁতে-রাখা ধনরত্ন পাহারা দিচ্ছে।

আমি নদীর ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। আমাকে তা খুশি করল। আমরা যদি নদীর কাছে যাই আর পাথরের সিঁড়িতে বসি, আমি ভাবছিলাম, আমি তবে জলে পা ডুবিয়ে বসতাম। পায়ের আঙুলের ফাঁকে মাছেদের শুড়শুড়ি খেতে আমার ভালো লাগে। কিন্তু শাস্ত্রী আমাদের একটা পোড়ো ভাঙা দেয়ালের কাছে নিয়ে গেল। নড়তে বা শব্দ করতেও বারণ করল। ভাঙা দেয়ালটার একটা ফোকর দেখিয়ে ও তার মধ্যে দিয়ে আমাকে দেখতে বলল। ও নিজে অন্য-একটা ফোকরের মধ্যে দিয়ে তাকাল, আর অন্যরা, আরো-লম্বা, ভাঙা দেয়ালটার সমান উঁচু, তার ওপর দিয়ে উঁকি মারল।

'ওদিকে ছাখ এখন,' ফ্যাঁশফেঁশে গলায় ফিশফিশ ক'রে শাস্ত্রী বলল। কয়েক গজ সামনে আমাদের দিকে পেছনে ফিরে যমুনা একটা পাথরের ফলকের ওপর ব'সে ছিল, মাথাটা নোয়ানো। হয়তো ও জ্বালানি-কাঠের জন্যে এসেছে, আমি ভাবলাম, কিন্তু শাস্ত্রীর ভয়ে ওকে ডাকতে সাহস করলাম না···খানিক পরে একটা ফোকরের মধ্যে দিয়ে এই ভাবে দেখতে-দেখতে ক্লান্ত হ'য়ে পড়লাম, আর বাড়ির কথা ভাবতে শুরু ক'রে দিলাম : মফস্বল শহর, মাঝে-মাঝে রাস্তার ওপর দিয়ে লরি যায়, আর তা দেখতে মা আর আমি ছুটে বেরিয়ে আসি।

সন্ধে হ'য়ে গিয়েছিল, সন্ধেপুজোর সময়, কিন্তু উপাধ্যায় যবে থেকে আসা বন্ধ করেছেন, খুশি মনে আমি তা বাদ দিয়ে দিয়েছিলাম। তা সত্ত্বেও ভগবানের নামজপ করতাম, তাড়াতাড়ি যাতে বাড়ি ফিরে যেতে পারি আর যাতে কেউটের হাত থেকে তিনি আমায় রক্ষা করেন। শাস্ত্রী টুশকি দিয়ে উঠল আর আমাকে একটা খোঁচা মারল : 'ছাখ ওদিকে, যে-রাক্ষসটা বাড়ির চারপাশে ঘুরে বেড়ায়, সে আসছে।' কিন্তু চেহারাটা তো ইস্কুল মাস্টারের মতো ; এক দূর শহর থেকে উনি এসেছেন, আর উনি বলতেন, সেখানে নাকি ট্রেন চলে। যখনই আমরা জমিদারের বাড়িতে বড়ো কোনো খাওয়া-দাওয়ার জন্যে একসঙ্গে বসতাম, উনি ওঁর শহর সম্পর্কে খুব জাঁক দেখিয়ে গল্প করতেন, আর একবার সিনেমা কাকে বলে বুঝিয়েছিলেন, কী ভাবে একটা পর্দার ওপর ছায়ারা কথা বলে, গান গায়। কেউ অবিশ্যি বিশ্বাস করেনি। ওঁর ইস্কুল একটা হলঘর, সেখানে উনি পড়াতেন,

ঘুমোতেন আর রাঁধতেন। কখনো উনি জমিদারের বাড়িতে খেতেন, কখনো যমুনা যদি মুখরোচক কিছু বানাত তাহ'লে আমাদের বাড়িতে।

নিশ্চিত হবার জন্যে, আমি ওঁর পায়ের দিকে তাকালাম, কিন্তু ওঁর পায়ের আঙুলগুলো তো পেছন দিকে মুখ করানো নয়। কিন্তু উনি যে ওখানে এসেছেন, তাতে আমি অবাক হ'য়ে গেলাম সব জায়গা ছেড়ে শেষে এই পোড়ো জায়গাটায়!

'ওরে পুঁচকে সাধু, ছাখ, ছাখ,' শাস্ত্রী আমার কান মুচড়ে দিল আর আমি আরো অবাক হলাম যখন দেখলাম উনি যমুনার পাশে গিয়ে পাথরের ফলকটার ওপর বসলেন। উনি যমুনার হাতটাও ধরলেন, কিন্তু যমুনা জোর ক'রে ছিনিয়ে নিল। আমি ওদের আগেও কথা বলতে দেখেছি, কিন্তু এ-রকম ভাবে নয়। যমুনা, মনে হ'লো, ওঁর কোনো কথার জোরালো প্রতিবাদ করছে, আর কাঁদছে।

ফোকরটার মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে-দেখতে পেলাম একটা সাপ আস্তে-আস্তে এগিয়ে আসছে। আমি কেঁদে ফেললাম, কিন্তু শাস্ত্রী আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল যে ওটা বিষধর সাপ নয়—ইঁদুর-ধরা সাপ মাত্র। সবসময়ে পোড়ো-জমিতে ওদের পাওয়া যায়, আর ওবা ক্ষতি করে না। হ্যাঁ, জমিদারের ছেলেটা যোগ করল, লম্বা সরুগুলো সচরাচর বিষাক্ত হয় না। কিন্তু নাগদেবতাকে মনে পড়ায় আমি কেঁপে উঠলাম—বলা তো যায় না কখন কোন রূপ ওঁরা ধরেন। শাস্ত্রী বলল যে নাগদেবতা সম্পর্কে গল্পটা বানানো আর এখন আরো মজার জন্যে উচিত হবে ওদের দুজনকে দেখা। ওর গলায় যেন স্নেহের স্বর।

যমুনা যেখানে ব'সে, সাপটা নিঃশব্দে সেখানে চ'লে এল, ওদের স্বভাব মতো ডানদিক-বাঁদিক ঘুরে নিশ্বাস টানতে-টানতে। আমার প্রার্থনা ছিল, ওটা যে ওর দিকে আসছে যমুনা যেন তা দেখতে পায়। কিন্তু মনে হ'লো না কোনো আশা আছে, ওব মন-প্রাণ এখন পুরোপুরি ইস্কুল মাস্টারটিকে নিয়েই ব্যস্ত। সাপটা কি মন্দিরের দিকে যাবে, যেখানে ও পুঁতে-রাখা ধনরত্ন পাহারা দেয়? শাস্ত্রী কি আমাকে শাস্তিস্বরূপ সাপের কামড় খাওয়াবার জন্যে এখানে নিয়ে এসেছে? যমুনাও কি আমার মতো পাপ করেছে? আমি চুপচাপ, নিঃসহায়, কাঁদতে লাগলাম। আমার যে কিছুই করার নেই। ওটা নির্ভুলভাবে বুকে হেঁটে যমুনার দিকে এগোচ্ছে। ছেলেদের মধ্যে একজন বলল, 'এই বিধবা মাগীটা মন্দিরের প্রতিমাকে অপবিত্র করেছে। সাপটা ওর জন্যেই এসেছে।' শাস্ত্রী একমত হ'য়ে মাথা নাড়ল, তারপর আমার দিকে ঘুরে বলল: 'ভগবানের কাছ থেকে তুমি কিছু লুকোতে পারবে না। লোকে বলে—ওঁর নাকি সাপের মতো চোখ।' আমি আঁৎকে উঠে

পায়ের চারপাশটা দেখলাম। সাপটা এবার থামল, ওর লম্বা শরীরটা গোল ক'রে নিয়ে, ফণাটা ছড়িয়ে চারদিক দেখল। দেখলাম, ওটা একটা কেউটে, আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না।

'হাঃ—কেউটে, কেউটে,' নিচু গলায় সবাই বলল। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম কিন্তু শাস্ত্রী আমাকে টেনে বসিয়ে দিল। কেউ কথা বলছে না এখন, আমরা যা দেখছি তা সত্যিই ভয়ানক, কেউটেটা যমুনার দিকে বুকে হেঁটে এগোচ্ছে। আমি ভগবানের নাম জপ করতে শুরু করলাম, অন্যরাও।

ইস্কুল মাস্টাব যমুনার কাঁধে এবাব ওঁর হাত রাখলেন, যমুনার পক্ষে তা বোধ হয় সহ্যেব সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ও দাঁড়িয়ে পড়ল। কিন্তু ও পেছন ফিরল না বা দেখল না। তাবপর আবার ও ব'সে পড়ল।

কেউটেটা এখন ওর মুখ দিয়ে পাথরটাকে ছুঁয়ে দেখছে। সন্ধের আলোয় ওর শরীরটা কেমন ভেজা আর চকচকে দেখাচ্ছে। আমি ভয়ংকরভাবে কাঁপছিলাম। মনে হচ্ছিল, এমন-কী শাস্ত্রীও কথা হারিয়ে ফেলেছে।

উনি আবার যমুনার কাঁধে হাত রাখলেন। আমার মনে হঠাৎ একটু আশার ঝিলিক খেলে গেল। নিশ্চয়ই যমুনা ওঁর থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবে, আমি ভাবলাম, আর আগের মতো দাঁড়িয়ে পডবে। পায়ের অত কাছে কেউটেটাকে না-দেখে ও কোনোমতেই থাকতে পারবে না। আমি খুব উত্তেজিতভাবে প্রার্থনা করতে লাগলাম। কিন্তু না।—যমুনা ইস্কুল মাস্টারেব কাছ ঘেঁষে বসল, হাত দিয়ে ওঁকে জড়িয়ে ওঁর কাঁধে মাথাটা নুইয়ে রাখল।

আমি এবার দাঁড়িয়ে পডলাম। কী করছি বোঝবার আগেই আমি ঠেকাতে-আসা হাতগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে দাঁত-নখ বসিয়ে দিলাম, আর দেয়ালটা ঘুরে বেরিয়ে এলাম। যমুনার দিকে ছুটে যেতে-যেতে চিৎকার ক'রে উঠলাম: 'আইয়ো, যমুনা—একটা কেউটে, একটা কেউটে ওখানে···'

যমুনার দিকে ছুটে যেতে-না-যেতে, ইস্কুল মাস্টার দাঁড়িয়ে প'ড়ে তাড়াতাড়ি ধুতিব পাট সামলে নিয়ে ভোঁ দৌড় দিলেন। ছেলেরা টিটকিরি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠে গাঁয়ের দিকে চ'লে গেল। শাড়ির আঁচলটা খ'শে পড়ার জন্যে যমুনার হাত বা বুক ঢাকা ছিল না। ও কাঁপতে-কাঁপতে দাঁড়িয়ে পড়ল, কিন্তু যেখানে ছিল সেখান থেকে নডল না। কিছু ভাববার আগেই, আমি একটা ঢিল আমার সব শক্তি দিয়ে কেউটেটাকে তাগ ক'রে ছুঁড়ে মারলাম। ল্যাজের দিকটায় গিয়ে লাগল, সাপটা যন্ত্রণায় মোচড় দিয়ে উঠল আর ফণাটা মেলে ধরল। যমুনা তখনো হতভম্ব হ'য়ে

দাঁড়িয়ে, নড়ছে না—আমি ওকে আমার মাথা দিয়ে একটা ধাক্কা দিলাম। আমরা কয়েক গজ ছুটে গেলাম, আর জোরে-জোরে নিশ্বাস নিতে-নিতে দাঁড়িয়ে পড়লাম, আমার মাথাটা ওর খোলা পেটের কাছে। টের পেলাম, কেউটেটা আমাদের লক্ষ করছে, হিস-হিস শব্দ ক'রে উন্মত্ত হ'য়ে পাথরটাকে ছোবল মারছে। আমি আরেকটা ঢিল ছুঁড়লাম, এবারে তাগ ফশকাল। পাথরের ফলকটা বেয়ে সাপটা নেমে এল, ওর ঐ অনেকখানি লম্বা-টানা শরীরটা আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। আমি যমুনাকে হাত দিয়ে টেনে দৌড়ুতে লাগলাম। ক-গজ পরে ও অবসাদে ভেঙে পড়ল, আর পেছন ফিরে দেখি, আমাদের থেকে খুব দূরে নয় একটা গর্তের মধ্যে কেউটেটা মাথা ঢুকিয়ে দিচ্ছে। আমি মন্ত্রমুগ্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, ঠিক যেন স্বপ্নের ঘোরে আছি—ওর দীর্ঘ আঁকাবাঁকা শরীরটা মাটির তলায় অদৃশ্য হ'য়ে যাচ্ছে। অবশেষে যখন ওর ছুঁচলো ল্যাজটাও দু-একবার ন'ড়ে মিলিয়ে গেল, আমি এক মুহূর্তের জন্যে নিথর দাঁড়িয়ে রইলাম, আর বুঝলাম আমার নেঙটিটা আমি ভিজিয়ে ফেলেছি—আমার ভেতরের জিনিশগুলো ভয়ানক স্যাঁতসেঁতে আর কেমন বিচ্ছিরি ঠেকছিল।

নিশ্চয়ই গর্বে ফুলে-ফেঁপে উঠেছিলাম; বাড়ি ফেরার পর আর কাঁদিনি। সব ক-টা দরজায় ছিটকিনি দিয়ে জানলাগুলো বন্ধ ক'রে ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘরটায় ঢুকলাম। যমুনা যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছিল, আমাকে ওর কাছে ডাকল। অন্ধকারে হাৎড়ে-হাৎড়ে পৌঁছলাম ও যেখানে শুয়ে ছিল, ঠাণ্ডা মেঝেতে চিৎ হ'য়ে। আমাকে যেই ও ওর হাত দিয়ে জড়িয়ে ধ'রে মেঝেতে গড়াল, আমি আঁৎকে উঠে টের পেলাম যে ও একেবারে উলঙ্গ। ও-ভাবে বেঁধে রাখার জন্যে আমার দমবন্ধ হ'য়ে আসছিল। ও ওর দুই উরু দিয়ে আমাকে আটকে রাখল, আর গোল পেটটার ওপরে আমার মুখটাকে আঁকড়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল—'ওঃ! জলছে, জলছে, জলছে, জলছে!' আর গভীর রাত্তিরে একলা কুকুরগুলো একটানা যেমন কাৎরায় সে-রকম কাৎরাতে লাগল। আমি জোর ক'রে ওর কবল থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিলাম, আর ও যেই আমাকে আঁকড়ে ধরতে এল ওর হাতে এক লাথি কষিয়ে দিলাম। এক কোণে গিয়ে আমি বললাম, 'আমি বাড়ি যেতে চাই, আমাকে পাঠিয়ে দাও।' ও কোনো উত্তর দিল না। আমার খিদে পেয়েছিল ব'লে আমি কাঁদতে শুরু ক'রে দিলাম। যমুনা উঠে, অন্ধকারে শাড়ি প'রে, রান্নাঘরে গেল। আমার পছন্দসই খাবারটাই ও নিয়ে এল—দুধ-চিনি দিয়ে খই।

দরজায় কড়া-নাড়ার শব্দ হ'লো। যমুনা উঠল না, একটা কথাও বলল না। আমাকে জমিদারের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে ব'লে শাস্ত্রী চেঁচিয়ে উঠল। যমুনা

আমায় বলল, 'যদি চাস তো যেতে পারিস। সকাল হ'লে ওরা তোকে বাড়ি পাঠিয়ে দেবে।'

'আমি যাবো না।' আমি বললাম।

ওরা এবার দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল আর চিৎকার করতে লাগল।

'এটা গাঁয়ের সবাইকার ইচ্ছে। গাঁয়ের প্রতিমাকে অপবিত্র কোরো না। আমরা তোমার বাবাকে ডাকতে পাঠিয়েছি। উনি এলে যথাযোগ্য ক্রিয়াকর্মের পর তোমাকে জাতিচ্যুত করা হবে। মনে থাকে যেন, মন্দিরে যাবে না, তোমার নোংরা হাত দিয়ে ছেলেদের খেতে দেবে না।'

তার পরে আবার সব শোচনীয়ভাবে চুপচাপ হ'য়ে গেল। অনেকক্ষণ অন্ধকার ছিল নিশ্চয়ই, কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম খেয়াল নেই।

যখন চোখ মেলে চাইলাম, দেখি, একটা বিছানায় শুয়ে আছি, শাড়ি দিয়ে ঢাকা। কিন্তু যমুনা আমার পাশে ছিল না। আমি বেগে গেলাম। আমার মনে হ'লো যমুনা আবার ঐ পোড়ো জায়গাটার দিকে গেছে। আমি পেছনের উঠোনে বেরিয়ে এলাম, আর মুহূর্তে ঐ সাপটিকে ঘিরে যত রাজ্যের ভয় জড়ো হ'লো— দেবতা আর রাক্ষস ছাত থেকে উলটো হ'য়ে ঝুলছে। কার যেন নিচু গলা শুনে আমি চমকে উঠলাম, কিন্তু অচ্ছুৎ কাতিরা, রোজ যে উচ্ছিষ্ট ভিক্ষে করতে আসে, তাকে দেখে, আশ্বস্ত হলাম। বললাম, আমাকে যেন ও পোড়োজমিটার কাছে নিয়ে যায়, বুঝিয়ে বললাম, যে যমুনা ওখানে আছে।

আমরা বেরিয়ে পড়লাম, কাতিরা আমার সামনে-সামনে। আমি এতই ঘাবড়ে গিয়েছিলাম যে কাতিরাকে সন্ধেবেলার ঘটনাগুলো একে-একে খুলে বলতে লাগলাম। অচ্ছুৎ হওয়ার দরুন ও কোনো কথা বলল না, হুকুম তামিল করাই ওর কাজ, কথা বলা নয়। আমরা জঙ্গলের ভেতর ঢুকলাম। কাতিরা একটা সুর গুনগুন করতে লাগল, আর বাঁশের মশালটা দোলাতে লাগল যাতে সেটা উজ্জ্বল হ'য়ে জ্বলে। হঠাৎ আমার মনে ভীষণ একটা ভয় এল। ও কি মানুষ, না প্রেত? ঐ কালো আলুথালু চেহারার উলঙ্গ লোকটা, মশালটা যে দোলাচ্ছে? আমি শুনেছিলাম অন্ধকার বাত্তিরে অচ্ছুৎদের ভূত-প্রেতে ভর করে। আমি নিজেকে আশ্বস্ত করতে চাইলাম, তাই কোনো ব্রাহ্মণ ছেলে কখনো যা করবে না, তাই করলাম। আমি ওকে ছোঁবার জন্যে ওর দিকে ছুটে গেলাম। কিন্তু ও দৌড়ে স'রে গেল—অচ্ছুৎরা চায় না যে ওদের ছোঁয়া হোক, ওদের কাছে সেটা একটা শাপের মতো। আমি সেটা জানতাম, কিন্তু জঙ্গলের দৈত্যের মতো সব গাছ আর

অন্ধকারে মশাল হাতে ঐ চকচকে কালো লোকটা আমার কাছে অসহ্য হ'য়ে উঠেছিল। আমার ফিরে যেতে ইচ্ছে করছিল। যতক্ষণ ঐ সব গাছ আব ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে আমি দাঁড়িয়েছিলাম, আমার মনে হচ্ছিল জঙ্গলের বাসিন্দাবা আমার দিকে চুপিসাড়ে গুড়ি মেরে এগিয়ে আসছে। হতভম্বের মতো আমি কাত্তিরার পেছন-পেছন হেঁটে চললাম।

আমি যখন সর্পপীঠের কাছে এলাম, যমুনা সেখানে একা। পীঠের গায়ে ঠেশ দিয়ে একটা হাত গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে যমুনা বসেছিল। একবার ভাবলাম, যমুনা কি ম'রে গেছে। ঠিক আছে, এবার আমায় বাড়ি যেতে দাও—মনে-মনে বললাম। আমি এবার বেশামালভাবে কাঁপতে শুরু করলাম। মা বলত কেউটেরা বারো বছব ধ'রে রাগ পুষে রাখে। আর ওদিকে ও মাটির অন্ধকাবে কুণ্ডলি পাকিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে। যাই হোক, একটা কঞ্চি তুলে আমি যমুনাকে খোঁচালাম। যমুনা উঠে দাঁড়িয়ে বলল : 'চ'লে যা।' আমি বললাম, 'আমি যাবো না।' তখন ও উঠে আমার সঙ্গে হেঁটে চলল। কাত্তিরা গুনগুন ক'রে স্তব ভাঁজতে-ভাঁজতে আমাদের বাড়ি নিয়ে এল।

বাড়ি ফিরে এসে যমুনার সঙ্গে তর্ক করার একটা বিফল চেষ্টা করেছিলাম। যমুনা রাগিভাবে জবরদস্তি করতে লাগল যে আমাকে ওর সঙ্গে ক-মাইল হেঁটে ছোটোজাতেব লোকেদেব একটা গাঁয়ে যেতেই হবে। না-হ'লে, ও জিগেস করল, আমি ওকে মরতে দিই না কেন? আমরা একটা গোরুর গাড়ির পথ ধ'রে হেঁটে এলাম, আর সারাটা পথ আমি মুখ ভার ক'রে রইলাম আর ক্যাঁচক্যাঁচ করলাম। খানিক বাদে আমরা একটা মাটির ঘরের কাছে এলাম, আর ওখানে ছাত থেকে ঝোলানো একটা লণ্ঠনের আলোয় দেখলাম ইস্কুল মাস্টার দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু এবার উনি যমুনার দিকে নির্দয়ভাবে কটমট ক'রে তাকিয়ে জিগেস করলেন আর কতক্ষণ উনি এ-ভাবে অপেক্ষা করবেন। উনি কি যমুনাকে তাড়াতাড়ি আসতে বলেননি? উনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এই যে পবুনু,' আব যমুনাকে কুঁড়েঘরটার ভেতরে নিয়ে গেলেন। যমুনা আমাকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলল।

ওটা একটা ছোটো জাতের লোকের বাড়ি। আমি গন্ধ শুঁকেই বুঝতে পেরে-ছিলাম : গন্ধটাকে ঘেন্নাও করতাম, মাছ আর উঠোনে মুরগির খোঁয়াড় থেকে আসছে। গোঁড়া ব্রাহ্মণ-পরিবারে মানুষ হওয়ার জন্যে আগে কখনো এ-রকম জায়গায় পা রাখিনি। ঠিক বাড়িটার সামনে একটা মস্ত মানের গামলা ছিল, তামার তৈরি। আমি যেখানে বসেছিলাম সেই আঙিনায় বেরিয়ে এসে একজন

মেয়েছেলে থুতু ফেলল। আমার শিখা আর পোশাকের জন্তে—আমি একটা চাদর আর খাটো ধুতি পরেছিলাম—আমাকে ও-ধরনের বাড়িতে বেমানান লাগছিল, ওখানে নিয়ে যাওয়ার জন্তে যমুনাকে আমি শাপ দিচ্ছিলাম। দেখা যাবে, আমি ভাবলাম, বাবাকে আসতে দাও। যমুনাকে ঠিক টিট ক'রে দেবে।

ছোটো জাতের কিছু লোক এসে পববুকে ডাকাডাকি করতে লাগল। লণ্ঠন নিয়ে পব্বু বেরিয়ে এল একজন কালো চামড়ার লোক, গুণ্ডার মতো তার গোঁফ, মাটির ভাঁড়ে ওদের যা দিচ্ছে তা তালরস হ'তে পারে ভেবে আমার খুব ঘেন্না হ'লো। এটা নিশ্চয়ই তাহ'লে শুঁড়িখানা, যেখান থেকে ছোটো জাতের লোকেরা রাত্তির হ'লে টলতে-টলতে, উলটোপালটা বকতে বকতে বেরিয়ে আসে। যে-মেয়েছেলেটি থুতু ফেলতে এসেছিল, পব্বুর বউ, আবার বেরিয়ে এল আর খদ্দেরদের পাতায় ক'বে মাছভাজা দিল। এত দুর্গন্ধ বেরোচ্ছিল যে আমার বমি পাচ্ছিল। একটা লোক তার মাটির ভাঁড় ফের ভরতি কববার জন্তে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল, আর আমাকে ওখানে দেখে হো-হো ক'রে হেসে টিটকিরি দিতে লাগল। মাতাল অবস্থায় শুঁড়িখানার মধ্যে ও কোনো বামুনের ছেলেকে দেখে দারুণ মজা পেয়েছে। আমি আমাদের শহরেও মাতালদের দেখেছি, জানতাম ওরা কী ভয়ানক হ'য়ে উঠতে পারে, তাই সোজা কুঁড়েঘরটার মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

যমুনা ওখানে একটা মাদুরের ওপর চিৎ হ'য়ে শুয়ে। একটা তোয়ালে দিয়ে ওর গোপন অঙ্গটুকু ঢাকা ছাড়া ও পুরোপুরি উলঙ্গ। ওর পেটে গোবর লেপটানো আর তার ওপরে একটা মাটির প্রদীপ জ্বলছে। আমি হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। পব্বু ওটাকে একটা গোল পাত্র দিয়ে ঢেকে দিয়ে বলল, 'ব্যস, ওটাকে ওখানে থাকতে দাও, শুষে নিক।' যমুনাকে ও-অবস্থায় দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। ও ভাবে ওকে শুয়ে থাকতে দেখে মনে হচ্ছিল ও বুঝি ম'রেই গেছে—হাত-দুটো ছড়ানো, চোখ বোজা। আমি কাছে গিয়ে আমার চাদর দিয়ে ওর বুকটা ঢেকে দিলাম। কালো চামড়ার লোকটা আর ইস্কুল মাস্টার দু-পাশে ঘিরে আছে, ওদের ভয়ে কান্না গিলে নিয়ে ফিশফিশ ক'রে বললাম, 'যমুনা, উঠে পড়ো। আমি বাড়ি যেতে চাই, আমি ঘুমোতে চাই।'

কিন্তু হঠাৎ ইস্কুল মাস্টার আমাকে পাঁজাকোলা ক'রে তুলে বাইরে নিয়ে এলেন। ছাড়িয়ে নেবার জন্তে চেষ্টা করার মতো সাহসও আমার কুলোলো না। পব্বু বেরিয়ে এসে ইস্কুল মাস্টারকে বলল: 'ঠিক আছে, এখন তুমি যেতে পারো।' ইস্কুল মাস্টার কী যেন বিড়বিড় করলেন আর ওঁর শার্টের পকেট থেকে কিছু টাকা বের

ক'রে ওর হাতে দিলেন। আমার মনে হ'লো উনি বললেন কাল উনি ট্রেন ধ'রে বাড়ি চ'লে যাবেন ; আর আজ রাত্তিরে শহরে গিয়ে থাকবেন। উনি যখন আমাদের শহরের নাম করলেন, আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে ব'লে আমি কেঁদে উঠলাম। উনি হেসে উঠলেন, 'চুপ কর,' আর অন্ধকারে টর্চের আলো ফেলতে-ফেলতে হন্তদন্ত হ'য়ে চ'লে গেলেন।

সব যেন ঠিক একটা দুঃস্বপ্ন। মনে পড়ে না কখন-না-কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যখন ঘুম ভাঙল, তখন পরিষ্কার ঝকঝকে সকাল। মনে করবার চেষ্টা করলাম, আমি কোথায় আছি আর কী ক'রেই বা এখানে এলাম। কেবল একটা কথাই মনে করতে পারছিলাম—আমার বাবা-মা এক ভোরে আমাকে বেদ শিক্ষার জন্যে উড়ুপার কাছে গোরুর গাড়িতে ক'রে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু এই বাড়িতে আমি এলাম কেন ? ন্যক্কারজনক পরিবেশ, একটা মুরগি উঠোনে ময়লা খুঁটছে, তালরসের তাড়ির কটু গন্ধ আসছে। মুরগিটা যেখানে খুঁটছিল সেখানে বমিও ছিল, কে জানে আমার কিনা। আমার বয়সী একটা ছেলে, জামা আর ঢিলে পাজামা পরা, মাথার চুলে কদমছাঁট, উঠোনে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। আর একবার ওর ঢিলে পাজামাটা নামিয়ে নিয়ে ফোয়ারার মতো হিশি দিয়ে ছবি আঁকল। সেইসঙ্গে ও শিটিও দিল, তারপর হঠাৎ একটা মুরগিকে তাড়া করল। উঠোনের এ-দিক ও-দিক মুরগিটা ছুটে বেড়াতে লাগল। শেষ-মেষ ছেলেটা ওকে উলটো ক'রে ধ'রে তাড়াতাড়ি মা-র কাছে নিয়ে গেল, অনেকক্ষণ ধ'রে ওর মা ওকে ডাকছিল। ও যেভাবে ওটাকে ধরেছিল, আর যা অদ্ভুত করুণ শব্দ করছিল তাতে আমি মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ পরে মুরগিটা লম্বা তীক্ষ্ণ চিৎকার ক'রে উঠল, তার পরে একটা ছোট্ট ধারালো শব্দ, আর আমি কেঁপে উঠলাম।

যমুনা এবার টলতে-টলতে বেরিয়ে এল, অবলম্বনের জন্য দেয়ালে হাত রেখে। ওকে খুব ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে, আর খুব ছোটো, একরত্তি। আমাকে দেখতে পেয়ে ও কাঁদতে শুরু করল। আমি ওর কাছে গিয়ে ওকে ধরলাম। পব্বু বলল, 'তুমি এখানে খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিতে পারো।' কিন্তু ওর দিকে একবার তাকালও না।

আমার হাতে ধ'রে যমুনা বিহ্বলের মতো হাঁটতে লাগল। বাড়ি ফিরতে পারছি ব'লে আমি খুব খুশি হলাম। পব্বুর কুঁড়েঘরটা যখন চোখের আড়ালে চ'লে গেছে তখন লক্ষ করলাম যমুনার রঙ-উঠে-যাওয়া শাড়িটায় রক্তের ছোপ, আর তাই দেখে আঁৎকে ব'লে উঠলাম, 'যমুনা, রক্ত!' মাটিতে রক্তের ফোঁটা প'ড়ে-

প'ড়ে আমাদের চলার পথের নিশানা ছ'কে দিচ্ছে। যমুনা মাটিতে ব'সে পড়ল। আমি পাশে এসে বসলাম, ভাবলাম ছুটে গিয়ে জল নিয়ে আসবো কিনা। কিছুক্ষণ পরে ও চোখ খুলল। কিছু বলল না।

এবাব আমি শাস্ত্রীকে দেখতে পেলাম, জমিদারদের ছেলে আর গ্রামের কিছু ব্রাহ্মণ যুবক আমাদের দিকে আসছে।

আমি যমুনাকে খোঁচা মেবে বললাম, 'উঠে পড়ো, ওরা আসছে। যাওয়া যাক।'

ও কোনো কথা বলল না।

অধীরভাবে আমি ওকে আবার খোঁচা মাবলাম। 'যাওয়া যাক, যমুনা। আমি তোমাকে আমার মায়ের কাছে নিয়ে যাবো। মা তোমাকে দেখবে।'

'আমি খুব ক্লান্ত, সোনা। তুই ওদের সঙ্গে যা।'

'কিন্তু তুমি বুঝতে পারছো না? ওরা তো তোমার জন্যে আসছে, যমুনা। ওঠো, শিগগির ওঠো।'

আমি কাঁদতে শুরু ক'বে দিয়েছিলাম।

'কিছু এসে যায় না, সোনা। ওদের আসতে দে ··'

যমুনা আমার গালে হাত বুলোতে লাগল, আর এক নাগাড়ে 'ওদের আসতে দে—' ব'লে বিড়বিড় কবতে লাগল। ওরা কাছে এসে পড়ল। যমুনা, মাথাটা তখনো নোয়ানো, বলল: 'ওরা তোকে তোর বাবা-মা-র কাছে নিয়ে যাবে, সোনা, কাঁদিসনে।' ততক্ষণে ওরা আমাদের চারপাশে ভিড ক'রে দাঁড়িয়েছে। আমি যমুনাকে শক্ত ক'রে আঁকড়ে ধরলাম। আমার পিঠ বেয়ে ওর হাত চ'লে গেল। শাস্ত্রী আমাকে টেনে নিল। 'যমুনা, যমুনা,' আমি ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে-করতে চেঁচিয়ে উঠলাম, কিন্তু যমুনার চোখ তখন ওপর দিকে, বহু দূরে।

বাবা এলেন আর আমাকে বাড়ি নিয়ে গেলেন। আমার খুব আনন্দ হ'লো। বাড়ি পৌঁছুতেই আমাকে নতুন একটা পৈতে পরানো হ'লো আর পঞ্চগব্য দিয়ে শুদ্ধ করানো হ'লো। মা জিগেস করাতে আমি সবকিছু ব'লে দিলাম। মা-র মুখ দিয়ে বেরোলো, 'সর্বনেশে মাগী, পেট করাতে গেলি কোন দুঃখে?' আমার এই ভেবে খুব অবাক লাগলো যে মা গর্ভবতী হ'তে পারে, কিন্তু যমুনাদি গর্ভবতী হ'লেই যত দোষ? কয়েকদিন পরে খবর এলো যে যমুনাদি যদিও বেঁচে, উডুপা তবুও তার শ্রাদ্ধ করিয়েছেন আর তাকে জাতের বার ক'রে দিয়েছেন।

বাবা-মা উড়ুপার প্রশংসা ক'রে বলতে লাগলেন, 'উড়ুপা মানুষটা সত্যি মহৎ।' আর যমুনাদিকে গালাগাল দিয়ে বললেন, 'কুলটা মাগী!

কয়েকদিন পরে আমাদের বাড়িতে উড়ুপার বিয়ের নেমন্তন্ন এলো। বাবার কাছ থেকে যখন শুনলাম যে কী ভাবে এক অল্পবয়সী মেয়ে সঙ্গে নিয়ে এক বেদীতে ব'সে বুড়ো উড়ুপা আরতি করেছেন, আমার মুখ ফশকে বেরিয়ে এলো, 'ছী-ছি!' বাবা বললেন, 'ছি! এ-রকম বলতে আছে!' মা বললেন, 'ও যখন ভ্রষ্টাই হ'য়ে গেছে তখন আর কী? উড়ুপাকে তো নিজের ঘরসংসার সামলাতেই হবে, অন্তত রুটি বানাবার জন্যেও কাউকে চাই। যাই বলো, দিনকাল বেশ খারাপ পড়েছে।'

অনুবাদ : শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়

‘আধুনিক ভারতীয় গল্প’

কাকে আমরা বলবো ‘ভারতীয়’ গল্প ? এবং ‘আধুনিক’ ?

উত্তর ভেবে-ওঠার আগে হয়তো কতগুলো বিষয় খেয়াল ক’রে দেখা উচিত। ভারতীয় গল্প কি তাকেই বলবো যার পটভূমি ভারতীয়, এবং প্রধান-সব পাত্র-পাত্রীও ভারতীয়? না কি আছে গল্প সাজাবার এমন-কোনো পদ্ধতি বা উপায়, যেটা ভারতবর্ষে ছাড়া আর-কোথাও পাওয়া যাবে না—যেমন হয়তো ছিলো এককালে—‘পঞ্চতন্ত্র’, ‘হিতোপদেশ’ থেকে ‘দশকুমারচরিত’ অব্দি কথা, আখ্যায়িকা ইত্যাদির এক প্রকাণ্ড ভাণ্ডার ? আর, আধুনিকতা—সে-ই বা কী ? সে কি কোনো বিশাল একশিলা—অনড়, অবিচল এবং বিশ্বগ্রাসী ? অর্থাৎ সর্বত্রই কি তার চেহারা এক-রকম—না কি দেশে-দেশে তার রূপ ভিন্ন ? আধুনিকতার যদি কোনো আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য না-থাকে, যদি তার না-থাকে কোনো ইতিহাস, অথবা শ্রেণীচরিত্র, তবে অবশ্য একটাই তার ঢং আর অভ্যাস, একটাই তার পরিচয়। কিন্তু, ধরা যাক, উপনিবেশ যারা বানিয়েছিলো, আর উপনিবেশ হ’য়ে যারা দিন কাটিয়েছে—তাদের বিবর্তন কি সত্যি একরকম হ’তে পারে ? আধুনিকতার কোনো-একটা সংজ্ঞার্থকেই, তাই, হয়তো সার্বভৌম ব’লে উপস্থাপিত করা যাবে না। পুরোনো বা সেকেলে ধ্যানধারণা, প্রথাপার্বণ, রীতিনীতি—কোনো-কিছুই যে তর্কাতীত নয়, সবকিছুরই যে পুনর্বিচার হওয়া প্রয়োজন, সবকিছুকেই যে প্রশ্ন করা যায়—এ-রকম একটা মনোভাবকে, দৃষ্টিভঙ্গিকে, যদি আধুনিকতার লক্ষণাক্রান্ত ব’লে ধ’রে নেয়া যায়, তাহ’লে হয়তো কোনো-একটা চেহারা ফুটে উঠবে ধীরে-ধীরে—অন্তত আপাতত যেটাকে আলোচনার খাতিরে আমরা স্বীকার ক’রে নিতে পারি। আর ভারতীয় পটভূমি বা ভারতীয় পাত্র-পাত্রী থাকলেই যদি ভারতীয় রচনা হ’তো, তবে তো কিপলিং হতেন আধুনিক ভারতীয় কথাসাহিত্যিক—তবে তো ‘এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া’ হ’তো আধুনিক ভারতীয় উপন্যাস! এ যেন—আফ্রিকায় ফাঁদা হয়েছে ব’লেই এবং অনেক কালা আদমি আছে ব’লেই—রাইডার হ্যাগার্ডের ‘কিং সলোমন’স্ মাইন্‌স’ আফ্রিকার সাহিত্যের নিদর্শন, অথবা জয়েস ক্যারির ‘মিস্টার জন্‌সন’ও তাই। কিন্তু সে-রকম যেহেতু আমরা কখনো ভাবিনি, অতএব ধ’রে নিতে হবে আফ্রিকা বা ভারতের সাহিত্য ব’লে যাকে বর্ণনা করা হবে তার বৈশিষ্ট্য নিহিত আছে অন্যত্র : হয়তো চিন্তার প্রকৃতিতে, উপস্থাপনার ভঙ্গিতে, বিন্যাসের কৌশলে;

হয়তো উপমায়, রূপকে, উৎপ্রেক্ষায়; হয়তো বলার সুরে, স্বরের উত্থান-পতনে, অভিনিবেশের মাত্রা ও অনন্যতায়। অন্ধকারে অতর্কিতে ধাক্কা দিয়ে এককালে গোপাল ভাঁড় চিনতে পেরেছিলো প'রচয়-গুপ্ত এক নবাগতকে—এই মর্মে একটা কিংবদন্তি আছে। হয়তো গল্পের মধ্যকার এই ধাক্কাটাই চিনিয়ে দেয় গল্পটা ভারতীয় কি না। এই সংকলনের প্রস্তাবনায় আমরা এ-রকম একটা কথাকেই একটু অন্যভাবে বলবার চেষ্টা করেছি: ধর্ম (তার সংস্কার ও প্রথা), জাতপাঁত, মেয়েদের প্রতি ব্যবহার, সাম্প্রদায়িকতা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু ··এই রকম কোনো-কোনো বিষয়ই দেখা যাবে আমূল ধাক্কা দেয় আমাদের বোধ ও বুদ্ধিতে—হয়তো পুরোপুরি ভারতীয় বিষয় ব'লেও কোনো-কোনো প্রসঙ্গ, সত্যি, আছে। এই সংকলনের প্রথম খণ্ড থেকেই পাঠক হয়তো বুঝে নিতে পারবেন কেন 'আধুনিক ভারতীয় গল্প' ছাড়া এই সংকলনের আর-কোনো নাম হ'তে পারতো না। ভারতীয়ত্ব সত্যি কী আজকের দিনে—সাহিত্য যদি জীবন ও সমাজেরই দর্পণ হয়, তাহ'লে, আশা করা যায়, গল্পগুলোই অনায়াসে বুঝিয়ে দিতে পারবে—কেননা, শেষ অব্দি তো, সমালোচনার সব ছুরি-কাঁচি ছাড়াই, গল্পগুলোই সোজাসুজি উদ্‌ঘাটন ক'রে দেবে তাদের তাৎপর্য।

আর ভারতীয় গল্পের কোনো সংকলনে রবীন্দ্রনাথ না-থাকলে কী ক'রে ফুটে উঠবে চেহারাটা? প্রথম খণ্ডে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ নেই—আবার এক অর্থে আছেও। কেননা কে না জানে যে 'দেবী'র কাহিনীর সূত্র প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২) পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথেরই কাছে, যদিও রচনাটি পুরোপুরি প্রভাতকুমারের নিজস্ব। আজ ভেবে আশ্চর্য লাগে, এমন একটা গভীর-জটিল বিষয় নিয়ে, এমন অনায়াসে, সহজে, প্রভাতকুমার লিখেছিলেন কেমন ক'রে। প্রথম পঙ্‌ক্তি থেকেই স্বচ্ছন্দগতিতে গল্প এগোয় তার প্রখরনিষ্ঠুর সমাপ্তির দিকে। যেন কোনো সূচিশিল্প, প্রত্যেকটা ফোঁড় প্রত্যেকটা সুতোকে বুনে-বুনে যায়: দু-একটা আঁচড়েই প্রতিষ্ঠা করা হয় নবদম্পতির মানস-সারল্য, বিশেষত দয়াময়ীর—যখন তার চোখ টিপে ধরে তার স্বামী, আর সে বোঝবার আগেই ব'লে ফ্যালে কখন সে জেগে উঠেছিলো। তার মনে কোনো জটিল ঘোরপ্যাঁচ নেই, সরলা, স্নেহশীলা বালিকাই তো সে এখনও। খোকা এখনও কেন এলো না, এমন তো কখনও হয় না—এই নিয়ে তার শঙ্কা; শ্বশুর তাকে 'দেবী' ব'লে সম্বোধন ক'রে যখন তার পায়ে প'ড়ে যান, তখন তার হতভম্ব, করুণ অবস্থা; যখন কাকতাল ঘটে একের পর এক, কারু প্রসব হয় অনায়াসে, অথবা বেঁচে ওঠে মরণাপন্ন রোগী, তখন তার দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সব যেন কোনো

দুর্বোধ্য বেড়াজালের মতো তাকে ঘিরে ধরে। তারপরে খোকার যখন অসুখ করবে, তখন-যে তারই ওপর সবাই নির্ভর করবে—এটা প্রায় গণিতের মতো অনিবার্য ধারাবাহিকভাবে এগোয়। মাঝখানে মুক্তির রাস্তা একবার যে হাতছানি দেবে তার স্বামী মারফৎ, কিন্তু শেষ অব্দি দয়াময়ী যে সে-রাস্তায় এগুতে পারবে না—এটাও জানা থাকেই। কিন্তু গল্পটার জোর এইখানেই যে একবার দয়াময়ীকে দেবীরূপে প্রতিষ্ঠা করার পর আমাদের অনুমান করতে দেরি হয় না কী ঘটতে চলেছে, অথচ তবু কখনও মনে হয় না সব প্রত্যাশিত খুঁটিনাটি সত্ত্বেও এটা বানানো, অঙ্ক ক'ষে তৈরি-করা, ধাপে-ধাপে টেনে-নিয়ে-আসা। বিষয়ের মাহাত্ম্যই হয়তো, কিংবা হয়তো এই ছমছম-করা অনিবার্য পবিণতির টান—এই দুইই পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধের মতো আটকে বাখে। খোকার মৃত্যু, দয়াময়ীর আত্মহত্যা, আর কালী-কিঙ্করের সারা জীবনের বিশ্বাস আর ভক্তিব এই অপঘাত বিনাশ—এগুলো এমন বিষয় নয় যা নিয়ে কসবৎ করা যায়, আভাঁ-গার কারদানি দেখানো যায়—কেননা বিশ্বাসের যে-জগতের ওপর এই গল্প নির্ভর ক'রে আছে, সেখানে অন্যসব কলাকৌশল অবান্তর হ'তো। সহজ কথা নেই এই গল্পে, কেননা এ দাঁড়িয়ে আছে, মনস্তাত্ত্বিক চাপ ছাড়াও, ধর্মবিশ্বাস, কুসংস্কার, স্বপ্ন ও সত্যের টানাপোডেনের ওপর, অথচ কেমন সহজে, সাবলীলভাবে, প্রভাতকুমাব দাঁড করিয়ে দেন এই জগৎটিকে, যেখানে এই ভয়ংকব ব্যাপারগুলো শুধু যে সম্ভব ছিলো, তা-ই নয়, স্বাভাবিকও ছিলো। আমাদের হিন্দু সমাজে ধর্ম, এবং তার প্রকাশ—এবং জীবনমৃত্যু—নিয়ে এই ছিনিমিনি এমনভাবে এব আগে আর-কেউ প্রকাশ করেননি।

দেবীর জন্ম ও মৃত্যুর পাশাপাশি রেখে যদি শিবরাম চক্রবর্তীর 'দেবতার জন্ম লক্ষ করা যায়, তাহ'লে হয়তো বোঝা যাবে কেমন ক'রে দেবতা জন্মান। হাসিব গল্পও যে গভীর-গম্ভীর বিষয় নিয়ে লেখা যায়, এটা তারই একটা অবিস্মবণীয় নিদর্শন। শিবরাম চক্রবর্তীকে অনেক সময়েই ছেলেমানুষি হাসির গল্পের লেখক ব'লে উড়িয়ে দেয়া হয়, যেটা হয়তো আমাদেব দুর্ভাগ্যই, না-হ'লে 'কালান্তক লালফিতা,' 'পঞ্চাননের অশ্বমেধ', 'দেবতার জন্ম' এ-রকম অনেক গল্পের নাম পর-পর ব'লে দেয়া যায়, যে-কোনো সাহিত্যের সম্পদ ব'লে যা গণ্য হ'তো।

'পুতুলনাচের ইতিকথা' মনে আছে? সেখানে যাদব সপরিবারে আত্মহত্যা করেছিলো, হঠাৎ বেফাঁস একটা ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে ফেলে সেটাকে রাখতে গিয়ে : সে যদি 'সত্যি' ধর্মে বা দেবতায় বিশ্বাস করতো, তবে তাকে আফিম খেয়ে আত্মহত্যা করতে হ'তো না—সূর্যবিজ্ঞান যদি তাকে ব'লেই দিতো সে অমুক দিন মরবে, আর

তা যদি 'সত্যি' হ'তো, তবে সে মরতো। কিন্তু আফিম খেয়ে ম'রে সে কী প্রমাণ করতে চাইলো – না, দেবতা আছেন, অতএব ধর্মবিশ্বাস আছে! এটা মোটেই হাসির ব্যাপার নয় – 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র সেটা একটা গম্ভীর শোকাহত মুহূর্ত। এখানে যে-লোকটি গল্পের উত্তম পুরুষকে ধস্তাধস্তি ক'রে পাথর তুলতে দেখলো, সে জানে ওটা নিছকই সামান্য একটা পাথর, কিন্তু সে যখন সেটা প্রতিষ্ঠা করলো শিবলিঙ্গ ব'লে, অন্য লোকদের ভাঁওতা দেবে ব'লে, অন্য লোকদের ধর্মবিশ্বাসকে মূলধন ক'রে ব্যাবসা ফাঁদবে ব'লে, তখন এটা তো ঠিকই ফুটে ওঠে যে তার নিজের ধর্মবোধ বা বিশ্বাস কোনোটাই নেই। আজকাল এই-যে আখছার ব্যাঙের ছাতার মতো রাস্তায়-ঘাটে মন্দির গজিয়ে উঠছে, তার অনেকগুলোই তো কারু-কারু ব্যাবসাবুদ্ধির প্রমাণ। কিন্তু শিবরামের গল্পের মোক্ষম মার এটাই যখন উত্তম পুরুষ বসন্তের ভয়ে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ পড়লো তার সামনে, যে নিজে জানে এটা মোটেই জাগ্রত দেবতা বা শিবলিঙ্গ কিছুই নয়, উটকো একটা পাথর। সে জানে, তার ব্যাবসাদার সেবায়েৎও জানে। কিন্তু তাতে কী। এইভাবেই তো ধর্ম আমাদের ভয় ও ব্যাবসাবুদ্ধিকে নির্ভর ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, ওতপ্রোত জড়িয়ে আছে আমাদের জীবনযাপনের সঙ্গে।

...

প্রেমচন্দ—কে না জানে—ছদ্মনাম। কেন ধনিক রায়কে এই ছদ্মনাম নিতে হয়েছিলো, তাও কারু অজানা নেই। উর্দু ও হিন্দির এই লেখক (কখনও-কখনও নিজের উর্দু লেখাই হিন্দিতে অনুবাদ করেছিলেন প্রেমচন্দ, কখনও-বা হিন্দি লেখাকে উর্দুতে; কিন্তু হিন্দি বা উর্দু যে-ভাষাতেই তিনি লেখেন না কেন, সে-ভাষা সবসময়েই থাকতো আটপৌরে, সহজ, সরল এবং প্রধানত কথ্য, তাঁর বর্ণনা হ'তো প্রত্যক্ষ ও চাক্ষুষ, স্ফটিকশিলার মতো স্বচ্ছ, আর তাঁর রচনা হ'তো আঁটো, যথাযথ, লক্ষ্যভেদী—একটি কথাও থাকতো না যেটি অবান্তর বা প্রসঙ্গচ্যুত।) কলাকৈবল্যবাদে কখনও বিশ্বাস করেননি, এমনকী তখনও না, গোড়ার দিকে যখন তাঁর কোনো-কোনো রচনায় মনে হ'তে পারতো আবেগ আর অনুভূতিই বুঝি সমস্ত সম্বল। শেষদিকে তাঁর রচনা আরো-একাগ্র, আরো-তীক্ষ্ণ, আরো-লক্ষ্যভেদী হ'য়ে উঠেছিলো—বড়ো ঘরের বউ থেকে তিনি ক্রমশ নেমে আসছিলেন চাষী, মজুর, অচ্ছুৎদের দৈনন্দিন জীবনচর্যায়; যদি-বা তখন কখনও আসতো অভিজাত সম্পন্ন ঘরের কথা, 'শতরঞ্জ কা খিলাড়ী'তে যেমন, তাদের তিনি তখন দাঁড় করাতেন কাঠগড়ায়—সোজাসুজি অভিযোগ জানাতেন। 'কফন'-এর বাপ-বেটার আলস্য আর 'শতরঞ্জ কা খিলাড়ী'র দুই দোস্তের আলস্যের প্রতি-

তুলনাতেই ধরা পড়বে যে শ্রম, আলস্য ইত্যাদি বিষয়ও তাঁর কাছে কতটা আপেক্ষিক হ'য়ে উঠছিলো—হ'য়ে উঠছিলো শ্রেণীবিভক্ত সমাজের বৈশিষ্ট্য উদঘাটনের উপায়, যেখানে প্রথমোক্তদেব আলস্য যদি-বা হয় উলটনো প্রতিবাদ, দ্বিতীয় দলেব আলস্য হ'যে ওঠে অনিবার্য মৃত্যুরই নামান্তর। গোডাব দিকের প্রেমচন্দ পডতে গিয়ে কাক হয়তো মনে হবে শরৎচন্দ্রের কথা—কিন্তু শেষ দিকে? ম্যাকসিম গর্কি, অথবা লু শুন। এটা সম্ভবত নিছকই কাকতাল নয় যে প্রেমচন্দ একসময় গর্কিকেও অনুবাদ করেছিলেন।

'সদ্গতি' আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন কোনো গল্পই নয়—যেন আমরা মুখোমুখি দাঁডিয়ে প্রত্যক্ষ কবছি কেমনভাবে আমাদেব সমাজ জাতপাঁতের বিভিন্নতাব শেকলে আষ্টে-পৃষ্ঠে আটক রেখেছে অচ্ছুৎদেব, সমাজের নিচুতলাব জীবদের, যাতে উচ্চবর্ণের লোকদের পক্ষে সুবিধে হয় তাদের শোষণ করতে। এই জাতপাঁতের ব্যাপারটা যেন সেই মস্ত গাছের গুঁডির মতো, যার গায়ে, অনবরত কুঠারের ঘা হেনে গেলেও, আঁচডটুকুও পডবে না। না কি পডবে, শেষটায়, কোনো-এক অনাগত সময়ে? কেননা প্রতিবাদ এখানে আসে গোঁড যুবকের উগ্র বুলিতে, যে মানতে পারে না পণ্ডিত কেন এভাবে দুখি চামারকে ব্যবহাব ক'রেই চলবেন। সে-ই চামারপল্লিতে গিয়ে বলে কেউ যেন মৃতদেহ সংকারের ব্যবস্থা না-করে সে রাগ করে, তেরিয়া হ'য়ে দুখিকে খেপাতে চায়, যখন পারে না তখন চামারপল্লির অন্যদের পুলিশের ভয় দেখায়। 'কফন'-এ এমন-কোনো চরিত্র ছিলো না, যে তাদেব ভেতরকার রাগ, ক্ষোভ, হতাশাকে এমন স্পষ্ট ভাষা দিতে পারতো, সে-গল্পের চৌহদ্দিতে তার কোনো অবকাশ বা সুযোগও ছিলো না। কিন্তু 'সদ্গতি'তে জকরি ছিলো গোঁড যুবক, ছিলো স্বাভাবিক, কেননা জাতপাঁতের অচলায়তনকে ভাঙবার একটা ইঙ্গিত ছিলো অতীব প্রাসঙ্গিক ও জরুরি।

সত্যিকাব শিল্পই লুকিয়ে রাখে শিল্পকৌশল। আমরা যেন লক্ষই করি না কেমন অনায়াসে প্রেমচন্দ প্রথম পঙ্‌ক্তি থেকে শেষ পঙ্‌ক্তি পর্যন্ত কেমন অমোঘ অনিবার্যতায় এগোন · তাঁর ব্যঙ্গ, তাঁর শ্লেষ, তাঁর তীব্র পরিহাস সবসময় চাপাও থাকে না—ঘাসিরাম পণ্ডিত গল্পে আসবার আগেই দুখির আঁৎকে-ওঠা হাঁ-হাঁ ক'রে-ওঠা কথায় তাঁর পরিচয় পেয়েছিলাম। অথচ তবু গল্পের শেষ অনুচ্ছেদে যখন গাঁয়ের বাইরের মাঠে শেয়াল আর শকুন, কুকুর আর কাক দুখির মাথাটা ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খেতে থাকে, বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়ে সবকিছু, যখন শুনি: 'এই তার আমরণ ভক্তি, সেবা আর নিষ্ঠার পুরস্কার'। 'সদ্গতি'—এই কথাটার অর্থ আমাদের

স্তম্ভিত ক'রে বদ্‌লে যায়; একটা ছোট্ট শব্দ কত-কিছু ধ'রে রাখে তার মধ্যে: ক্ষোভ, হতাশা, রাগ, মরিয়া ব্যঙ্গ, প্রতিবাদ, রুষ্ট চীৎকার—আর দুখি চামারের জন্য এক অসহায় মমতার বোধ। প্রেমচন্দ তাঁর লেখকজীবনের শেষ দিকে আয়ত্ত করেছিলেন সেই কৌশল, যাতে কেন্দ্রীয় শ্লেষ একসঙ্গে এত-সমস্ত তীব্র অনুভূতিকে একটা ছোট্ট শব্দের মোড়কে বোমার মতো বেঁধে রাখতে পারে।

...

এরই পাশে ভগবতীচরণ পাণিগ্রাহীর গল্প 'শিকার' (অথবা যে-নামে সে চলচ্চিত্রে সুপরিচিত: 'মৃগয়া')—হিন্দি থেকে ওড়িয়া ভাষায়। প্রেমচন্দে দুখি চামার সরল, ভীরু, অসহায়; ভগবতীচরণ পাণিগ্রাহীতে 'আদিবাসী' ঘিনুয়া সরল, সাহসী, এই জন্যে আকাট বোকা যে সে বুঝতেই পারে না শোষক বা শাসক শ্রেণী কেন দুই শ্রেণীর মানুষের জন্য দু-রকম আইনকানুন বানিয়ে ফেলে আঁট-ঘাট বেঁধে ব'সে আছে। 'পুরস্কার' সে একটা চেয়েছিলো, 'পুরস্কার' দুখি চামারও একটা পেয়েছিলো। কিন্তু 'শিকার' গল্পের সার্থকতাই এইখানে যে কেমন অনায়াসে ভগবতীচরণ তৈরি ক'রে দেন দুটি পরস্পরবিরোধী জগৎ—একই সময়ে একই পরিবেশে তারা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে—কিন্তু হাঁদা ঘিনুয়া বোঝে না কেন সে কখনও কোনো অন্যায় না-ক'রেও নির্ঘাৎ মরবে, আর সুচতুর সাহেব, এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ, অর্থাৎ আইন-আদালত, উকিল-বিচারপতি, আর্দালি-জল্লাদ, জানেন কেন অন্যায় না-ক'রেও তাকে মরতেই হবে। কেননা ঘিনুয়ার সরল সত্যের জগৎকে বাঁচতে দিলে তাঁদের এতদিনের চেষ্টায়-তৈরি 'পরিশীলিত' নিয়মকানুনের জগৎ টিকে থাকতে পারবে না। ঘিনুয়া মরবার আগেও টের পায়নি কী সেটা ঝপ ক'রে তার ঘাড়ে এসে পড়েছিলো, কিন্তু পাঠক—সে তো প্রথম থেকেই জানে কোন অমোঘ শ্রেণীবিভক্ত সমাজের শিকার ঘিনুয়া।

ভগবতীচরণ উড়িষ্যার বিখ্যাত উপন্যাসিক কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহীর ছোটো ভাই। ভগবতীচরণ বিশ্বাস করতেন শ্রেণীহীন সমাজে; একদিক থেকে তাঁর গল্প-গুলোই ওড়িয়া ভাষায় তৈরি ক'রে দিয়েছিলো সচেতন বামপন্থী সাহিত্য। অর্থাৎ সাহিত্যের যে একটা উদ্দেশ্য আছে, সে যে নিছক বিনোদনের সামগ্রী নয়—সাহিত্য মারফৎ যে উদ্দীপ্ত করা যায় পাঠককে শোষক সমাজের উচ্ছেদে, এটাই তাঁর বক্তব্য, কিন্তু তাঁর রচনার প্রাঞ্জল প্রসাদগুণ, সহজ-সরল ভাষা, আপাত-সহজ বিন্যাস ও কাঠামো, কেমন ক'রে সব কথা মুখ ফুটে না-ব'লেও সোজাসুজি পাঠকের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া যায় বক্তব্য, এবং তাঁর রচনার উন্মুখর উনকথন তাঁকে

অসাধারণ ক'রে তুলেছিলো। খুব অল্পদিন বেঁচে ছিলেন ভগবতীচরণ—কিন্তু খিদুয়ার জিজ্ঞাসাচিহ্নটি ভারতীয় সাহিত্যে চিরকাল প্রশ্ন ক'রে যাবে।

...

এটা খুবই সুখের কথা যে ভৈকম মুহম্মদ বশীরের মতো একজন অসামান্য কথা-সাহিত্যিক আজ শুধু কেরালায় বা মলয়ালম ভাষীদের মধ্যেই জনপ্রিয় নন, সর্ব-ভারতীয় কথাসাহিত্যেও সুপরিচিত। তাঁর 'বাল্যসখী', 'পাতুম্মার ছাগল' অথবা 'আমার নানার এক হাতি ছিলো'—এই উপন্যাসগুলো এর আগেই বাংলায় বেরিয়ে গেছে, কোনো-কোনো ছোটোগল্পও।

বশীরেব রচনাব সঙ্গে যাঁদেবই সামান্য পরিচয় আছে, তাঁরাই জানেন তিনি কী-রকম অসাধারণ লেখক। আমাদের মনে হয় না সর্বভারতীয় সাহিত্য থেকে অন্য-কোনো লেখকের নাম তুলে তাঁর সঙ্গে তুলনা করা চলে। বশীব এক এবং অদ্বিতীয়। হালকা, নির্ভার, নেহাৎই শাদামাটা তাঁর লেখা—আপাতদৃষ্টিতে এ-রকম মনে-হওয়াটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু 'আপাতদৃষ্টিতে' কথাটা খুবই ভেবেচিন্তে বসানো, কেননা একটু মনোযোগ দিলেই দেখা যাবে এই নিচু গলাব লঘু কথা-বার্তার আড়ালে কত গভীর-গম্ভীর বিষয় লুকিয়ে আছে। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা মোটেই একবার প'ড়ে ভুলে যাবার মতো নয়—বাবে-বাবে ফিরে-ফিরে পড়বার মতো, আর প্রতিবার নতুন ক'রে পড়বার সঙ্গে-সঙ্গে বেরিয়ে আসে নতুন-নতুন অর্থ, তাৎপর্য, প্রতিটি চেনা খুঁটিনাটিও কেমন ক'রে যে ঐশ্বর্যময় ও বহুস্তর হ'য়ে ওঠে, আমাদের অগোচরেই, সেটাই আশ্চর্য।

হ্যাঁ, আশ্চর্যই।

অথচ মুহম্মদ বশীর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁর কথা ও কাহিনীর উপকরণ সংগ্রহ করেন নিজের জীবন থেকেই। সাধারণত যে-সব লেখক নিজেদের জীবনকেই রচনার উপজীব্য ক'রে তোলেন, আমরা মনে ক'রে বসি যে সে-সব লেখা বুঝি তীব্রভাবে ব্যক্তিগত ও সংগোপন হ'য়ে উঠবে, অথচ বশীরের লেখা কিন্তু মোটেই তা নয়। আপনি তাঁর গল্পগুলো প'ড়েই জানতে পারবেন তাঁব জন্ম হয়েছিলো ১৯১০ সালে, সবকারিভাবে তেমন লেখাপড়া করেননি, কৈশোরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনে, তখন তাঁকে জেলেও যেতে হয়েছিলো, পরে জাহাজে খালাশির কাজ নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, প্রথম যখন লিখতে শুরু করেন, তখন তাঁর কাছে এমনকী সাময়িকপত্রে লেখা পাঠাবার মতো ডাকখরচও থাকতো না—ইত্যাদি-ইত্যাদি অজস্র তথ্য আপনার মোটেই

অগোচর থাকবে না, অগোচর থাকবে না তাঁর বিয়ের কথা, প্রথম মেয়ে হবার কাহিনী, তাঁর গ্রামের বাড়ির মুরগি, বেড়াল, গোরুদের কথা, প্রতিবেশী বা প্রতিবেশিনী কারা, এমনকী একবার যখন কেরালার সাহিত্য অকাদেমি আলোচনা করছিলো তাঁকে কীভাবে সম্মান জানানো যায়, তিনি কোন ছুতোয় 'একটু আসছি' ব'লে নতুন-কেনা আনকোরা ছাতাটা ফেলে রেখেই যে সে-সভা থেকে চম্পট দেন, তা-ও জানতে আপনার কোনো অসুবিধে হবে না। নিজের কথাই সাত কাহন ক'রে ফেনানো, আত্মকথারই উগ্র-কোনো রকমফের—এ-রকম কেউ, অসতর্ক মুহূর্তে, ভেবে বসতে পারেন। অথচ, আশ্চর্য, বশীর কেমন ক'রে যেন তাঁর নিজের জীবনের এই একান্ত ব্যক্তিগত ও অন্তরঙ্গ কথাবার্তাকেও কৌতুকে ও স্নিগ্ধতায় জারিয়ে নিয়ে জীবন সম্পর্কেই তাঁর গভীর ধারণাগুলোর প্রতিচ্ছবি ক'রে তোলেন, আর এই সাধারণ জীবনই হ'য়ে ওঠে কেমন মহার্ঘ, মূর্ছনাময় ও মমতামণ্ডিত। 'প্রেমলেখনম্' বা 'প্রেমপত্র' গল্পটিতে অবশ্য অত-কিছু আত্মকথা নেই। কেশবন নায়ারকে পাশের ঘরের তরুণী স্যারাম্মা বলেছিলো একটা চাকরি খুঁজে দিতে, আর কেশবন তাকে অমনি তার হৃদয়ের মধ্যে যে কর্মখালি ছিলো সেখানেই পাকা চাকরি দিয়ে দেয়—নিয়মিত বেতন ও মাঝে-মাঝে বোনাস সমেত। মনে হ'তে পারে ইয়ার্কি, বড্ড হালকা রসিকতা—কিন্তু এরই মধ্যে ওতপ্রোত জড়ানো আছে অনেক জলজ্যান্ত সমস্যা—পণপ্রথা, ধর্মভেদ, বর্ণবিরোধ, স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের জটিলতা, ও আরো নানারকম শোভিনিজম। স্নিগ্ধ কৌতুক আর হালকা চাল টেরই পেতে দেবে না যে এই-সব ভারি-ভারি বিষয় এর উপজীব্য—কিন্তু ফিরে পড়ার পর সব ঊনকথন বা আণ্ডারস্টেটমেণ্টের আড়াল থেকে এ-বিষয়গুলোর সঙ্গে আপনার মুখোমুখি না-হ'য়ে কোনো উপায় নেই। এও আপনি একটু ভেবে দেখলে অনুভব করবেন যে এই প্রসঙ্গগুলো একান্তভাবেই ভারতীয়, অন্য-কোনো দেশের কোনো লেখকই এ-রকম কোনো গল্প ফাঁদতে পারতেন না। আর, এরই মধ্যে, এও নিশ্চয়ই আপনি আবিষ্কার ক'রে বসবেন যে কত কম কথা ব'লেই বশীর কত বেশি কিছু ব'লে দিতে পারেন। এবং কত সহজে, সাবলীলভাবে।

...

এক-যে ছিলো মুরগির ছানা। তারপর সে হঠাৎ একদিন হ'য়ে গেলো এক পাপড়ি-ঝরা ফুল (কে যেন প্রমাণ করেছিলেন উদ্ভিদেরও নাকি জীবন থাকে!)। তারপর সে হ'য়ে গেলো এক রবারের বল, লাথি কষালেও লাফিয়ে-লাফিয়ে যে ফিরে-ফিরে আসে। তারপর সে কিমাকার কিম্ভূত এক মাটির পুতুল—পুরো গ'ড়ে তোলবার

আগেই কুমোর যার ওপর হাঁটু মুড়ে ব'সে প'ড়ে থেঁৎলে দুমড়ে দিয়েছিলো। তারপর সে-ই আবার হ'য়ে গেলো তেলচিটে নোংরা একটা ন্যাকড়া। কিন্তু এই অবনমনের প্রক্রিয়া শুরু হবার আগে সে অবশ্য ছিলো বাপ-মা-মরা এক বাচ্চা মেয়ে, যাকে আগলে-আগলে রাখতো তার নানী। প্রাণী থেকে জঞ্জালে রূপান্তরিত হবার এই ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই প্রাকৃতিক-কোনো প্রক্রিয়া নয়—অথবা নয় কোনো ভোজবাজি। এটা পুরোপুরি মানুষেরই বানানো, মানুষেরই সমাজের বানানো। আর, সে-কোন সমাজ—অবাস্তব, উদ্ভট, লাগামছুট খেয়ালের তৈরি—না কি আমাদেরই চেনা এক অসংগত, বিবেকহীন, নিষ্ঠুর শ্রেণীবিভক্ত জগৎ? ইস্‌মৎ চুগতাইয়ের গল্পের ছোট্ট মহল্লাটি হ'য়ে ওঠে আমাদেরই অনেকদিনকার চেনা ভারত-বর্ষের অবিকল প্রতিচ্ছবি। আর সেটা, আদপেই, ডেপুটি সাহেবদের মোটেই ভালো লাগবার কথা নয়।

উর্দু ভাষায় এ-রকম এক-আধটা নয়, অনেক ছোটোগল্প লিখেছিলেন ইসমৎ চুগতাই, কর্তাদের যেটা পছন্দ হয়নি। আর, সেইজন্যেই, কড়া আপত্তি নেমে এসেছিলো সেনসরশিপের: ইস্‌মৎ চুগতাইয়ের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার দায়ে মামলা দায়ের করা হয়েছিলো, একবার শুধু নয়, অনেকবার। অবশ্য চুগতাই একা নন, উর্দু কথাসাহিত্যের আরো কারু-কারু বিরুদ্ধে, যাঁদের একজন ছিলেন সাদত হাসান মাণ্টো। শস্তা যৌনতাময় শুড়শুড়ি নয়, সমাজের কুশ্রীতার এই নির্মম উদ্‌ঘাটনই নাকি অশ্লীল—এই ছিলো মাতব্বর ডেপুটি সাহেবদের অভিমত।

মাণ্টোর সঙ্গে চুগতাইয়ের নাম ওঠবার কারণ আছে। প্রথম আবির্ভাবেই দুজনে হুলুস্থুল তুলেছিলেন উর্দু কথাসাহিত্যে; শুধু-যে একসঙ্গেই মামলার ফেরে পড়েছিলেন, তা নয়—তাঁরা একসময়—'৩০-'৪০ এর যুগে—কাজও করেছেন বম্বাইয়ের চলচ্চিত্রশিল্পে—লিখেছেন সিনেমার জন্য গল্প। 'সিনেমার গল্প'—এই কথা শুনলেই অনেকের নাক শিঁটকে যায়, বিশেষত তা যদি হয় বোম্বে-ছবির গল্প। এই কথাটা তবু প্রথমেই ব'লে নেয়া জরুরি; এইজন্য, যে, অনেকের কোনো-কোনো বাঁধাধরা ধারণাকে ভেঙে দেবার পক্ষে এটা একটা লাগসই লক্ষ্যভেদী তথ্য। কেননা, সে-একটা আমল ছিলো বম্বাইয়ের চলচ্চিত্রশিল্পে, যখন সব শস্তা-খাস্তা ব্যাবসাদারি আজগবি মহব্বৎ-কা-খেল সত্ত্বেও বোম্বে-ছবি একসময়ে হিন্দি-উর্দুর অনেক সাহিত্যিককেই জুটিয়েছিলো। এটা সত্যি যে, এই যোগাযোগ সবসময় মোটেই সুখের হয়নি: লেখকরা নিজেরাই হয়তো নিজেদের প্রতিভার প্রতি অনেকসময় সুবিচার করেননি বা করতে পারেননি। কেউ-কেউ দু-এক দফা কাণ্ড-

কীর্তি দেখেই ইস্তফা দিয়েছেন, যেমন মুন্সি প্রেমচন্দ। কেউ-কেউ দেশভাগের পর চ'লে গিয়েছেন পাকিস্তান, যেমন সাদত হাসান মাণ্টো, গুলাম আব্বাস বা শওকৎ সিদ্দিকি। অনেকেই থেকে গেছেন তবু, জীবিকার ধান্দায়, যেমন কৃষণ চন্দর, রাজিন্দর সিং বেদি, ইস্‌মৎ চুগতাই।

ইস্‌মৎ চুগতাই-এর শিল্পিতার সুষ্ঠু ও স্মরণীয় প্রকাশ প্রধানত ছোটোগল্পে। বোম্বে-ছবির সঙ্গে যুক্ত থেকেও চুগতাই কোনো বানানো, মেকি, পলাতক জগতের কাহিনী লেখেন না; তাঁর বিষয়বস্তু বাস্তব, প্রসঙ্গ জরুরি, লেখার ভঙ্গি নিরুচ্ছ্বাস অথচ সংবেদনশীল; ভাষার সূক্ষ্ম কারুকার্য আর কলাকৌশলের নিপুণ প্রয়োগ তাঁর সেরা গল্পগুলিকে আলাদা ক'রে চিনিয়ে দেয়। উত্তর ভারতের মুসলমান সমাজের মেয়েদের অবস্থা এমন ব্যাপক ও স্পর্শাতুরভাবে ফুটিয়ে তুলতে খুব কম লেখকই পেরেছেন। সে কোনো অভিজাত খানদানি ঘরের মেয়েই হোক অথবা বস্তির গরিব-গরবাদেরই কেউ হোক, এই সমাজে মেয়েদের ওপর অবিশ্রাম যে-ধরনের নিগ্রহ ও নিপীড়ন চলে, নিজে মেয়ে ব'লেই চুগতাই বোধহয় তাকে এমন তীব্রতার সঙ্গে খুলে দেখাতে পেরেছেন। সেদিক থেকে 'জীবনের এই টুকরোগুলি' একেকটা মুখর দলিলের মতো। আর ভাষার ওপর তাঁর অসামান্য দখল তখনই পরিস্ফুট হয় যখন একটি-দুটি শব্দের অসাধারণ প্রয়োগ শুধু-যে এই মেয়েদের মানসিক জগৎকেই ফুটিয়ে তোলে, তা নয়, ফুটিয়ে তোলে প্রেক্ষাপটকেও, বাস্তব পরিবেশটিকেই। 'গুড্‌ডির নানী' গল্পের তীব্র শ্লেষ ও পরিহাসটাই এখানে, যে, জন্ম থেকেই যার নিজের কোনো পরিচয় নেই—যে কারু লেড়কি, কারু বিবি, কারু আম্মা বা কারু নানী—সবসময়েই যাকে নিছক অন্যের সঙ্গে কোনো সম্পর্কের ভিত্তিতেই মহল্লার লোকে চেনে—সে কিন্তু একাই থেকে যায় প্রথম থেকে শেষ অব্দি। আর তাকে অন্তিম মোক্ষম মারটা দেয় বাঁদরেরা, যারা নাকি মানুষেরই পূর্বপুরুষ, আর নিজে যখন সে নেমে এসেছে আধামানুষে, ঊনমানুষে। হ্যাঁ, গুড্‌ডির মতো সেও এক উলটো, অস্বাভাবিক সামাজিক প্রক্রিয়ার শিকার—শেষ-তক তাকেও মানুষ থেকে নেমে আসতে হয় নিচের কোনো স্তরে। কিন্তু জানোয়ার আসলে কে এই গল্পে? ডেপুটি সাহেব? যিনি পাশবিক অত্যাচার করেন ন-বছরের একটি মেয়েকে? সমাজ? যে এই ডেপুটি সাহেবকে মহল্লা ও মসজিদের প্রধান ব'লে স্বীকার ক'রে নেয়? ভারতের বেশ্যাপল্লিগুলোর নামও চমৎকার—সোনাগাছি, হীরামণ্ডি···এই নামগুলো কারা দিয়েছে?

সিনেমার জন্য লিখতে গিয়েই বোধহয় আরো-একটি ক্ষমতা অর্জন ক'রে নিচ্ছে

হয়েছিলো চুগতাইকে। দু-একটি খুঁটিনাটি, এক-আধটি ছোটোখাটো আঁচড়—তাতেই তিনি সজীবভাবে, স্পর্শসহভাবে, মূর্ত ক'রে তুলতে পারতেন প্রেক্ষিত—ছবির মতো চাক্ষুষ। তবে সিনেমার জন্য যাঁরা লেখেন তাঁদের তো শেষ অব্দি অপেক্ষা ক'রে থাকতে হয় যোগ্য পরিচালকের জন্য; চুগতাই-এর 'জিদ্দি' উপন্যাসের চিত্ররূপ হয়তো তেমন দাগ কাটে না, কিন্তু এম. এস. সথ্যুর হাতে প'ড়ে 'গরম হাওয়া' হ'য়ে ওঠে ভারতীয় চলচ্চিত্রের একটি অবিস্মরণীয় অঙ্গীকার। এখানে 'ঘটশ্রাদ্ধ' গল্পের পাঠকদের এ-তথ্যটি জানা উচিত যে সথ্যুর 'খরা' ('বারা'—ফিল্মোৎ-সব ৮২) ছবির কাহিনী ইউ. আর অনন্তমূর্তির।। চুগতাই দায়বদ্ধ গল্প লেখেন। প্রতিবাদের গল্প লেখেন, কলাকৈবল্যবাদের বিরুদ্ধে তার জিহাদ। মেয়েদের জীবনের নানা প্রজ্বলন্ত সমস্যা ফুটে ওঠে তাঁর লেখায়, আর সে-কোন অনন্য শিল্প-বোধ এবং জীবনবোধ সে-সব গল্পকে সমৃদ্ধ ও উদ্‌বুদ্ধ ক'রে রাখে, তা বুঝিয়ে দেয় এই 'গুড়্‌ডির নানী'ই।

...

গুজরাতি লেখক পান্নালাল প্যাটেল (জ. ১৯১২) উঠে এসেছিলেন একেবারে সাধারণ মানুষের মাঝখান থেকে। পারিবাবিক আর্থিক দুর্গতির জন্য তেমন লেখাপড়া শিখতে পারেননি, এককালে যক্ষ্মায় ভুগেছিলেন অনেক দিন, দুরবস্থা ঘোচাবার জন্য কিছু দিন সিনেমার গল্পও লিখেছিলেন। তাঁর প্রথম ছোটোগল্পের বই বেরিয়েছিলো ১৯৪০-এ, তারপর আরো-কিছু গল্পের সংকলন। কিন্তু তাঁর খ্যাতি গুর্জরদেশ ছাড়িয়ে সর্বভারতে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, যখন একের পর এক তাঁর উপন্যাসগুলো প্রকাশিত হ'তে শুরু করে। 'সোরাঠ তেরা বহেতা পাণি'র গান্ধিবাদী লেখক ঝবেরচান্দ মেঘানী তাঁর সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে পান্নালাল-কেই যে শিরোপা দিয়েছিলেন তার প্রধান কারণ এটাই যে পান্নালাল সাধারণ মানুষের কথা সাধারণ মানুষের ভাষাতেই সহজ শিল্পিতার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। ঝবেরচান্দের মতোই, সংস্কৃতবহুল তৎসম শব্দের বদলে, শাদামাটা দেশী গ্রাম্য শব্দ নিপুণভাবে ব্যবহার করেছেন পান্নালাল। লোকসাহিত্যের ভাষা, সাধারণ অশিক্ষিত মানুষজনের মুখের কথা, কখনো-কখনো এমনকী আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করেছেন পান্নালাল; সেদিক থেকে হয়তো তথাকথিত সরকারি শিক্ষার অভাব সুফলই ফলিয়েছিলো—অথবা বলতেই হয় মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধির গুজরাতি রচনার ভাষাই নিশ্চয়ই তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলো সাধারণ মানুষের মুখের কথার জোর কোথায়। আর, সেই জন্যেই, সাধারণে চিনে নিতে পেরেছিলো তাদের প্রিয়

লেখককে, যিনি তাদেরই মনের কথা, প্রাণের কথা বলেন, কোনো কৃত্রিম, তৈরি-করা, অলীক জগতের কাহিনী শোনান না।

বাঙালি পাঠকের কাছে মোটেই কিন্তু সম্পূর্ণ অপরিচিত নন পান্নালাল। তাঁর 'মানবেনী ভবাই' ('এই জীবনের রঙ্গমঞ্চে') আর 'মলেলা জীব' ('জীবী') উপন্যাস দুটি বাংলায় তর্জমা হয়েছে—যদিও শেষোক্তটি সরকারি পোষকতায় তর্জমা হ'লেও কোনো আজব বা বিস্ময়কর কারণে কাট-ছাঁট ক'রে ছাপা হয়েছে। 'মানবেনী ভবাই'-এর পরবর্তী দুটি খণ্ড 'ভাংস্যান'। মেরু' ও 'ধর্মর বলেনু' অবশ্য এখনও অনুবাদ হয়নি। তাঁর আরেকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'বল্লালমনাং'ও অ্যাদ্দিনে বাংলায় বেরুনো উচিত ছিলো।

ভিন্ন-ভিন্ন গোষ্ঠীর অনেক মানুষ, দীর্ঘ বহমান সময় ও সুপরিসর পটভূমি—পান্নালালের প্রতিভা একদিক থেকে হয়তো তাতেই ভালো খেলে। প্রকৃতি ও মানুষের গড়া দুর্যোগের মধ্যেও কী ভাবে সাধারণ সরল মানুষ বেঁচে থাকে, কেমন তাদের আচার-ব্যবহার, সংস্কার-কুসংস্কার, পালাপার্বণ, নৃত্যগীত, সমস্যা-সংঘাত—সব নিরাভরণ সরল গদ্যে চাক্ষুষ ক'রে তুলতে পারেন পান্নালাল। নিরাভরণ ও সরল—কিন্তু তাই ব'লে গভীরতাও কম নেই : উপরিতলের ঐ সরলতার আড়ালেই লুকিয়ে থাকে ব্যক্ত ও অব্যক্ত অনুভূতির টানাপোড়েন, অন্বিত-কোনো তাৎপর্য। বড়ো প্রত্যক্ষ, বড়ো ইন্দ্রিয়ময়, বড়ো মুখোমুখি ভাষায় বলা তাঁর রচনা—যেন হাতে ছোঁয়া যায়, ধরা যায়, এমন স্পর্শসহ। খুঁটিনাটি সম্বন্ধে তাঁর সজাগ দৃষ্টি তাঁর রচনাকে প্রায় দলিল ক'রে তোলে—কিন্তু এ নিছক নৃতাত্ত্বিক দলিল নয়, কেননা কোনো অনুপুঙ্খই এখানে অপ্রাসঙ্গিক নয়, কোনো তথ্য বা অনুভূতিই এখানে তালিকা তৈরি করার জন্য উপস্থাপিত নয়। বর্ণনা ও বিবরণ ও আখ্যান তাঁর রচনায় এমন ওতপ্রোত মিশে থাকে যা সম্ভব বোধকরি এপিকে, আর এটাই তো অনেকের মত যে উপন্যাসই এ-যুগের এপিক—অন্তত তার বংশধর তো বটেই।

অথচ ছোটোগল্পেও যে পান্নালাল অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, তার প্রমাণ তো এই গল্পেই : 'জায়গিরদার আর তার কুকুর'। লক্ষ করার বিষয়, এই ছোট্ট গল্পটিতে গ্রামের নাম নেই, লোকজন কারু নাম নেই (এক জাদু মিঞা ছাড়া), শুধু একটি বিলিতি কুকুরের নাম আছে, 'সিলভার' ওরফে সিলুভাই। কিছু-কিছু শব্দ আছে অবশ্য—ভালাতি (কর্তা-ব্যক্তিদের সম্ভ্রমসূচক অভিধা), মুখী (গাঁয়ের মোড়ল), ভাঙ্গি (গাঁয়ের ধাঙড়) এবং বাপু—যা চিনিয়ে দেয় গল্পের পট-ভূমি। জায়গিরদারের ভয়ে কাঁটা হ'য়ে আছে সরল, অশিক্ষিত, নিরীহ-কিছু মানুষ,

যে-গোবেচারারা সারাক্ষণই গালাগাল শোনে : আকাট, হাঁদা, গাধা। তারপর একসময়, নিমেষের মধ্যে, হাসিঠাট্টা, ফুর্তি-উত্তেজনা, উৎসাহ-কৌতূহল নিভে গিয়ে সব কেমন গম্ভীর, নিরানন্দ, ও মোহ্যমান হ'য়ে ওঠে। গাঁয়ে প'ড়ে থাকে শ্মশানের স্তব্ধতা, ছেঁড়াখোঁড়া কিছু নেড়ি কুকুরের রক্তাক্ত শরীর, আর স্তব্ধতাকে আরো-বিকট আরো-থমথমে ক'রে-তোলা মরতে-থাকা কুকুরগুলোর কাৎরানি আর গোঙানি ; আর ঠিক তখনই উদাসীন ও নিরাসক্তভাবে হুঁকো টানতে-টানতে অকুস্থলে মুদ্দোফরাশের প্রবেশ। আর এই অনুপুঙ্ক্ষটি মুহূর্তে গল্পটিকে অসাধারণ ইঙ্গিতময় ও সংকেতধর্মী ক'রে তোলে।

চটকদার ঘটনার ঘনঘটা ও আড়ম্বর, চরিত্রের চাকচিক্য ও রংবাহার, পরিস্থিতির রুদ্ধশ্বাস ও রোমহর্ষক চমৎকারিত্ব, অভিনব-কোনো প্রসঙ্গের অপ্রত্যাশিত অবতারণা, প্রকরণের কারদানি ও বাহাদুরি—এমনি কতকিছুতেই শামাল দেয়া যায় কোনো গল্পে। কিন্তু যে-গল্পে কোনো কাহিনীই নেই বলতে গেলে, নেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার মতো উগ্র-কোনো আহামরি-কোনো ভোজবাজি বা হাতসাফাই, নেই জমকালো কোনো চমক বা আচমকা ঘাড়ে লাফিয়ে-পড়া আসুরিক কোনো চালাকি, সে-গল্পও যে তার চাপা হাসির আড়াল থেকে কত গূঢ়-জরুরি অভিঘাত হানতে পারে, পান্নালাল প্যাটেলের এই গল্পই তার প্রমাণ। এর সত্যতা এর বাস্তবনিষ্ঠাতেই : প্রায় কোনো গল্পই নয়, এমন-এই গল্প তার সব উনকথন সত্ত্বেও দাঁড়িয়ে থাকে তার বাস্তবতায়—যার শেষটায় ভাঙ্গির প্রবেশ ও উদাসীন অপেক্ষা যেন অমোঘ ও অনিবার্য, অনতিদূর, কালেরই ইঙ্গিত।

...

কৃষণ চন্দরের সঙ্গে বাংলাদেশ ও বাংলা সংস্কৃতির যোগাযোগ অনেক দিনের। তেরোশো পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিকার সেই কবে চল্লিশের যুগেই কৃষণ চন্দর লিখেছিলেন 'অন্নদাতা'। তাঁর ছোটোগল্প বর্ণনা করেছিলো স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেকার সেই আন্দোলন যখন স্বাধীন দেশের পুলিশ কলকাতার মেয়েদের মিছিলে গুলি চালিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দাবিয়ে দিয়েছিলো। তাঁর 'যব খেত জাগে' নামে তেলেঙ্গানার পটভূমিকায় রচিত কৃষক আন্দোলনের কাহিনীটিকে নিয়ে গৌতম ঘোষ ছবি তুলেছেন 'মা ভূম'—তেলুগু ভাষায়। তাঁর অনেক গল্প-উপন্যাস বাংলায় অনূদিত হয়েছে। দেশভাগের পটভূমিকায় রচিত তাঁর 'গদ্দর' ('বিশ্বাস-ঘাতক') উপন্যাসের সমাদর এটাই বুঝিয়ে দেয় বাঙালি পাঠক কৃষণ চন্দরকে কতটা আপন ব'লে ভাবে।

লেখাই ছিলো কৃষণ চন্দরের জীবিকা। দীর্ঘকাল তিনি বম্বাইতে হিন্দি ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, পেশাদার লেখক ব'লেই তাঁকে বিস্তর লিখতে হয়েছে—এমনকী অনেক সময়ে ফরমায়েশি লেখাও তৈরি ক'রে দিতে হয়েছে। তাঁর রচনার নৈপুণ্য, সহজ স্বচ্ছন্দ গতি, চিন্তার স্বচ্ছতা ও ক্ষিপ্রতা, বিষয়মাহাত্ম্য হয়তো অনেক ফরমায়েশি লেখাতেও আবিষ্কার করা সম্ভব—কিন্তু শুধুমাত্র সেই লেখাগুলো নিয়ে তাঁকে বিচার করা সমীচীন হবে না। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা আদর্শবাদী, মানবতাবাদী ; কিন্তু সেই আদর্শ বা মানবিকতার বোধ বাইরে থেকে চাপানো কোনো পোশাকি ঘেরাটোপ নয়—তাঁর ব্যক্তিত্ব ও আবেগ থেকে সঞ্জাত, এবং তাঁর আবেগের তীব্র সততাকে শ্রদ্ধা না-ক'রে আমাদের উপায় থাকে না। আবেগ মানে নিছক সেন্টিমেন্ট বা উচ্ছ্বাসের তাড়না নয়, আবেগ মানে ইমোশন, এবং তার সঙ্গে মেশানো আছে বোধি এবং মেধা। তাঁর 'গদ্দর' উপন্যাস রচিত হয়েছিলো দেশভাগ হবার পটভূমিকায় : জলন্ত বাস্তব ও মর্মান্তিক দুঃস্বপ্নের সেই দিনগুলি এখনও অনেকেরই স্মৃতিতে অত্যন্ত প্রখরভাবে উপস্থিত—নিছক অতীত ইতিহাসের তথ্যমাত্রই হ'য়ে নেই। 'গদ্দর'-এর ঘটনাগুলো সবই ঘটেছিলো, একটাও বানানো নয় ; অতি-সাধারণ ব্যক্তিমানুষ আর ভিড়ের প্রমত্ত জমায়েৎ—এই দুই যে একই মানুষকে দু-রকমভাবে হাজির ক'রে দিতে পারে, এটাও কোনো অভাবিত ব্যাপার নয়। অথচ 'গদ্দর' উপন্যাস বাস্তবকে তীব্রভাবে উপস্থাপিত ক'রেও তাকে অতিক্রম ক'রে যায় সৎ আবেগের তীব্রতায়—হ'য়ে ওঠে রূপক, ব্যঞ্জনাময়, অনুরণনধর্মী, আদর্শের অভিঘাতে অতিক্রম ক'রে যায় দুঃসহ বাস্তবের ছোট্ট দমবন্ধ গণ্ডিটাকে। আর এইজন্যেই বোধকরি মুল্‌ক রাজ আনন্দ একসময়ে বলেছিলেন, কৃষণ চন্দরের রচনাকে মহিমা দিয়েছে তাঁর 'কবিত্ব-ময় বাস্তবতা'। কবিতা যে বাস্তবের বিরোধী নয়, বরং বর্ণনার তুঙ্গ মুহূর্তে কবিতার পরাক্রমই যে রচনাকে উত্তরণের পথে নিয়ে যায়, অন্তত কৃষণ চন্দরের শ্রেষ্ঠ রচনায় যে বারে-বারে তা-ই ঘটে, এটা মুল্‌ক রাজ আনন্দ ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন।

('গদ্দরের' কথা যে উঠলো, তার একটা কারণ আছে। 'পেশোয়ার এক্সপ্রেস' গল্পটিও এই দেশভাগের পটভূমিকাতেই রচিত : খুশবন্ত সিং-এর 'এ ট্রেন টু পাকিস্তান' আর কৃষণ চন্দরের 'পেশোয়ার এক্সপ্রেস' পাশাপাশি রাখলেই বোঝা যাবে সবাই লেখক হয় না, কেউ-কেউ লেখক। এমনকী বিষয়ের জরুরি প্রাসঙ্গিকতাও যে সবসময় লেখাকে উৎরে দেয় না, খুশবন্ত সিং এর লেখাই তার প্রমাণ।) 'পেশোয়ার এক্সপ্রেসের' রক্তাক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে ভাষা কখনো-কখনো কবিতার

মতো হ'য়ে উঠছে—কবিতা, কাব্যিকতা নয়, যখন এই ট্রেনটির মনে প'ড়ে গেছে পঞ্জাবের লোকগাথা, হীর ও রনৃঝা, সোনি ও মাহিওয়াল, মনে প'ডে গেছে পঞ্জাবের ইতিহাস, জীবনযাপনের রীতিপ্রকৃতি, সোনালি গমের মাঠে চাষীর জন্য লস্যি আর চাপাটি নিয়ে-আসা চাষী বৌ, পঞ্চনদীর অবাধ স্বচ্ছন্দ গতিময়তা। কোনো বিমূর্ত ভাবনার বাইরের চিহ্ন হিশেবে নয়, ক্ষোভ, ক্রোধ, মমতায় মাখামাখি এক স্পর্শসহ সজীব স্পন্দন হিশেবে। তার ফলে গল্পের বাস্তব আয়তন কখনও ভেঙে না-গেলেও অন্য-একটি আয়তন রচিত হ'য়ে যায়, বোঝা যায় শ্রেষ্ঠ কৃষণ চন্দর সত্যি কেবল উর্দু সাহিত্যেরই অসাধারণ সম্পদ নন—সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যেরও গর্ব। 'অথচ রোপণ ক'রে শস্য কেউ পায় ঘূর্ণিবায়ু' কবি বলেছিলেন, স্বাধীনতা বপন ক'রে কোন্ ঘূর্ণিবায়ু ফলিয়েছে এ-দেশ, 'পেশোয়াব এক্সপ্রেস' ধরা গলায় তীব্র স্বরে সেই প্রশ্নই উপস্থাপিত করে। পঞ্জাবের এই লেখক তাঁব রচনাবলির পট-ভূমিকা হিশেবে বেছে নিয়েছেন সারা ভারতকেই—কখনও কাশ্মীবের ভূস্বর্গ, অথবা সিমলার তুষারাবৃত ভূদৃশ্য, কখনও-বা দক্ষিণাবর্তের অন্ধ্রপ্রদেশ, কখনও পূর্বদিকে বঙ্গভূমি, আবার কখনও-বা তাঁর রচনায় ফুটে উঠেছে লাহোর বা বম্বাইয়ের শহুরে জীবন ও অন্ধগলি।

...

সতীনাথ ভাদুড়ির সঙ্গে ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিলো ফণীশ্বরনাথ 'রেণু'র—এই তথ্যটি নেহাৎই অবান্তর নয়। 'ঢোঁড়াই চরিতমানস' তো এই প্রশ্নটাই করেছিলো, কেমন হবে ভারতীয় কথাসাহিত্যের আখ্যানরীতি—কোন প্রকরণ, কোন বিষয়বস্তু অভেদ মিলে গিয়ে তৈরি হবে ভারতের জনজীবনের বাস্তবতা। সেই মানুষদের কেমন ক'রে ফুটিয়ে তুলবে কেউ, যাদের মুখ 'মূঢ, ম্লান, মূক'—সে-কোন ভাষা দিতে হবে তাদের মুখে?

ফণীশ্বরনাথ 'রেণু'র 'ময়লা আঁচল' আর 'ধরতী' বেরুবার পরে মস্ত বিতর্কের ঝড় ব'য়ে গিয়েছিলো হিন্দি সাহিত্যজগতে। কেউ বলেছিলেন, প্রেমচন্দ-এর 'গোদান'-এর পরই 'রেণু'র 'ময়লা আঁচল' আর যশপালের 'ঝুটা-সচ,' আর অন্য-এক দল বলেছিলো, এ কেমন বই—এর তো ভাষাই বোঝা যায় না, বড্ড বেশি, 'আঞ্চলিক', 'গেঁয়ো' বুলির ছড়াছড়ি। যেন গ্রামের মানুষ কথা বলবে শহরের পরিশীলিত অতিমার্জিত নীরক্ত কোনো ভাষায়, যেন আশপাশের কয়েকটা গ্রাম-শহরের চৌহদ্দি ছেড়ে কোনোদিনই বেরোয়নি যে গোরুর গাড়ির গাড়োয়ান, সে কথা বলবে অন্য অঞ্চলের লোকজনের গলায়। হীরামন গাড়োয়ান যখন মহুয়া

ঘাটওয়ারির গান ধরেছিলো, তার নিজের ভাষায়, অথবা শুনিয়েছিলো নামলগড়ের রাজবাড়ির কাহিনী, তখন তার অবাক লেগেছিলো এই ভেবে যে নৌটঙ্কী কম্পানির হীরাবাঈ সে-গান সে-গল্প বুঝবে কী ক'রে ?

> হীরাবাঈ বলে—'কেন মিতে, তোমার নিজের ভাষায় কোনো গান নেই ?' হীরামন এখন নির্ভয়ে হীরাবাঈয়ের চোখে চোখ রেখে কথা বলছে, কম্পানির মেয়েও এমন হয় ! সার্কাসের মালকিন ছিলো মেম। কিন্তু হীরাবাঈ ? গ্রাম্য বুলিতে গান শুনতে চাইছে। প্রাণ খুলে হাসে সে—'আপনি গাঁয়েব বুলি বুঝবেন ?'

'রেণু'র ভাষা নিয়ে যে-তুলকালাম তর্ক বেধেছিলো হিন্দি সাহিত্যজগতে, তার পরিপ্রেক্ষিতে এই ছোট্ট কথাগুলো গভীর অর্থদ্যোতক হ'য়ে ওঠে। কেবল সাময়িক, তাৎক্ষণিক, কোনো তর্ক অবশ্য নয়—আরো-গভীর কোনো অর্থের বিচ্ছুরণ ঘটে কথাগুলোর। সত্যি-বলতে, সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের রূপ কী হবে, সেই সম্বন্ধেই যেন গভীর কতগুলো শর্তসাবুদ তৈরি ক'রে দেয়া আছে। যে-দেশে স্বাধীনতার প্রায় চল্লিশ বছর পরেও শতকরা সত্তরজন লোক নিরক্ষর, যে-দেশে গুটিকয় শহরকে জীইয়ে রাখতে গিয়ে গ্রামের পর গ্রাম জেরবার, যে-দেশে শহরে গাদাগাদি ঠাশাঠাশি ভিড় সত্ত্বেও বেশির ভাগ লোকই থাকে গ্রামে, কেমন হবে সে-দেশের সাহিত্যের চেহারা, কতটাই বা তার লিখিত, আর কতটা কথ্য, মৌখিক ? 'রেণু'র এই 'তিসরি কসম' গল্পে—লিখিত গল্পে—যেমন মিশে যায় লোককথা, কিংবদন্তি, গাথা, 'রামচরিত মানস'-এর জগৎ, সাধারণ লোকজন, আর তাদের স্ফুট-অস্ফুট রীতিনীতি আচার-ব্যবহাব বোধবিশ্বাস, তাতে 'রেণু'র রচনাদক্ষতাই যে চোখে পড়ে তা নয়, সাহিত্য সম্বন্ধে 'রেণু'র বিশ্বাসটাও প্রাঞ্জল হয়। যে-রকম অনায়াসে, সহজে, প্রায় চেষ্টাহীনভাবে, হীরামন গাড়োয়ানের জগৎ খুলে যায় আমাদের কাছে, যেভাবে হীরামন কথা বলে অনবরত তার গোরু দুটোর সঙ্গে, আর গোরু দুটো তার কথা শুনে কান হেলায়, তাতে 'রেণু'র রচনার গূঢ় ব্যঞ্জনাময় শৈলীই অফুরান-ভাবে চোখে পড়ে। গূঢ়—কেননা কোথাও উগ্রভাবে জাহির করা নেই, বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয়া নেই। উনকথন যে কতটা জরুরি ছিলো, তা বোঝা যায় হীরামনের স্ফুট-অস্ফুট চিন্তার জট খুলতে-খুলতে। অথচ শহুরে জগৎটাও আছে কোথাও, একটা ফ্রেম হ'য়ে ; সেখানে চোরাকারবার হয়, দারোগা ঘুষ নেয়, এক নৌটঙ্কী কম্পানি থেকে অভিনেত্রী ভাগিয়ে আনে আরেক কম্পানি, কিন্তু হীরামনের জগৎ থেকে সে কতদূর ! একটা ভারতবর্ষের মধ্যেই আরেকটা ভারতবর্ষ : সেই

ভারতবর্ষে গুলবদন হ'য়ে যায় সুকুমারী সীতা, সব গল্পই রাম সীতা লক্ষ্মণলালের— যেমন ভেবেছিলো পলটদাস।

'তিসরি কসম' সচেতন রচনা, অতি-সচেতন। সব খুঁটিনাটি, সব অনুপুঙ্খ, সব বলা কথা না-বলা কথা, সব গাথা-কিংবদন্তি-গল্প নিক্তিমাপা, যথাযথ, কোনো শব্দের হেরফের ঘটানো চলে না। আর সেই জন্যেই এ হ'য়ে ওঠে ভারতীয় গল্প সম্বন্ধে একটা সন্দর্ভই যেন· 'আপনি গাঁয়ের বুলি বুঝবেন?' হীরামনের এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা যদি সম্মতি জানিয়ে ঘাড় হেলাতে না-পারি, তাহ'লে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড়ো অংশই থেকে যাবে আমাদের অচেনা, অতীব সুদূর, আর সর্বপ্রকার যোগাযোগহীন।

...

গোপীনাথ মোহান্তি জন্মেছিলেন কটক থেকে সাত মাইল দূরে, ছোট্ট একটি গ্রাম নাগবলিতে, ১৯১৪ সালে। ইংরেজিতে এম-এ পাশ ক'রে সিভিল সার্ভিসে যোগ দিয়েছিলেন গোপীনাথ—আর বদলির চাকরি তাই কর্মসূত্রেই ঘুরে/চ'ষে বেড়িয়েছেন উড়িষ্যার এ-প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। এ-কথাটা মনে রাখা জরুরি। কেননা তাঁর 'অমৃতের সন্তান' (অকাদেমি পুরস্কার) বা 'মাটি মাতল' (জ্ঞানপীঠ পুরস্কার) যাঁরাই পড়েছেন, তাঁরাই অনুভব করবেন গোপীনাথ মোহান্তির অভিজ্ঞতার পরিধি কী সুবিপুল। উড়িষ্যার সাধারণ মানুষ, বিভিন্ন উপজাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়, তাদের জীবনচর্যা, আচারব্যবহার, সংস্কার-কুসংস্কার—সব যেন প্রায় অনুসন্ধানী নৃতাত্ত্বিকের ভঙ্গিতে তিনি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে লিখেছেন—অথচ তা সেইসঙ্গে হ'য়ে উঠেছে শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যের নিদর্শন—নিছক নৃতাত্ত্বিক বিবরণ নয়। ওড়িয়া ভাষায় জটিল বাগ্‌ভঙ্গিমার সঙ্গে মিশেছে সহজ সরল কথ্য ছন্দ আর গড়ন, আর শব্দের ঝংকার থেকেই মূর্ত হ'য়ে উঠেছে উড়িষ্যার বিস্তৃত ভূভাগের দৃশ্যপট, সমতল ও পার্বত্য ভূমি, নদী, ও তার সমুদ্রসৈকত—আর তার ইতিহাস। আর তাঁর প্রধান উপন্যাস দুটি প্রায় যেন মহাকাব্যের আয়তন পেয়ে যায় অজস্র চরিত্র, কাহিনীর জটিল বয়ন, ঋতুচক্রের আবর্তন, দিনরাত্রির লীলা, মানুষজনের দুঃখসুখের চক্রচলন, অস্তিত্বের বিপন্নতার মধ্যেও জীবনের উচ্ছল স্পন্দন—সব মিলিয়ে গোপীনাথ মোহান্তির এই দুটি উপন্যাস যে-কোনো সাহিত্যেরই সম্পদ ব'লে গণ্য হবে।

কিন্তু তাঁর ছোটোগল্পও মনে রাখা জরুরি। 'পিঁপড়ে' গল্পটিই প্রমাণ, ক্ষুদ্র পরিসরেও গোপীনাথ কী-রকম অনায়াস নৈপুণ্যে সৃষ্টি করতে পারেন তাঁর গল্পের জগৎ—সজীব ও বলিষ্ঠ। তরুণ উচ্চাভিলাষী অফিসার, কর্মনৈপুণ্য দেখিয়ে যার

উন্নতির উচ্চাকাঙ্ক্ষা, তার প্রৌঢ় সহকারী, সঙ্গী আদিবাসীর দল, তাদের সঙ্গে তার ভাষার ব্যবধান, পার্বত্য রাস্তা, দূরে-দূরে গরিব বসতি, জটিল জঙ্গলের পাশেই রুক্ষ, ঊষর, দরিদ্রভূমি, উড়িষ্যা ও অন্ধ্রের সীমান্ত, আবার ভাষার ব্যবধান, বাজারগঞ্জের ভিড়, বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে প্রায়-অবোধ মা, ঘায়ে প'চে ম'রে যাচ্ছে কোন-এক অথর্ব বৃদ্ধ, 'দুপুরবেলায়, বাবু, তোর মা তোকে না-খেতে দিয়ে যেতে দিতো ?', সারি-সারি কঙ্কালসার চালপাচারকারী — এককিলো আধকিলোর বেশি যাদের চাল নেই, আর ক্ষুধা, আর বুভুক্ষা, আর গায়ের ঘা — মনের মধ্যকার অবিশ্রাম আলোড়ন আর ঘূর্ণি, আর বাইরের বাস্তবের শারীরিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপস্থিতি — সব মিলিয়ে রুদ্ধশ্বাসে গোপীনাথ তৈরি ক'রে দেন পিঁপড়েদের এই জগৎ — এক ডেলা চিনি কাঁধে ক'রে কত পিঁপড়ের সার। আর এই অন্তহীন পিঁপড়ের সারের নিরন্তর মিছিল ভেঙে দেয় প্রদেশের সীমা — কখন উড়িষ্যা মিলিয়ে গিয়ে চোখে পড়ে অন্ধ্রের মাটি — কখন ভেঙে যায় প্রাদেশিকতার শোভিনিজম, ভাষার ও ইতিহাসের অর্থহীন অহমিকা, আর তরুণ রমেশের এই রুদ্ধশ্বাস পশ্চাদ্ধাবন হ'য়ে ওঠে এই জিজ্ঞাসারই নামান্তর—কোনটা তার দেশ, তার শিক্ষাদীক্ষা, তার কর্ম ও ক্ষমতা, তার নথি, সেরেস্তা, বিচার — না কি এই পিঁপড়ের সারি, যে-সারির মধ্যে হয়তো সেও আছে কোনোখানে, প্রমোশনের চিনির ডেলার লোভে, উন্নতির চিনির ডেলা কাঁধে ? ওড়িয়া ভাষায় প্রথম উপন্যাসেই ফকিরমোহন সেনাপতি উপস্থাপিত করেছিলেন জীবন্ত, বাস্তব, সমকালীন জগৎ — অতীতের ধূসর কাল্পনিক বিলাসলীলা নয়। ভগবতীচরণ পাণিগ্রাহী আর গোপীনাথ মোহান্তির গল্প দুটি, এই সংকলনে, তাই সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতিই হয়তো জানায় ওড়িয়া কথাসাহিত্যের সেই আদিপুরুষকে।

...

কন্নড় ভাষা নির্ভর সাম্প্রতিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনটির পুরোভাগে যাঁরা, তাঁদের মধ্যে ইউ. আর. অনন্তমূর্তি অন্যতম। আর এই সংস্কৃতিচর্চার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য দেশের মাটি, তার মানুষজন, তার আচার-ব্যবহার, প্রথা-সংস্কারের দিকে ফিরে তাকানো, ঠিক যে-কাজ করেছিলো শিবরাম কারন্থ-এর 'মাটির টানে' উপন্যাসে রাম ঐতাল — কাহিনীতে যে তৃতীয় প্রজন্মের প্রতিনিধি। কিন্তু তাতে অতীতের জন্য কোনো বিগলিত হা-হুতাশ নেই, নেই কোনো ছেঁদো ছটফটে পিছুটান, বরং আছে প্রখর মানবিকতার কোনো বোধ, আছে প্রশ্নের পর প্রশ্নের বঙ্কিম কটাক্ষ, আর আঘাত-প্রত্যাঘাতের উজ্জীবক দীপ্তি। কারন্থ যে-কাজ শুরু করেছিলেন, সেই পথেই এগিয়ে এসেছেন কনিষ্ঠ সংস্কৃতিকর্মীরা : শিল্পচর্যার নানাদিকে তাই·

তাই এখন আমরা পর-পর নাম ক'রে যেতে পারি বি. ভি. কারন্থ, নিরঞ্জন, এম. এস. সথ্যু, প্রসন্ন, গিরিশ কারনাড়, অনন্ত নাগ ও আরো অনেকের।

অনন্তমূর্তির জন্ম ১৯৩২, কর্ণাটকের তীর্থতল্লি শহরে। মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় শুধু তাঁর শিক্ষার স্থলই নয়, বর্তমান কর্মক্ষেত্রও: তাঁর জীবিকা ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনা। একসময়ে উচ্চতর শিক্ষার জন্য বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়েও কিছুকাল কাটাতে হয়েছিলো অনন্তমুর্তিকে। তবু, সবচেয়ে যা মনে রাখা জরুরি, অনন্তমূর্তির যাবতীয় সৃষ্টিশীল রচনাই—না, ইংরেজিতে নয়—কন্নড় ভাষায়। তামিলনাড়ুর আর. কে. নারায়ণ প্রায় সারা জীবন মহীশূরে কাটানো সত্ত্বেও, না লিখেছেন তামিল ভাষায়, না কন্নড়ে। বরং তাঁর মালগুডি কাহিনীমালা বিদেশীদের ইচ্ছের কাছে নিজের প্রতিভাকে বিকিয়ে দেবার কাহিনী। সেক্ষেত্রে অনন্তমূর্তি ও তাঁর সংস্কৃতি-সুহৃদদের মাতৃভাষার প্রতি এই প্রগাঢ় অনুরাগ সাম্প্রতিক প্রজন্মের মূল অভিলাষ ও অঙ্গীকারের দিকেই আমাদের অভিনিবেশ দাবি করে। অনন্তমূর্তির আন্তর্জাতিক খ্যাতি প্রধানত 'ভারতীপুর', 'সংস্কার', 'অবস্থা'—এই তিনটি উপন্যাসকে জড়িয়ে। কিন্তু তাঁর কবিতা ও ছোটোগল্পের—বিশেষত তাঁর ছোটো-গল্পের—দাবিও কোনো অংশে কম নয়, বরং কোনো-কোনো দিক থেকে আরো বেশি। কলাকৈবল্যবাদে অনন্তমূর্তির বিশ্বাস নেই: পশ্চিমী দেশগুলোয় 'সংস্কার' উপন্যাস (ও তার চলচ্চিত্ররূপ) হুলুস্থূল তোলা সত্ত্বেও তাঁর মাথা ঘুরে যায়নি। কোনো লেখক যে শেষ অব্দি দাঁড়ান নিজের দেশের জমিতে, নিজের দেশের মানুষ-জনের সুখদুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা সাফল্য-বেদনার মধ্যেই যে তাঁকে খুঁজে নিতে হয় নিজের পরিচয়, আপন স্বরূপ, উপন্যাস তিনটির পাঠক সেটা অনায়াসেই অনুভব করবেন। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো তাঁর অঙ্গীকার: কোনো লেখককে এরই মধ্যে সন্ধান করতে হয় মুক্তির উপায়, শুধু তাঁর একার নয় (যেটা কেউ-কেউ খোঁজেন নিছক কলাকৌশলে, প্রকরণের হাতসাফাইয়ে, আঙ্গিকের ভোজবাজিতে), সমগ্র গোষ্ঠীর (যেটা অনন্তমূর্তি খোঁজেন তাঁর কাহিনীর প্রাসঙ্গিকতায়)। লক্ষ করার বিষয়, মহীশূর বা বাঙালুরে ধনিকশ্রেণী পাশ্চাত্ত্য পণ্যভোগবাদী সমাজের ধ্যান-ধারণার কাছে পুরোপুরি বিকিয়ে গেলেও, অনন্তমূর্তি পৌঁছুতে চান সাধারণ মানুষ-দের মধ্যে, দেশের শিকড়ে। তাঁর গল্পে-উপন্যাসে তাই গ্রামীণ কৃষিনির্ভর সমাজের বহুস্তর, প্রশ্নসঙ্কুল, তীব্রসন্ধানী এক আলেখ্য ফুটে ওঠে। 'ঘটশ্রাদ্ধ' গল্পে—পাঠক লক্ষ করবেন—অনন্তমূর্তি আদৌ কোনো শহুরে, শৌখিন, সালংকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাহিনী শোনাননি, বরং আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে চেয়েছেন ভারতীয় হিন্দু সমাজের

অমানুষিক রক্ষণশীলতা, ভণ্ডামি ও কুসংস্কারের দিকে, যেখানে প্রধান বলি হয় মেয়েরা, আর অচ্ছুৎ কাত্তিরার উল্লেখের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে জাত-পাঁতের দ্বন্দ্ব। অথচ আখ্যানরীতির সুনিপুণ বিন্যাস ও সূক্ষ্মসজীব শিল্পিতা গল্পটিকে রক্ষা করেছে নিছক দরদের উচ্ছ্বাসভারাতুর চোরাবালি থেকে। এর বালক দ্রষ্টার অস্ফুট, উন্মীলমান বোধের মধ্য দিয়েই ফুটে ওঠে লেখকের প্রতিবাদ। স্নেহলতার আশ্চর্য অভিনয়ে সমৃদ্ধ 'ঘটশ্রাদ্ধ' কেন-যে সারা দেশের নিঃসাড় চৈতন্যে প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছিলো, সে-ছবির এই মূল কাহিনী সেটা আরো স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে দেয়।

একটি তথ্য তবু উল্লেখ করা উচিত। 'ঘটশ্রাদ্ধ' একাধিকবার ইংরেজি তর্জমা হয়েছে এবং এর একাধিক তর্জমার সঙ্গেই স্বয়ং অনন্তমূর্তি যুক্ত ছিলেন—একটিতে তিনি সহযোগী অনুবাদক, এবং অন্যটি তিনি স্বয়ং একাই অনুবাদ করেছেন। ইংরেজিতে গল্পটির যা নাম দেয়া হয়েছে, তার আক্ষরিক বাংলা হবে 'দীক্ষা'। বলাই বাহুল্য, এই নামকরণে জোর দেয়া হয়েছে গল্পের বক্তা অর্থাৎ ছোট্ট ছেলেটির ওপর—যার জবানিতে আমরা কাহিনীটি শুনছি। এই দুই অনুবাদেই বাদ দেয়া হয়েছে গল্পের শেষ টুকরোটি—অর্থাৎ ইংরেজি পাঠ অনুযায়ী গল্প শেষ হয়েছিলো এইভাবে :

> ততক্ষণে ওরা আমাদের চারপাশে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছে। আমি যমুনাকে শক্ত ক'রে আঁকড়ে ধরলাম। আমার পিঠ বেয়ে ওর হাত চ'লে গেলো। শাস্ত্রী আমাকে টেনে নিলো। 'যমুনা, যমুনা,' আমি ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে-করতে চেঁচিয়ে উঠলাম। কিন্তু যমুনার চোখ তখন ওপর দিকে, বহুদূরে।

বড়োদের দুঃসহ, দমবন্ধ, ভণ্ড জগতে কেমন ক'রে ননী প্রবেশ করেছিলো—অর্থাৎ ছোট্ট ছেলে ননীর দীক্ষিত হবার প্রসঙ্গটিই—ইংরেজি পাঠে প্রাধান্য পেয়েছে। আমাদের কাছে অবশ্য মূল কন্নড় পাঠটিই আরো তীক্ষ্ণ ও মর্মভেদী মনে হয়েছে, যেখানে আরো-স্পষ্ট ফুটে উঠেছে এই সমাজে নারী ও পুরুষের মূল্য কত ভিন্ন—আর এই ভিন্নতাকে কতটাই যে প্রশ্রয় দেয় মেয়েরা নিজে—ননীর মায়ের শেষ কথাগুলোই যার প্রমাণ।